नमो बुद्धाय

NAMO SAKYAMUNI BUDDHA
NAMO AMITABHA

Homage to Amitabha! Be mindful of Amitabha!
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Western Pure Land of Limitless Light!

বনভন্তের দেশনা

(৩য় খণ্ড)

সংকলনেঃ

ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া

বনভন্তের দেশনা প্রকাশনা পরিষদ

বনভন্তের দেশনা

(৩য় খণ্ড)

সংকলনে ঃ

❒ ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া

প্রকাশনায় ঃ

❒ বনভন্তের দেশনা প্রকাশনা পরিষদ

উপদেষ্টা পরিষদে যাঁরা আছেন ঃ

❒ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথের

❒ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু

❒ বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা (সক্ক)

❒ বাবু ইন্দ্রনাথ চাক্‌মা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ

❒ বাবু কুমুদ বিকাশ চাক্‌মা

সম্পাদনায় ঃ

❒ বাবু সুরেশ বড়ুয়া

পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজে যাঁরা আছেন ঃ

❒ বাবু জগদীশ চাক্‌মা

❒ বাবু সমীরন বড়ুয়া

প্রকাশকাল ঃ লাভীশ্রেষ্ঠ অর্হৎ সীবলী পূজা উপলক্ষে ২৫৪০ বুদ্ধাব্দ

তারিখ ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ ইং, শুক্রবার

কম্পিউটার কম্পোজ
ও
মুদ্রণ তত্ত্বাবধানঃ

বিন্যাস, ৪২ শৈল বিতান, রাঙ্গামাটি।

Printed and donated for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website:http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

মহা সমুদ্রের অগাধ ও অফুরন্ত জলরাশি হতে জল সংগ্রহে যেমন সাগর–জলের কোন প্রকার ঊনত্ব সাধন করা সম্ভব নয়, ঠিক অনুরূপভাবে মহান আর্যপুরুষ ভদন্ত শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে) মহোদয়ের মুখনিঃসৃত অমূল্য, অভিজ্ঞাপূর্ণ ও অমৃতময় দেশনা সমূহ যাহা ব্যাপ্তিতে বিশাল এবং গভীরতার অতল তাহাও কারো জীবনব্যাপী সংগ্রহে ও সংকলনে পূর্ণত্বপ্রদান করার চেষ্টা ও অকল্পনীয়। সৌভাগ্যক্রমে আমি সময়ে সময়ে পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দর্শন আকাংখায় বিহারে গিয়ে তাঁর নিকট থেকে শ্রুত সামান্যতম দেশনা পুস্তকাকারে সংরক্ষন ও সংকলন করার চেষ্টা করেছি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মত উচ্চ মার্গের মহাপুরুষের জীবন ধর্মী প্রাঞ্জল উপমা সম্বলিত "বনভন্তের দেশনা–৩য় খন্ড" নামক সংকলনটি পূণ্য স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ।

নাম ঃ...কে

ঠিকানা ঃ...

....

পবিত্র করকমলে সশ্রদ্ধচিত্তে অর্পন করলাম। এ পূণ্যের প্রভাবে আমাদের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

বিনয়াবত

সংকলক

ও

বনভন্তের দেশনা প্রকাশনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

উৎসর্গ

আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে পুণ্যস্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ পরম আর্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথের মহোদয়ের অভিজ্ঞাপূর্ণ অমৃতোপম বাণী "বনভন্তের দেশনা ৩য় খন্ড" নামক গ্রন্থখানা সদ্ধর্মের প্রচারের লক্ষ্যে পরম শ্রদ্ধাসহকারে উৎসর্গ করলাম।

সংকলক
ও
বনভন্তের দেশনা প্রকাশনা পরিষদ

আশীষবাণী

বৌদ্ধ ধর্ম দুঃখ বাদের ধর্ম নহে। দুঃখ হইতে মুক্তিবাদকে জগত সমক্ষে তুলিয়া ধরা, প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এই মুক্তিবাদী ধর্মের আবিষ্কারক জগতপূজ্য গৌতম বুদ্ধের অভিযান। এই মুক্তির জন্য চারি আর্য সত্যকে জানা, বুঝা আর জ্ঞান উৎপন্ন করা, প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিকে জানা, বুঝা আর জ্ঞান উৎপন্ন করা একান্ত প্রয়োজন। চারি আর্য সত্য আর প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিকে না জানিলে, না বুঝিলে বুদ্ধকেও তাঁর ধর্মকে জানা যায় না, বুঝা যায় না, দুঃখ মুক্তিও ঘটে না।

আমাদের গৌরব আর বিরল সৌভাগ্যই বলিতে হইবে এই বাংলার মাটিতে এই দেশের আলো বাতাসে লালিত সন্তান পরম আর্যপুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো মহোদয় শত প্রতিকূলতার সাথে বীর বিক্রমে সংগ্রাম করিয়া ত্রিলোকের দুর্লভ সম্পদ সেই চারি আর্যসত্য এবং প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি ধর্মকে জানিয়াছেন, বুঝিয়াছেন এবং সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি যথাযথভাবে বুদ্ধ ও তাঁর সুবিখ্যাত সত্য ধর্মকে অবগত হইয়া পরম বিদ্যা বিমুক্তি সুখের অধিকারী হইয়াছেন।

আপনি আচারি ধর্ম অপরে শিখাও, দান্ত হয়ে দমননীতি অপরে বুঝাও, মুক্ত হয়ে মুক্তিপথ অপরে দেখাও। তথাগত বুদ্ধের এই নীতির অকৃত্রিম ধারক– শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো বিগত পঁয়ত্রিশ বছরের অধিককাল ধরিয়া অবিরাম অবিচ্ছিন্নভাবে ধর্ম দেশনায় রত আছেন, মানুষের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলনের জন্য ও ধর্মের জাগরণের জন্য। কিন্তু দূর দূরান্তের বহু গুণমুগ্ধ ভক্তের সৌভাগ্য ঘটে না তাঁর এই অমূল্য ধর্মোপদেশ–নিত্য শ্রবণ

করার। দূরদর্শী উপাসক ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া গুণ গ্রাহীদের এই ধর্ম পিপাসা মিটানোর এক দুর্লভ দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। এবারে তিনি 'বনভন্তের দেশনা' ৩য় খন্ড প্রকাশ করিতে যাইতেছেন জানিয়া সবিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি তাঁর ও প্রকাশনা পরিষদের উদ্যোগকে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ। গ্রন্থটি পাঠে কামনা করি ধর্মের জাগৃতি। সকলেই দুঃখ মুক্ত হউক।

ইতি

মংগলকামী

(শীলালংকার মহাস্থবির)

সংঘরাজ

বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা

তারিখ: ২০.১২.৯৬ হং

মির্জাপুর, শান্তিধাম বিহার

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

পালি সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। তথাগত বুদ্ধ কালাম গ্রাম নিবাসী জনগণকে উপলক্ষ্য করে বলেছেনঃ

মা অনুস্মরণ, মা পরম্পরায়। মা ইতি কিরিযায, মা পিটক সম্পদানেন, মা তক্ক হেতু, মা নযহেতু, মা আকার বিতক্কেন, মা দিট্ঠি নিজ্ঝান খন্তিযা, মা ভব্যরূপতায, মা ব্রাহ্মনো, মা গরুতি।

হে কালামগণ! যদি উন্নত পথের পথিক হতে চাও, যদি লক্ষিত বিষয় অর্জন করতে চাও, যদি জ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে চাও; তবে ছাড় শ্রুতি–পরম্পরা, ছাড় অন্ধতা জড়তা, ছাড় বংশানুক্রমিক আগত রীতি নীতির ধারা, ছাড় মিথ্যা অমূলক দৃষ্টি, ছাড় শাস্ত্রোক্তির নির্ভরতা, ছাড় কূটতক বাগ্বিতণ্ডা, ছাড় মতামতের অনড় দোহাই, ছাড় শ্রমন ব্রাহ্মণের মতবাদ, ছাড় গুরুমতের দোহাই। বাহ্যিক শোভা সৌন্দর্য্যে, সভ্যতা ভব্যতায় মানুষের বিচার করো না। এমন কি, আমি তথাগত কিছু বলেছি, তথাপি আপন চিন্তাভাবনা, বিবেক বুদ্ধি, যুক্তি বিচারের সহিত যা মিলবে না, যা জীবনের হিতকর বলে বিবেচিত হবে না, তা মেনে নিও না। পরের মুখে ঝাল খেও না। বিচার না করে কোন কিছু গ্রহণও করো না অথবা ত্যাগও করো না। পূর্ব পুরুষের প্রচলিত মতামত জেনে, পরের বই পড়ে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, গুরু মহাশয়ের মুখে মুখে শুনে কিংবা দশজনের থেকে খবর নিয়ে যে জানা–তা প্রকৃত জানা নয়। সত্যানুধাবন, আত্মানুশীলন, আত্মোপলদ্ধিই প্রকৃত জানা বা জ্ঞান।

দীর্ঘ নিকায় গ্রন্থে তথাগত বুদ্ধ বলেছেনঃ–যথ সীলং তথ পঞ্ঞা, যথ পঞ্ঞা তথ সীলং, ন সীলতো ন পঞ্ঞা, ন পঞ্ঞাবতো ন সীলং।

যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানেই শীল সংযম। শীলে প্রতিষ্ঠা ছাড়া প্রজ্ঞার উৎপত্তি ঘটে না, জাত প্রজ্ঞা

না থাকলে শীল-বিশুদ্ধি সম্ভবপর নহে। শীল ও প্রজ্ঞা জমজ ভাই। সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ট।

রাঙ্গামাটি রাজ বন বিহারের অধ্যক্ষ আয়ুস্মান শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয় পূর্বোক্ত বুদ্ধ বচনের সম্পূর্ণ অনুসারী। বিনয়-ধর্মের, নীতি-আদর্শের মূর্ত প্রতীক। সূর্য উদিত হলে সূর্যরশ্মি সমগ্র বিশ্বে যেমন বিচ্ছুরিত হয়, তদ্রুপ আমাদের পরম পুরুষ সাধক মনীষার জীবন-রশ্মি বিচ্ছুরিত বিস্তারিত হয়ে দেশ ও সমাজের দশদিকে গণ-জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাতে যা তাঁর অভিপ্রায়, তাঁর যা প্রাপ্য, তা তিনি পেয়ে আসছেন।

বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে- রতনে রতন চিনে শুকরে চিনে কচু। মহাস্থবিরের মহোদয়ের পরম ভক্ত রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত রাজানগর নিবাসী ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া আমাদের পরম আর্যপুরুষের অমৃত বাণী পদ্ম ভাষণ সংকলন করে পুস্তকাকারে প্রচার ও প্রকাশ করে যেমন পরমারাধ্য গুরুর প্রতি অচলান্ত গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় দিচ্ছেন, তেমনি সমাজ ও দেশের অসংখ্য জনগণের প্রতি তাদের অলক্ষ্যে অপরিসীম মৈত্রী, করুণা, মানব প্রেম, মানব মহিমার পরিচয় দিচ্ছেন।

আমি আয়ুস্মান শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের সুদীর্ঘ আয়ুস্কাল ও ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া মহাশয়ের সুদীর্ঘ কর্ম জীবন প্রার্থনা করি।

(শ্রী জ্যোতিপাল মহাথের)
অধ্যক্ষ
বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা

তাং- ১-১-৯৭ ইং

শুভেচ্ছা বাণী

ত্রিশরণের প্রতি নিবেদিত প্রাণ, সদ্ধর্মের প্রতি অতি নিষ্ঠাবান এবং সদা উদ্যোগী পুরুষ ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়ার "বনভন্তের দেশনা" ৩য় খণ্ডটি সদ্য প্রকাশিত হওয়ায় আমি গ্রন্থকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। নানা উপমা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ সহকারে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের মুখ নিঃসৃত বুদ্ধের বাণী গ্রন্থাকারে তিনি সুবিন্যস্থভাবে প্রকাশ করার মহান উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। অতি সুনিপুন ভাবে তিনি ধারাবাহিক ভাবে 'বনভন্তের দেশনা" প্রকাশ করায় অগণিত ধর্মপিপাসু নর-নারী নিজেদের ধর্মীয় চেতনা উৎপন্ন ও সমৃদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইবেন। তাঁহার এই মহৎ উদ্যোগ সদ্ধর্মানুরাগীদের নিকট চির ভাস্কর হইয়া বিরাজ করুক এই কামনা করিয়া রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলাম।

বিনোদ বিহারী চাক্‌মা
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি
রাঙ্গামাটি।

তাং- ১৭/১২/৯৬

সবিনয় নিবেদন

পরম পূজনীয় ভদন্তগণ, সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকা, সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আদর্শের অনুসারীগণ। আপনারা আমার শ্রদ্ধাপূর্ন বন্দনা, নমস্কার, প্রীতি, মৈত্রীময় শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। যাঁরা "বনভন্তের দেশনা ২য় খন্ড" আদ্যান্ত পাঠ করে অভিমত উচ্ছ্বাস পাঠিয়েছেন সেগুলি সাদরে গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাঁরা মৌখিকভাবে নিজের প্রীতিভাব প্রকাশ করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অভিজ্ঞাপূর্ণ অমৃতময় বাণী 'বনভন্তের দেশনা' ৩য় খন্ড সংকলনে আমার অজ্ঞতার কারণে অনেক স্থানে ভুল-ত্রুটির জন্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও সর্দ্ধম প্রাণ পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

'বনভন্তের দেশনা' ৩য় খন্ড সংকলন করার জন্যে অনেক সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তদোপরি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথের, শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ ভদ্দজী থের, শ্রীমৎ জ্যোতিসার ভিক্ষু প্রভৃতি ভদন্তগণ আমাকে উক্ত গ্রন্থ সংকলন করার জন্যে অনুপ্রাণিত করেন। একদিন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্যোতিসার ভিক্ষু আমাকে

বললেন– "আপনি শ্রামন হয়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা লিখুন। তাতে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।" এ শুভ প্রস্তাবে আমি ৩২ দিন যাবত অতি পরিশ্রমের সাথে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মদেশনা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। শ্রামন অবস্থায় যা কিছু পূণ্য সঞ্চয় করেছি তা হতে পূণ্যাংশ সদ্ধর্ম প্রাণ পাঠক–পাঠিকাদেরকে অর্পন করলাম। এ গ্রন্থে বনভন্তের অতীত জীবন ও দেশনার উপর স্মৃতিচারণা উপস্থাপনা করেছি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্য ভিক্ষু শ্রামন ও তাঁর উপাসকরা তাঁদের অভিজ্ঞ লেখনী দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। তাতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বিগত অজানা ইতিহাস উন্মোচিত হল।

অত্র গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথের ও শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু আমার লেখনীর মধ্যে যা কিছু ভুল ত্রুটি ছিল তা সংশোধন করে পাঠক–পাঠিকাদেরকে উপহার দিয়েছেন। রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা ও বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু ইন্দ্রনাথ চাক্‌মার পরামর্শ ও উপদেশে গ্রন্থটি পূর্নতা লাভ করেছে বলে আমি মনে করি। বাবু কুমুদ বিকাশ চাক্‌মার নিরলস কর্মদক্ষতা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। রাঙ্গামাটি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষক বাবু সুরেশ বড়ুয়ার ও বাবু বিমলেন্দু খীসার সম্পাদনার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাবু জগদীশ চাক্‌মা, বাবু সমীরন বড়ুয়া ও মিসেস সন্ধ্যারানী চাক্‌মা অতি পরিশ্রমের সাথে টাইপের মাধ্যমে পান্ডুলিপি তৈরী করেছেন। তজ্জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বনভন্তের দেশনা প্রকাশনা পরিষদের সদস্যদের গভীর শ্রদ্ধা ও অনাসক্ত অর্থের বিনিময়ে গ্রন্থটি ছাপিয়ে বিনামূল্যে প্রচার করতে সমর্থ হয়েছি। এ পূণ্যের ও ধর্মদানের ফলে তাঁদের ধর্মচক্ষু ও ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাত লাভ

হোক। উক্ত পূন্যকাজে যাঁরা আর্থিক, কায়িক ও বাচনিকভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটির সম্মানিত কর্মকর্তা ও সদস্য–সদস্যাগণ মহতী পূণ্যকাজে সহায়তা করেছেন। তজ্জন্য তাঁদের পূণ্যের পারমী পরিপূর্ণ হোক, ত্রিরত্নের নিকট প্রার্থনা করি।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু মহামান্য সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শীলালংকার মহাথের মহোদয় অনুকম্পা পূর্বক তাঁর অমূল্য আশীষ বাণী লিখে কৃতার্থ করেছেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মীয় চিন্তাবিদ ও বহু বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্যোতিপাল মহাথের মহোদয় তাঁর অসুস্থতার মধ্য দিয়ে এ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তজ্জন্য তাঁর পদতলে সশ্রদ্ধ বন্দনা জানাচ্ছি। রাজবনবিহার পরিচালনা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বাবু বিনোদ বিহারী চাক্‌মা গ্রন্থখানায় তাঁর অমূল্য শুভেচ্ছা বাণী লিখে কৃতার্থ করেছেন।

পরিশেষে পাঠক–পাঠিকাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অভিজ্ঞাপূর্ণ অমৃতময় বাণী "বনভন্তের দেশনা" ৩য় খন্ড গ্রন্থখানা পাঠ করে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করলে আমি পুনঃবার উৎসাহিত হব এবং ভবিষ্যতে ৪র্থ খন্ড সংকলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করব। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আমার সবিনয় নিবেদন– আপাততঃ শেষ করলাম।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

বিনীত নিবেদক

ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া

তারিখ ঃ ১৬–১২–৯৬ ইং। তবলছড়ি বাজার, রাঙ্গামাটি।

বনভন্তের দেশনা
(৩য় খন্ড)

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

১।	শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক হও	২৫
২।	নির্বানের দিকে অগ্রসর হও	৩৩
৩।	বুদ্ধ জ্ঞান অর্জন কর	৩৫
৪।	বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নির্বান	৩৭
৫।	কোথা হতে দুঃখের সৃষ্টি হয় ?	৪১
৬।	জ্ঞানের বোর্‌কা পরিধান কর	৪৪
৭।	সৎ সঙ্গী না পেয়ে একাকী থাকা ভাল	৪৬
৮।	কি সুখ, সুখ কোথায় ?	৪৯
৯।	দুঃশীল, দুষ্প্রাজ্ঞ ও অধার্মিক ব্যক্তিরা নিজের ও অপরের ক্ষতি করে	৫৪
১০।	আশীর্বাদের প্রত্যক্ষ ফল	৫৬
১১।	নির্বান সুখ প্রদান করে	৫৯
১২।	প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দেশনা	৬১
১৩।	আসল পণ্ডিত হও	৬৮
১৪।	প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কি ?	৭০
১৫।	স্বল্প সুখ পরিত্যাগ করে বিপুল সুখ আহরণ কর	৭৩
১৬।	মূর্খ দুঃখী ও পণ্ডিত সুখী	৭৬
১৭।	সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়	৭৮
১৮।	কারণ, হেতু, প্রত্যয় ও নিদান	৮১
১৯।	লৌকিক সত্য ও লোকোত্তর সত্য	৮৪
২০।	বৌদ্ধধর্ম ত্যাগেই শ্রেষ্ঠ	৮৭
২১।	সার কি ? অসার কি ?	৮৯
২২।	জ্ঞান দাতা শ্রদ্ধেয় বনভন্তে	৯২
২৩।	আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার ও বনভন্তের দেশনা	৯৩
২৪।	অলৌকিক ঘটনা ও দৃশ্য	৯৭
২৫।	কঠিন চীবর উদ্বোধনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে	৯৮
২৬।	ধর্মথের হও	৯৯
২৭।	জুরাছড়ি বন বিহারে কঠিন চীবর দানে বনভন্তের দেশনা	১০১
২৮।	বিরল ঘটনা!	১০৬

২৯। উৎকৃষ্ট কর্মে ও ধর্মে মুক্ত হয় ১০৯
৩০। ভারবুয়াচাপ বন বিহারে কঠিন চীবর দানে বনভন্তের দেশনা ১১২
৩১। নির্বানে দুঃখ, ক্ষুধা ও দুর্বলতা নেই ১১৪
৩২। কাটাছড়ি বন বিহারে বনভন্তের দেশনা ১১৫
৩৩। কুশলে সুখ ও নির্বাণ সম্পত্তি উৎপত্তি হয় ১১৭
৩৪। প্রচারক বাহিনী সক্রিয় হলে ধর্ম নিষ্ক্রিয় হতে পারে না ১১৮
৩৫। কুতুকছড়ি বন বিহারে কঠিন চীবর দানে বনভন্তের দেশনা ১২১
৩৬। আত্মা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অহংকার না থাকলে নির্বান হয় ১২২
৩৭। খাগড়াছড়ি আর্য বন বিহারে বনভন্তের দেশনা ১২৪
৩৮। ব্রহ্মচারীর রাজার মত গম্ভীর থাকতে হয় ১২৯
৩৯। যৌবন ত্যাগ করা মহা কঠিন ১৩১
৪০। রাজ বন বিহারে কঠিন চীবর দান '৯৬-এর বনভন্তের দেশনা ১৩৪
৪১। তৃষ্ণা সমুদ্রে চারি আর্য্যসত্য জাহাজ সদৃশ ১৩৭
৪২। বিনাযুদ্ধে নির্বান যেতে পারে না ১৩৮
৪৩। নিত্য সংযমী ও আত্মজয়ীকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না ১৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা ও অতীত জীবনের উপর স্মৃতিচারণ ঃ

১। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) - শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির ১৪৩
২। সাধারণ দৃষ্টিতে ও সম্যক দৃষ্টিতে মানব জীবনের স্বার্থকতা - শ্রীমৎ ভৃগু স্থবির ১৫৪
৩। কুশলাকুশল ও বিপাক - শ্রীমৎ বুদ্ধশ্রী ভিক্ষু ১৫৭
৪। কর্ম ও তার ফল - শ্রীমৎ বশিষ্ট ভিক্ষু ১৬০
৫। নির্বান মার্গের বাঁধাস্বরূপ বর্ণনা - শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু ১৬১
৬। বনভন্তের দৃষ্টিতে সত্য জ্ঞান - শ্রীমৎ জিনপ্রিয় ভিক্ষু ১৬৯
৭। শীল শিক্ষা, সমাধি শিক্ষা ও প্রজ্ঞা শিক্ষা - শ্রীমৎ জ্যোতিসার ভিক্ষু ১৭১
৮। অর্ন্তদৃষ্টি ভাব - শ্রীমৎ সুমন ভিক্ষু ১৭৩
৯। বনভন্তের দেশনা (কবিতা ছন্দে) - শ্রীমৎ করুনা বর্দ্ধন ভিক্ষু ১৭৫
১০। রাজবন বিহারে শ্রামনদের দৈনন্দিন কর্তব্য - শ্রীমান আর্যনন্দ শ্রামন ১৮১
১১। আমার স্মৃতি পাতা থেকে বনভন্তে - ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় (চাক্‌মা রাজা) ১৮৩

১২। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরোকে যেমন দেখেছি ও শুনেছি (১৯৪৯-৬০ ইং) - কুমুদ বিকাশ চাক্‌মা ১৮৫
১৩। শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে যেমন দেখেছি ও শুনেছি (১৯৬০-৭০ ইং) - সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা (সক্ক) ১৯৭
১৪। শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে যেমন দেখেছি ও শুনেছি (১৯৭০-৭৬ ইং) তিনটিলা - প্রতুল বিকাশ চাক্‌মা (নিরোধ) ১৯৯
১৫। শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে যেমন দেখেছি ও তার কথা যা শুনেছি (১৯৭৬-৯৬ ইং) - সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা (চক্র) ২১২
১৬। চিকিৎসকের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে - ডাঃ নীহারেন্দু তালুকদার ২২৬
১৭। লোকোত্তর জ্ঞান - সুকোমল কান্তি চৌধুরী। ২২৯
১৮। আমার স্মৃতিতে রাজবন বিহার - সঞ্জয় বিকাশ চাক্‌মা ২৩২
১৯। উপাসক- উপাসিকাদের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় বনভন্তে - সনৎকুমার বড়ুয়া ২৪০
২০। কথা আর কাজে মিল থাকা উচিত - সুরেশ বড়ুয়া ২৪৪
২১। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কি ঋদ্ধিমান ও লাভী ? - বিমলেন্দু বিকাশ খীসা ২৪৬
২২। সুবলং জুড়াছড়ি শাখা বন বিহারে (১৯৯৫) কঠিন চীবর দানের দেশনা - প্রচারক চাকমা ২৪৮

তৃতীয় অধ্যায়

কবিতায় বনভন্তের দেশনা ও বৌদ্ধ কবিতা গুচ্ছ

১। বনভন্তের লক্ষ্য ২৫২
২। নির্বাণের অভিযান ২৫৩
৩। স্বাধীন ২৫৪
৪। মান ২৫৬
৫। বনভন্তের নির্দেশ ২৫৭
৬। বনভন্তের উপদেশ ২৫৮
৭। সংগ্রাম ২৫৯
৮। সাত প্রকার ধন ২৬০
৯। সদ্ধর্ম পুকুর ২৬১

১০। বনভন্তের আর্যনীতি ২৬২
১১। দশ ধর্ম অভিজ্ঞেয় ২৬৩
১২। দশোত্তর ধর্ম ২৬৫
১৩। চিত্ত দমন ২৬৬
১৪। মানব ধর্ম পরিচয় ২৬৭
১৫। হীন ধর্ম ত্যাগ ২৬৮
১৬। বিভিন্ন মতালম্বী ২৬৯
১৭। কামের আদীনব ২৬৯
১৮। বনভন্তের দেশনা - অধ্যাপক শিশির বড়ুয়া ২৭০
১৯। মুক্তির পথ- অরুন বিকাশ তালুকদার ২৭১
২০। নির্বাণ যাত্রী বনভন্তে -কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া (রাজীব) ২৭২
২১। ধর্মীয় গান : গীতিকার- সুনীল কার্বারী ২৭৪
সুরকার- দিলীপ বাহাদুর রায়, শিল্পী- ঈশিতা চাক্‌মা (কেপি)

বৌদ্ধ কবিতা গুচ্ছঃ

১। কর্ম বিভংগ সুত্র ২৭৫
২। আলবক যক্ষ ২৭৯
৩। শুক পাখীর ভাবনা ২৮২
৪। পদ্ম কুমার ২৮৪
৫। জীবনের পরিণাম ফল ২৮৮
৬। স্ত্রী পরিচিতি ২৯১
৭। অষ্ট সংবেগ ২৯৩
৮। নারীর মোহ ২৯৬
৯। নাম-রূপ ২৯৯
১০। আমিত্ব ৩০১
১১। দুনিয়া ৩০২
১২। প্রজ্ঞার জোর ৩০২
১৩। অভাব ৩০৩
১৪। বৈশাখী পূর্ণিমা ৩০৩
১৫। প্রভাতী আহবান ৩০৮

অভিমত উচ্ছ্বাস ৩০৯

২য় খন্ডের শুদ্ধি পত্র ৩১৯

প্রথম অধ্যায়

বনভন্তের দেশনা সংকলন

শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক হও

ভু-খাক মিন্হ

আজ রবিবার। ১৪ ই জুলাই, ১৯৯৬ ইংরেজী। বর্ষাবাসের দ্বিতীয় উপোসথ অমাবস্যার রাত।

গত ১২ই জুলাই '৯৬ ইং দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে ভিয়েতনামের জনৈক ভিক্ষু ভু-খাক মিন্হ পদ্মাসনে ৩০০ বছর ধ্যানস্থ আছেন। বর্তমানে তিনি পাথরে পরিণত হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে তাঁর রহস্য উৎঘাটনের জন্য বিকাল ৪-০০ টায় তাঁকে এ পত্রিকাটি প্রদান করি। সন্ধ্যা ৭-০০ টায় বুদ্ধ বন্দনার পর সমবেত উপাসক-উপাসিকারা সহ আমি শ্রদ্ধেয়-বনভন্তেকে বন্দনা করার জন্য তাঁর ধ্যান কুঠিরের উপরের তলায় যাই।

প্রথমেই তিনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন-তোমরা শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক হও। তিনি উদাহরন দিয়ে বলেন-জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক আমার নিকট এসে প্রশ্ন করলেন-দুঃখ মোচন কবে হবে? আমি বললাম।

চক্ষু মুদি অবিরাম জপে শুধু হরিনাম
কাম্যসুখ ভোগ মত্ত মন,
সত্যভাব যতদিনে না উদিবে তব মনে
ভব দুঃখ হবেনা মোচন।
নাই জীবে ভাই ভাই হিংসা দ্বেষ শুধু তাই
ত্রিলক্ষনে নাই যার জ্ঞান,
অন্তরেতে অহংকার মুখে শুধু হরিনাম সার
কিছুতেই নাই তার ত্রান।

এ আট লাইন কবিতা বলার পর তিনি পরমার্থ ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন-তোমরা, পরধর্ম কর না। পরধর্ম পাপ, দুঃখ ও মুক্ত নয়। মিথ্যা ধর্ম পাপ, দুঃখ ও মুক্ত নয়। তোমরা নিজ ধর্ম কর। নিজ ধর্মে পুণ্য, সুখ ও মুক্ত হয়। নিজ ধর্ম, সত্য ধর্ম ও খাঁটি ধর্ম হল লোভ, দ্বেষ ও মোহ শূন্য। লোভ, দ্বেষ ও মোহ মুক্ত হতে হলে আর্য অষ্টাঙ্গিক পথে চলতে হবে। তাতেই তোমাদের পুন্য অর্জন, নানাবিধ দুঃখ হতে পরিত্রান ও চিত্তে অনাবিল সুখ বয়ে আনবে। তোমরা নকল হতে সাবধানে থাক। ভেজালে যেয়ো না। খাঁটি বৌদ্ধ ধর্মে গন্ডগোল, ভেজাল, আবোল তাবোল নেই।

তিনি বলেন-চারি প্রত্যয় পেলে ভিক্ষুদের সুখ হয়। তারা কাম ত্যাগ, রূপ ত্যাগ ও বেদনা ত্যাগ করতে পারলে অনন্ত সুখের অধিকারী হয়ে বিমুক্তি সুখে অবস্থান করে। যারা কামের আস্বাদ গ্রহন করে, রূপের আস্বাদ গ্রহন করে ও বেদনার আস্বাদ গ্রহন করে তারা কখনো সুখী হতে পারে না। সুখী হতে হলে অতীতের পূন্য পারমী, ইহ জন্মের প্রচেষ্ঠা ও সৎ গুরুর উপদেশ দরকার। বর্তমানে আচরন নেই বলে প্রায় লোকেরা ব্যর্থ হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন- আমার যথেষ্ঠ হয়েছে, চারি প্রত্যয়, সুখ সুবিধা, ধ্যান কুঠির, সৌচাগার, স্নানাগার এবং ধর্ম প্রচারের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সদ্ধর্ম থাকলে সকলে দান দিবে। পর ধর্ম করলে কেউ দেবে না। ডঃ শরনাংকর ভিক্ষু বলেছেন বনভন্তে না থাকলে অথবা মরে গেলে তাঁর শিষ্যদেরকে কিছু দেবে না। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-এটা সম্পুর্ণ সত্য নয়। যদি তারা ত্যাগ করে সদ্ধর্ম হারা না হয় নিশ্চয়ই সকল সুযোগ সুবিধা পাবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-লেখা পড়াও এক প্রকার শত্রু।। এম, এ পাশ করলে শুধু ভাত খেতে পারে। কেন না তারা সারা জীবন চাকুরী বা ব্যবসা বাণিজ্য করে সময় অতিবাহিত করে। আবার অন্যদিকে দেখা যায় এম, এ ডিগ্রী নিয়ে অর্হত্বফল লাভ করলে তার ডিগ্রী ধ্বংস হবে না, আমি যেভাবে অভিজ্ঞা দ্বারা ব্যক্ত করতে পারি সে রকম সবাই-যদি সচেষ্ঠ হয় নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হতে পারবে। ভিক্ষু শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক হলে স্বর্গের দেবতারাও সাহায্য করে। পৃথিরীতে যেমন তোমরা হিন্দু বৌদ্ধ, মুসলিম ও খৃষ্টান আছ তেমন স্বর্গে ও হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম ও খৃষ্ঠান দেবতারা আছেন।

তাঁরা সৎকর্ম ও শীল পালন করে স্বর্গে গিয়েছেন। হিন্দু দেবতারা হিন্দুদেরকে, বৌদ্ধ দেবতারা বৌদ্ধদেরকে, মুসলিম দেবতারা মুসলিমদেরকে ও খৃষ্ঠান দেবতারা খ্রীষ্টানদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু বৌদ্ধ দেবতারা অন্যদের তুলনায় উজ্জ্বল ও শান্ত। তাদের নিকট অন্যান্যদের চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ থাকে। দেবতাদের ধন সম্পদ গুলির তুলনায় মনুষ্যের ধন সম্পদ অতি নগন্য। তাঁরা অনেক সময় শীলবানদেরকে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেন। মনুষ্য লোকে, স্বর্গে ও ব্রহ্মলোকে যা ধন সম্পদ আছে তদ্ অপেক্ষা ভগবান বুদ্ধের ধন সম্পদ অনেক অনেক বেশী। তা তুলনা করা যায় না। বনভন্তে প্রমান করতে চান বৌদ্ধ ধর্মে কি আছে। কতটুকু গুন আছে। কতটুকু সম্পদ আছে। কিন্তু বনভন্তে কাহারো নিকট কিছু খোঁজেন না। মধ্যে মধ্যে শুধু ইট, সিমেন্ট, লৌহা ও বালির কথা বলেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন-তোমরা শীল পালন কর, ইন্দ্রিয় সংযম কর, ভোজনে মাত্রা জ্ঞান হও এবং সর্বদা জাগ্রত থাক। তাতে তোমাদের লোকোত্তর সুখ, মার্গসুখ ও ফল সুখ লাভ হবে এবং সর্ব দুঃখ হতে মুক্তি পাবে। তাতে তোমাদের নীচে পড়ার বা দুঃখে পড়ার আশংকা থাকবে না। অবশ্য এতে তোমাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকা চাই।

তিনি বলেন-শাস্ত্রে আছে গাধার ৩টি গুন। তারা অতিরিক্ত শীত, গরম সহ্য করে, নিরলসভাবে ভার বহন করতে পারে। তোমরাও গাধার ৩টি গুন সংগ্রহ করে তোমাদের অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হও।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সন্ধ্যা ৭-০০ হতে রাত প্রায় ৯-০০ পর্যন্ত উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর আমি বললাম-ভন্তে, বিকাল বেলা যে পত্রিকাটি আপনাকে দিয়েছি তাতে ভিয়েতনামের জনৈক ভিক্ষু ভু-খাক মিন্‌হ ৩০০ শত বৎসর পর্যন্ত পাথর হয়ে আছেন তাঁর রহস্য জান্‌তে চাই। তিনি বললেন-উক্ত ভিক্ষু বোধিসত্ত্ব। ভবিষ্যতে বুদ্ধ হবেন। তিনি মারা যাওয়ার পুর্বে অধিষ্ঠান করে ছিলেন যে, -"এ দেহ পাথর হয়ে যাক"। এ রকম পাথর ময় ভিক্ষু নূতন নয়। হিমালয়ে অনেক আছে। এমনকি ৩০০ বছর বড় কথা নয়। হাজার হাজার বছর পর্যন্ত থাকতে পারেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে বোধিসত্ত্বদের মাথার উপর দিয়ে না যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। কেন না তাঁরা ভাবী সম্যক সমুদ্ধ।

দীপংকর বুদ্ধের সময়ে বোধিসত্ত্ব সুমেধ তাপস তাঁকে পিঠের উপর দিয়ে কাঁদা পার করিয়ে দিয়েছিলেন। দীপংকর বুদ্ধ তাঁর পিঠের উপর দিয়ে পার হয়ে ভিক্ষু সংঘকে কাঁদা দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে দৈনিক জনকন্ঠ পত্রিকা হতে কিছু অংশ তুলে ধরছি। এ প্রতিবেদন দিয়েছেন পত্রিকার সাংবাদিক জুয়েল মাজহার। পিথাগোরাসের সময় থেকেই মানুষ একথা জেনে এসেছে যে, একটানা ৪০দিন কোন কিছু না খেয়েও বেঁচে থাকা সম্ভব। কিন্তু ভিয়েতনামের থিয়েন বৌদ্ধ মন্দিরের মোহান্ত ভু-খাক মিন্‌হ একটানা ১০০দিন না খেয়ে দিব্যি বেঁচে ছিলেন। এ রকম আরও একজন আছেন যার কথা পরে বলবো। ভু-খাক মিন্‌হ ১০০ দি। না খেয়ে বেঁচে থাকার মিরাকলের পাশাপাশি আরও চমকপ্রদ ঘটনা-আছে আর তা হচ্ছে মানুষ মরে গেলে পচে যায়। এ অনিবার্য বৈজ্ঞানিক সত্যটাও নিজের অজান্তেই দিব্যি ভুল প্রমান করে গেছেন তিনি। মারা গিয়েছিলেন তিন্‌শ বছরের ও বেশী আগে কিন্তু দেহে পচন ধরেনি কোনো। বরং উল্টো দেহটা শক্ত হতে হতে পাথর হয়ে যায়। দেখলে মনে হবে মানুষের দেহ নয়, পাথরে বানানো মানব-প্রতিমা। এখন ভরা বাদলের আষাঢ় মাস বটে। কিন্তু যে গল্পটা এখানে বলা হলো, তা মোটেই আষাঢ়ে গল্প নয়। প্রায় অবিশ্বস্য হলে ও ঘটনাটি সত্য। স্পুটনিক সাময়িকীতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ ঘটানার সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

গৌড় চন্দ্রিমা ছেড়ে ভু-খাক মিন্‌হর্ পরিচয়টা উম্মোচন করা যাক। তার জম্ম হয়েছিল ভিয়েতনামের সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে। ভিয়েতনামী রাজ দরবারের সম্মানিত সভাসদ ছিলেন। বহুমুখী গুনপনার জন্যে রাজকীয় সম্মানের শীর্ষাসন, অর্থবিত্ত আর প্রতিপত্তি সবই পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পার্থিব সংসারের মায়া মোহে বেশীদিন মজেননি। "অন এ্য ফাইন মর্নিং" রাজ সম্মান, অর্থ বিত্ত আর দারা পুত্র পরিবারের মায়া ত্যাগ করে ভু-খাক মিন্‌হ বেচেঁছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুর লোভ-লালসাহীন, সরল অথচ কঠোর এক ধ্যানী জীবনে। দিনে দিনে হয়ে উঠলেন ভিক্ষু দল শ্রেষ্ঠ মোহান্ত। জীবনের শেষ দিনগুলোতে থিয়েন মন্দিরের এক গোপন প্রকৌষ্ঠে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিলেন ভু-খাক। শুরু হলো অন্তহীন উপবাস। আর অবিশ্রাম ক্লেশকর ধ্যান যোগ। ফলে অনুগত ভিক্ষু আর শিষ্যের দলকে কাছে ঘেঁষতে বারন

করলেন। তবে মন্দিরের ঢোল মহরত থেমে যাবার পর কয়েক মুহুর্তের জন্যে ভু-খাকের সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হতো তাঁহার নির্দেশ অমান্য করে। কঠোর উপবাস ত্যাগের আর্জি জানাতেন কেউ কেউ। কিন্তু ভু-খাক থাকতেন নির্বিকার। এভবে একটানা ১০০ দিন পর ধীরে ধীরে শরীর শুকিয়ে এলো তাঁর। ঝরে গেল পেশীর বাঁধন। ত্বক ঠেলে-স্পষ্টতর হলো ভিতরের কংকাল কাঠামো। The time of departure has arrived বলে আড়াই হাজার বছর আগে ঠোঁটের কাছে যেমন হ্যামলকের পেয়ালা তুলে স্বেচ্ছা মৃত্যু বেছেঁ নিয়েছিলেন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস্ অনেকটা তেমনিভাবে ভু-খাক ও সাঙ্গঁ করতে উদ্যত হলেন পার্থিব জীবনের সব লেনদেন। শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন-"জগত সংসার থেকে ছুটি নেবার সময় হয়েছে আমার। আত্মা আমার দেহ ছেড়ে উড়ে যাবার পর অন্ততঃ এক মাস অপেক্ষা করবে তোমার। দেহে কোন পচন বা দুর্গন্ধ দেখা দিলে প্রচলিত আচার অনুযায়ী সমাধিস্থ করবে আমাকে। তা না হলে যেমনটি আছি এ পদ্মাসনে থাকতে দেবে আমার মরদেহ। যাতে চিরকাল এ আসনে বসে তথাগত বুদ্ধের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করতে পারি। "এই বলে সবার বেদনাহত চোখের সামনে দেহত্যাগ করলেন ভু-খাক-মিনহ্।

তারপর দেখতে দেখতে দিন মাস গড়িয়ে গেল। কিন্তু দেহে কোন পচন ধরল না। পাওয়া গেল না কোন দুর্গন্ধের আঁচ। এভাবে দুমাস পেরিয়ে গেল। অনুগত ভিক্ষুর দল এক ধরনের রঙের প্রলেপ মাখলেন তাঁর সারা গায়ে, যাতে ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ দেহে দাঁত বসাতে না পারে। মন্দিরের তত্ত্বাবধায়িকা বৃদ্ধা মহিলা দিয়েছেন এ বিবরণ। আর ভু-খাকের পাথর হয়ে যাওয়া ধ্যানস্থ দেহের সামনে দাঁড়িয়ে তা দু কান ভরে শুনেছিলেন রুশ প্রাচ্যবিদ লিসেভিচ। মহিলা ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন "অন্যরা যেভাবে মারা যায় মোহান্ত মরেননি সেভাবে। যুগপৎ উপবাসরত, আরাধনা আর ধ্যান-যোগের মধ্য দিয়ে পরিপুর্ণ নির্বান লাভ করেছিলেন তিনি। পরিশুদ্ধ আত্মা তাঁর স্বেচ্ছায় নশ্বর দেহের মায়া ত্যাগ করে গেল, গেছে উর্ধ্বলোকে। "বলত বলতে মহিলা ভু-খাকের নাক আর দু ভুরুর মাঝখানের অংশটার দিকে অঙ্গুঁলি নির্দেশ করলেন। প্রাচ্যের মানুষের কাছে এ অংশটা Gate way to the other world. ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, ইন্দোচীন এলাকায় তাওযোগ (Taojoga) নামের এ বিশেষ যোগ সাধনা রয়েছে।

তাওবাদীর বিশ্বাস এ বিশেষ যোগ সাধনার মধ্য দিয়ে নশ্বর দেহ ত্যাগ করে আত্মা আবার দেহে ফিরে আসতে সক্ষম। এই ফাঁকে প্রাচ্যবিদ ইগর লিসেভিচের ব্যাপারে দুটো কথা বলে নেয়া যাক। প্রাচ্যবিদ তার উপর প্রত্নবিদ হবার সুবাদে প্রাচ্য রহস্যের তালা খোলার জন্যে তার মন সব সময়ই ছিল আঁকু পাঁকু। তা ছাড়া ভদ্রলোকের রয়েছে আবার ভ্রমণ রোগ। যাকে বলে পায়ের তলায় শর্ষে। অতএব পদতলে শর্ষের সুড়সুড়ি নিয়ে ইগর হাজির হলেন ভিয়েতনামে। রাজধানী হ্যানয়ে গিয়ে সেখানকার ইনিষ্টিটিউট অব আরকিউলজিতে দৈবক্রমে দেখা হয়ে গেল নগুয়েন লানহ্ কুঅং এর সাথে। কুঅং এর আবার সব কিছুতেই উৎসাহ। ফলে রতনে রতন চেনে। এই বাংলা প্রবচনটিকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রমান করে বাক্স পেটারা বেঁধে দুই রতনে নামলেন পথে। কিন্তু ২৩ কিলোমিটার পথ পেরুতে গিয়ে নাকে মুখে হলদে ধুলোর ভীষনামৃত খেয়ে দুজনের অবস্থা হলো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। পথতো নয় আঁকা বাঁকা পল্লী-পথ এখানে-ওখানে বিস্তর খানা খন্দ। যত্রতত্র খোয়া-উঠা এবড়ো থেবড়ো ২৩ কিলোমিটারের যেন এক দুর্গম 'পুলসিরাত' তবে পথের কষ্টকে পায়ের ভৃত্য করে দুজনে গিয়ে পৌছলেন- উদ্দিষ্ট ঠিকানায়। থিয়েন মন্দিরের সেই দূরতম প্রকোষ্ঠে পৌছে ইগর মুখোমুখি হলেন ভু-খাক মিনহ্র ধ্যান মগ্ন পাথরস্থ মূর্তির সামনে। ইগর তাঁর The smile of an immortal elder প্রবন্ধে সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে।

অবশেষে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাক্ষাত ঘটল। আমার সামনে ভিক্ষুর হলদে চীবর গায়ে, ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকে তিনশ বছরের ও আগে জন্ম নেয়া ভিক্ষু ভু-খাক মিনহ পদ্মাসনে উপবিষ্ট। ইগর লিচেভিচ পংকানুপুংকভাবে বর্ণনা করেছেন তার দুর্লভ অভিজ্ঞতার কথা রুশ ম্যাগাজিন 'নাউকা রিলিজিয়া' তে। সেটির ইংরেজী রুপান্তর পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল অধুনালুপ্ত 'স্পুটানিক' পত্রিকায়। এ নিবন্ধের মাল মসলা সেখান থেকে ধার করা "ট্রুথ ইজস্ট্রেনজার দেন ফিক্সান"। ভু–খাক মিনহ্র মৃত্যুর পর পেরিয়ে গেছে তিন শতাব্দীর ও বেশী সময়। এ সুদীর্ঘ সময়ে হাত বদল হয়েছে কতো রাজ্য পাট, মারি মনন্তর, যুদ্ধ সংঘাতের কত ভয়াল বিভীষিকা চাবুক চালিয়েছে পৃথিবীর গায়ে।

এ সব উম্মাতাল ঘনঘটার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে ইতিহাসের রথের চাকা। এ সময়ে আগের রাজ বংশকে হটিয়ে ভিয়েতনামে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে নগুইয়েন নামের অন্য এক রাজবংশ। এর পর ইউরোপ থেকে কালাপানি পার হয়ে এসেছে ফরাসীরা। তারাও এক সময় জাপানীদের হাতে নাজেহাল হয়ে "এ হর্স, এ হর্স, ফর এ কিংডম" বলে পালিয়ে বেঁচেছে। তারপরও ঘটেছে এন্তার ঘটনা। উপনিবেশ বিরোধী যুদ্ধ, ম্যার্কিনীদের নাপাম বোমার নারকীয় আগুনে পুড়ে ছারখার হয়েছে কত নাম না জানা 'মাইলাই'। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী হাজারো দুর্বিপাকের দিব্যি পাশ কাটিয়ে ভু-খাক মিনহ্ তাঁর পদ্মাসনে স্থির নির্বিকার আজও।

ভু-খাক এর মতো আরও একজনের কথা। থিয়েন মন্দিরে ভু-খাকের মত আরও এক ভিক্ষুর দেহ পদ্মাসনে আসীন। এই ভিক্ষুর মৃতদেহ ও পচেনি বা এতটুকু নষ্ট হয়নি। এই ভিক্ষুর নাম জানা যায়নি, তবে তিনি ছিলেন ভু-খাক মিনহ্র ভাগ্নে ও উত্তরসুরি। তবে পরবর্তীকালে ওই ভিক্ষুর দেহে অনাবশ্যকভাবে রঙ চড়িয়ে স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করা হয়েছে। অতি উৎসাহী ভিক্ষুর দল কান্ড জ্ঞানের মাথা খেয়ে তার মুখ মন্ডলে-সাদা রঙ লেপ্টে দিয়েছে। লাল রঙের রঞ্জিত করেছে ঠোঁট এবং চোখের পাতা। এভাবে তারা ভু-খাক এর উত্তর সুরীর প্রকৃত চেহারার বারোটা বাজিয়ে তাকে পুতুল বানিয়ে ছেড়েছে। ফলে তাঁর ধ্যানস্থ ভাবটি উঠে গিয়ে রঙ এর ভাবটাই প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

ভিয়েতনাম স্বাধীন হবার পর ভু-খাক মিনহ্কে ঘিরে শতাব্দী প্রাচীন কিং-বদন্তীটির প্রতি পন্ডিতেরা আবার মনোযাগ দিতে শুরু করেন। কেন না ভু-খাকের মুর্তিটি আসলেই মানুষের মৃতদেহ নাকি পাথর দিয়ে বানানো প্রতিমা? এনিয়ে পন্ডিত মহলে দ্বিধা বিভক্তি দেখা দেয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো মূর্তিটি বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে। যথারীতি এটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো বাকমাহ সামরিক হাসপাতালে বিজ্ঞানী চিকিৎসক আর বাঘা বাঘা প্রত্ন বিদের উপস্থিতিতে এর এক্সরে করা হলো। স্ক্রিনে কংকালের স্পষ্ট আভাস ফুটে উঠতে দেখে আক্কেল গুড়ুম হলো সবার। তারা এক বাক্যে মেনে নিলেন পাথর প্রতিমা নয়, এটা আসলেই পাথর হয়ে

যাওয়া এক মানুষের মৃতদেহ। অন্য এক পরীক্ষায় প্রমানিত হলো ভু-খাক মিনহ্‌র মৃতদেহ মমিও করা হয়নি। যেমনটি করা হতো প্রাচীন মিসরে ফারাওদের দেহকে। তাছাড়া মমি করার পর ফারাওদের খুলির ভিতরের মগজ ও পেটের নাড়ী ভুড়ি ফেলে দেয়া হতো। কিন্তু ভু-খাক এর মগজ ও নাড়ী ভুড়ী যথাস্থানে অটুট রয়েছে। কিন্তু ভিয়েতনামের মতো গ্রীষ্মমন্ডলীর আবহাওয়ার দেশ যেখানে বাতাসে আদ্রতার পরিমাণ শতকরা ১০০ ভাগ যেখানে বছরের বেশীরভাগ সময় জুড়ে বৃষ্টি বাদলের ঘোর দাপট সেখানে একটি মৃতদেহ কি করে শতাব্দী পর শতাব্দী পচনহীন অটুট থাকল? তা ছাড়া থিয়েন মন্দিরের একদিকের ইটের দেওয়াল ও গেছে ধ্বসে। বাকি তিনদিকের দেয়ালের বাইরে ভিতরে নোনা ধরেছে,কালছে সবুজ শ্যাওলার ঘন আস্তর জমেছে। তদুপরি ঝড় জলের সময় বেঘারা হাওয়া আর বৃষ্টির ছাঁট এসে অবাধে টু মারে ভিতরে।

কিন্তু তবুও ভু-খাক মিনহ্‌র দেহে ও সবের আঁচড় পড়েনি একবিন্দু, শ্যাওলা জমেনি। উল্টো যতই দিন যাচ্ছে পাথুরে দেহ ততই শুষ্ক হচ্ছে। অবশ্য শুষ্কতার পাশাপাশি ওজন ও কমেছে তাঁর। বাকমাই সামরিক হাসপাতালে ওজন নেবার পর দেখা গেল অবিশ্বাস্য রকম হাল্কা হয়ে তা মাত্র ৭ (সাত) কেজিতে গিয়ে ঠেকেছে। ওজন যাইহোক ৩শ বছরের বেশী সময়েও কেন মৃত দেহটা পচল না? এ ব্যাপারে কি বলবে বিজ্ঞানী?

যেসব বিজ্ঞানী ভু-খাককে নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন পচনহীনতার রহস্য খুঁজতে গিয়ে তাঁদের তালু গরম হলেও কুল কিনারা মেলেনি। নিজেকে রহস্যের চাদরে মুড়ে পদ্মাসনে বসে অলক্ষ্যে উপহাসের হাসি হেসেই চলেছেন তিনি। ভিয়েতনামী রসায়নবিদ ও জীব বিজ্ঞানীরা অবশ্য ভু-খাক এর পাথুরে দেহের মধ্যে এক ধরনের রুপালী রঙের আস্তরন সনাক্ত করতে পেরেছেন। তাঁদের অনুমান পচনহীনতার জন্যে এর হয়ত কোন ভুমিকা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি তাঁরা। আর রুশ প্রাচ্য বিশারদ ইগর লিসেভেচ বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁর মতে ১০০ দিনের উপবাস ব্রতের কারনেই সম্ভব হয়েছে এটা। এ প্রসঙ্গে ইগর লিসেভিচ লিখেছেন।

নির্বাণের দিকে অগ্রসর হও

আপনাদের মধ্যে কাহারো কাহারো জানা আছে এয়ার কন্ডিশন সম্বন্ধে। গ্রীষ্মকালে প্রখর রোদে পুড়ে এয়ার কন্ডিশন ঘরে বিশ্রাম করলে শরীরের গরম কাতরতা দূর হয়ে ক্ষনিকের জন্যে মনে এক প্রশান্তি আসে। আবার তথা হতে বিভিন্ন কার্য উপলক্ষ্যে প্রখর রোদে বের হতে হলে সে সময় শুধু পূর্বের ক্ষনিকের জন্য প্রশান্তি তথা এয়ার কন্ডিশনের অনুভূতির কথা মনে থাকে। ঠিক তেমনি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অভিজ্ঞাপুর্ণ দেশনাগুলি ও আমাদের চিত্তে এয়ার কন্ডিশনের মত সমাহিত ও আপাতত প্রশান্তি আসে। আমরা যে পরিবেশে আছি বা জীবন কাটাচ্ছি তা গ্রীষ্মকালীন গরম থেকেও তীব্রতর। সর্বদা আমাদের শরীর ও মন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। তা হলে উপায় কি? উপায় হল প্রশান্তি স্বরূপ এয়ার কন্ডিশন। সে এয়ার কন্ডিশন ভগবান বুদ্ধ আমাদের জন্যে রেখে গেছেন। সে এয়ার কন্ডিশনের নাম শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। সে এয়ার কন্ডিশন পেয়ে অনেকেই সুখী হয়েছেন। তৎমধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরু শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে) মহোদয়। আপনারা অনেকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন তাঁর দেশনাগুলি শুনলেই মনে হয় নির্বান দর্শন হচ্ছে। যখনই আবার আমাদের বাড়ীতে চলে আসি তখনই আবার মনে হয় আমরা গ্রীষ্মকালীন প্রখর রোদে পুড়ে মরছি। উদাহরন স্বরূপ তাঁর একটি দেশনা আপনাদের নিকট প্রকাশ করছি।

একদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক উপাসিকদের প্রতি ধর্ম দেশনা দিচ্ছিলেন। এ ধর্মদেশনা সবাই গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন। তিনি বলছিলেন তোমরা নির্বাণের দিকে অগ্রসর হও। নির্বাণের দিকে অগ্রসর হলে তোমরা নিজে নিজেই জানতে বা অনুভব করতে পারবে তোমাদের কতটুকু জ্ঞান হয়েছে বা মুক্তি পেয়েছ। তা একটা আপন বোধগম্য ব্যাপার। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা প্রভৃতিকে তিনি ৪ (চার) ভাগ করে বলেন-যদি তোমরা নির্বাণের দিকে অগ্রসর হও, তবে প্রথমে ১ (এক) ভাগ অবিদ্যা-তৃষ্ণা, মান সহ মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা প্রভৃতি ধ্বংস বা ক্ষয় প্রাপ্ত হবে। তাতেই তোমাদের পরবর্তী জন্ম সীমিত হবে। সর্বোচ্চ মাত্র ৭

(সাত) জন্ম পরে নির্বাণ লাভ করতে পারবে। ৪ (চার) অপায়ে আর যেতে হবে না। তাকেই বলে স্রোতাপত্তি ফল লাভ। সে পথে বা আর্য অষ্টাঙ্গিঁক মার্গে ভবিষ্যতে নির্বান লাভ হবেই। পিছন দিকে যাওয়ার বাা পতনের আশংকা থাকবে না। শুধু মনুষ্যকুলে বা দেবকুলে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বার জন্মগ্রহন করতে হবে। যদি তোমরা আরও অগ্রসর হও, তবে তোমাদের নিত্য সঙ্গী অবিদ্যা তৃষ্ণা ও মান আর ও ১ (এক) ভাগ অর্থাৎ $\frac{২}{৪}$ ভাগ ধ্বংস বা ক্ষয় প্রাপ্ত হবে। সে সময় সকৃদাগামী ফল লাভ করতে পারবে। পরবর্তী জন্ম হবে মাত্র ২ (দুই) বার। তৎমধ্যে ১ (এক) বার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহন করে নির্বাণ যেতে পারবে। যদি তোমরা আরও নির্বাণের দিকে অগ্রসর হও, তবে তোমাদের অবিদ্যা তৃষ্ণা ও মান $\frac{৩}{৪}$ ভাগ ধ্বংস বা ক্ষয় প্রাপ্ত হলেই অনাগামী ফল লাভ করতে পারবে। ইহ জম্মে মৃত্যুর পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্ম লোকে নির্বান লাভ করতে সক্ষম হবে। যদি তোমরা আরও অগ্রসর হও, তবে তোমাদের অবশিষ্ট অবিদ্যা-তৃষ্ণা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হলে তোমাদের যাবতীয় দুঃখের কারন অবিদ্যা, তৃষ্ণা, মান প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ ৪ (চার) ভাগই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। যে উদ্দেশ্যে তোমরা অগ্রসর হয়েছ, সে উদ্দেশ্য তোমাদের পুর্ণতা অর্জন করতে পারবে। তার নাম পরম সুখ নির্বান।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমাদের প্রতি আর ও একটি নির্বাণের উদাহরন দিয়ে বলেন-ধর, ৪ (চার) জন লোক বরকল হতে কাপ্তাই এর দিকে যাত্রা দিল। ১ (এক) জন বাঁশের ভেলা (চালি) করে যাত্রা শুরু করে। তার কাপ্তাই যেতে অনেক দিন সময় লাগবে। ২য় জন একখানা নৌকা নিয়ে যাত্রা দিল। তার সময় 'লাগবে' (১ম ব্যক্তির চেয়ে) কম দিন। ৩য় জন এক খানা ইঞ্জিন চালিত নৌকা নিয়ে যাত্রা দিল। তার সময় লাগবে আরো কম দিন। ৪র্থ জন একখানা দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট জেট বোট নিয়ে কাপ্তাই এ যত্রা দিল। তার সময় লাগবে তার চেয়ে আরো কম। তা হলে তোমাদের বুঝতে হবে ১ম জন স্রোতাপত্তি মার্গ লাভী, তার নির্বানে পৌছতে সাত জম্ম লাগে, ২য় জন সর্কদাগামী সে দুই জম্মে, ৩য় জন অনাগামী সে এক জম্মে এবং ৪র্থ জন

অর্হৎ সে ইহ জন্মে নির্বান লাভ করতে পারবে। নির্বান লাভ করা যদিও খুবই সহজ ব্যাপার। আবার অন্যদিকে খুব কঠিন ব্যাপরও বটে। পুর্ব জন্মের পুন্য পারমী, ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অবলম্বন এবং নিজের প্রচেষ্টা থাকলে সহজ হয়ে থাকে। অন্যথায় খুব কঠিন ব্যাপার। যার যতটুকু জ্ঞান প্রচেষ্টা ও সামর্থ থাকবে তার ততটুকু মুক্তিলাভ বা অগ্রসর হতে সহজ হয় বা সে ততটুকু সহজে মুক্তিলাভ করতে পারবে।

অবশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপসিকাদের প্রতি দেশনায় বলেন- তোমরা মনুষ্য জন্ম লাভ করেছ, মনুষ্য জন্ম লাভ করা দুর্লভ, মনুষ্য জন্ম লাভ করে সদধর্ম শ্রবন করা দুর্লভ, সদ্ধর্ম শ্রবন করে সদ্ধর্ম লাভ করা আরো দুর্লভ। বুদ্ধের শিষ্য সাহচর্য লাভ করা দুর্লভ এবং সম্যক সমুদ্ধের দর্শন লাভ করা বড়ই দুর্লভ। যদি তোমরা নির্বান লাভ করতে চাও তবে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নির্বাণের দিকে অগ্রসর হও। নির্বান পথে বা আর্য অষ্টাঙ্গিঁক মার্গে যেন এলোমোলো না হয়। তাতে থাকতে হবে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নিরলস অধ্যবসায়। তোমাদের লক্ষ্য সঠিক হোক আশীর্বাদ দিয়ে আমার দেশনা আপাতত এখানে শেষ করলাম।

বুদ্ধ জ্ঞান অর্জন কর

আমি ছোট বেলায় অনেক কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও রাজনীতি বিদদের জীবনী পড়েছি। সবচেয়ে আমার পছন্দ ব্যক্তি হলেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। তাঁর জীবনী বার বার পড়েও ক্ষান্ত হতাম না। তাঁর লেখনী হতে বহু কবিতা, প্রবন্ধ ও সাহিত্য বিষয় পড়ে কিছু মাত্র হৃদয়ঙ্গঁম করেও মোহিত হতাম। আমার পরিণত বয়সে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর লেখনী সম্বন্ধীয় বই পড়ে সামান্যতম জ্ঞানার্জন করেছি। তাঁর লিখিত বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় বই সংগ্রহ করে দিতেন আমার বন্ধুবর রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক বাবু নন্দ লাল শর্মা। মধ্যে মধ্যে তাঁর সাথে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতাম। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধ্যান সমাধি থেকে উঠে যে সংগীত লিখেছেন তা শর্মা বাবুর বাসায় মন দিয়ে ক্যাসেট

শুনতাম। বিশ্ব কবির লিখিত যত বৌদ্ধ ধর্মীয় বই আছে প্রায় বই আমি পড়েছি। বই গুলি হাতে নিলে পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠতে ইচ্ছে হয় না। তাঁর লিখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হল মৈত্রী, করুনা, মুদিতা ও উপেক্ষা। পন্ডিত ঈশান চন্দ্র ঘোষের জাতক গ্রন্থের ভুমিকায় বিশ্ব কবি লিখেছেন।

"ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা ও আচরন আমার জীবনের প্রতিফলন"। তিনি এক বাক্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেছিলেন- "ভগবান বুদ্ধের একমাত্র মৈত্রী নিয়ে আমি বিশ্ব কবি হতে পেরেছি।"

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন বই পড়ে আমার মনে ধারনা জম্মে যে নিশ্চয়ই তিনি বুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। তা প্রমান করার জন্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট ব্যক্ত করি। উত্তরে তিনি বলেন-বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বুদ্ধ জ্ঞান পেয়েছেন। কি রকম বুদ্ধ জ্ঞান পেয়েছেন জান? একটা সুন্দর উদাহরন দিয়ে তিনি বলেন।

এক জায়গায় এক তুষ এর স্তুপ আছে। চড়ুই পাখী তুষ এর স্তুপ পেলে অন্য জায়গায় আহার করতে সহজে যেতে চায় না। তারা সারাক্ষন তুষ এর স্তুপে পা ও পাখা দিয়ে তুষ নেড়ে খেলা করে এবং ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র খুঁদ আহার করে আনন্দ উপভোগে মত্ত থাকে। ঠিক তেমনি বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও চড়ুই পাখীর মত সারাটা জীবন বুদ্ধ জ্ঞানের অনু পরমানু জ্ঞান সংগ্রহ করে সন্তুষ্ঠ হয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-বুদ্ধ জ্ঞান পেতে হলে আর্য অষ্টাঙ্গিক পথে চলে নব লোকোত্তর ধর্ম অর্জন বা আয়ত্ব করতে হয়। তা হল স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতপত্তি ফল, সকৃদাগামী মার্গ, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী মার্গ, অনাগামী ফল, অর্হৎ মার্গ, অর্হৎ ফল ও নির্বান।

অন্য একদিন দেশনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি মনীষি লৌকিক জ্ঞানের অধিকারী। তাঁদের মধ্যে কচিৎ ব্যক্তিই লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। তাঁরা সব সময় লৌকিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে অনেক কবিদের কবিতা গৃহীকালে পড়েছেন। এখনও অনেক কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন।

তৎমধ্যে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠ করা অনেক কবিতা তাঁর মুখে শুনেছি। বিভিন্ন কবিতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন-বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকোত্তর পুদগল নন, তিনি একজন লৌখিক জ্ঞানের অধিকারী মহান পুরুষ।

শ্রদ্ধেয় বনবন্তে আমাদের প্রতি উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে বলেন-তোমরা যাতে সর্ব দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে পার সে বিষয়ে সচেষ্ট হও এবং বুদ্ধ জ্ঞান অর্জন কর।

বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য নির্বান

রাত্রি বেলায় আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় অসংখ্য তারকা মন্ডল। সাধারন লোক বা কেউ এগুলির সংখ্যা কত বা ধারনা দিতে সক্ষম নয়। শুধু সম্যকক সমুদ্ধই এ গুলির সঠিক উত্তর দিতে পারেন। ত্রিপিটকে বর্ণিত আছে কোটি শত সহস্র চক্রবালের কথা। একত্রিশ লোক ভুমিতে এক চক্রবাল। এ গুলি সাধারন চর্ম চোখে দেখা বা সীমিত জ্ঞানে অনুমান করা বড়ই দুঃসাধ্য। যেমন যাদের প্রাথমিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা আছে মাত্র তাদের এম, এ ক্লাশের পাঠ সম্বন্ধে জানা দুঃসাধ্য। ঠিক তেমনি যাঁরা অর্হত্বফল লাভ করেছেন তাঁরা একত্রিশ লোক ভুমি সম্বন্ধে অবগত আছেন। বনভন্তের দেশনা ১ম খন্ডে পঞ্চ চক্ষুর কথা বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তবুও এখানে একটু আভাষ দেয়া হচ্ছে। যেমন চর্মচক্ষুতে এক যোজন বা দুই মাইল দেখা যায়। দেব চক্ষুতে আটারশত মাইল দেখা যায়। প্রজ্ঞা চক্ষুতে একত্রিশ লোক ভুমি দেখা যায়। সামন্ত চক্ষুতে সম্যক সম্বন্ধে ধ্যান জানা যায়। বুদ্ধ চক্ষুতে দশ সহস্র চক্রবাল সম্বন্ধে জানা বা দেখা যায়। সাধ্যানুযায়ী যাঁরা যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তাঁরাই সে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ব্যক্ত করতে পারেন।

সংক্ষেপে একত্রিশ লোক ভুমি সম্বন্ধে ধারনা দিচ্ছি। ৪ (চার) অপায়-নিরয়, অসুর প্রেত ও তির্য্যক। ৭ম সুগতিঃ-মনুষ্য লোক, চতুর্মহারাজিক, ত্রয়ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্মান রতি ও পরনির্মিত বশবর্তীদেব লোক।

১১ ব্রহ্ম ভুমিঃ- ব্রহ্ম পরিষদ, মহাব্রহ্মা, পরিত্তাভ অপ্রমানাভ, আভাস্বর, পরিত্তশুভ, অপ্রমানানশুভ, শুভাকীর্ণ, বৃহৎফল ও অসংঘসত্ত্ব ব্রহ্মভুমি।

৫ম শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভমিঃ- অবৃহাঃ, অতপ্ত, সুদর্শন, সুদর্শী, ও আকনিষ্ঠ রূপ ব্রহ্মভুমি।

৪ (চার) অরূপ ব্রহ্ম ভুমিঃ- আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন ও নৈব সংজ্ঞে না সজ্ঞায়তন অরূপ ব্রহ্ম ভুমি।

পরিনির্বাপিত না হওয়া পর্যন্ত সকল সত্ত্বগণ স্বীয় কর্মানুসারে কার্য্য কারন নীতিতে দশবিধ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রিশ লোকভুমিতে অনাদিকাল হতে বিচরন করতে করতে জন্ম, জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যু-দুঃখাদি ভোগ করে আসছে।

দশবিধ বন্ধনঃ- লোভ, দ্বেষ, মোহ, সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামাশ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য অহ্রী ও অনপত্রপা।

অষ্ট অক্ষন বিমুক্ত সময়ে একমাত্র বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনে লোকোত্তর নির্বান লাভ করেই সকল দুঃখের অবসান ঘটানো যায়।

অষ্ট অক্ষনঃ- অপায় ৪ + অসজ্ঞ ১ + অরূপ ১ + মিথ্যাদৃষ্টি ১ + অবুদ্ধকাল ১= মোট ৮।

বর্তমানে সুক্ষন কাজেই দানে লোভ ত্যাগ করা যায়। শীলে দ্বেষ ত্যাগ করা যায়। ভাবনায় বা বিদর্শনে মোহ বিদুরীত করা যায়। মানব জন্ম বড়ই দুর্লভ। ততোধিক দুর্লভ সদ্ধর্ম। এ মানব জন্ম সার্থক করার এখনই সময়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে যারা পঞ্চশীল লংঘন করে তারা মৃত্যুর পর ৪ অপায়ে অশেষ দুঃখ পায়। আর যাঁরা প্রতিনিয়ত পঞ্চশীল পালন করে বিভিন্ন পুণ্য কাজে জীবন অতিবাহিত করেন তাঁরা মৃত্যুর পর মনুষ্য লোকে ও স্বর্গলোকে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁদের মধ্যে পৃথকজন, মার্গফল লাভী ও বোধিসত্ত্বগণ এ সকল কামলোকে বিচরণ করেন। মনুষ্য লোকের আয়ু কখনো ১০০ বৎসরের কম, কখনো লক্ষাধিক বৎসর। স্বর্গলোকের সত্ত্বগণের আয়ু কমপক্ষে ৯০ লক্ষ বৎসর এবং উর্দ্ধে ৯২১ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর। স্বর্গলোকে মাতৃ জঠরে জন্ম হয় না। খাদ্য গ্রহন করেও পায়খানা প্রস্রাব হয় না কারন এ আহার দিব্য ওজ এবং মৃত্যুর পর মৃতদেহ অদৃশ্য হয়ে যায়।

যাঁরা ব্রহ্ম লোকে জন্ম গ্রহন করেন তাঁরা হচ্ছেন শমথ ভাবনা কারী। তাঁরা ১ম হতে ৪র্থ ধ্যান লাভী হন। রূপ ভুমিতে চন্দ্র সুর্য নেই। উৎপন্ন সত্ত্বগনের দেহ জ্যোতিতে সর্বত্র আলোকিত হয়। এখানে ধ্যানাহার ব্যতিত অন্য আহার নেই। কোন নারী নেই কাজেই ক্লেশ কাম নেই। কোন নারী ধ্যান বলে এ সকল ভুমিতে উৎপন্ন হলে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁদের আয়ু কমপক্ষে $\frac{১}{৩}$ কল্প, উর্ধ্বে ৫০০ কল্প।

পঞ্চ শুদ্ধাবাস ব্রহ্ম লোক শুধুমাত্র আনাগামী সত্ত্বের উৎপন্ন ভূমি। তাঁরা সেখান হতে পরিনির্বাপিত হন। তাঁদের আয়ু ১(এক) হাজার কল্প হতে ১৬ (ষোল) হাজার কল্প বৎসর।

৪(চার) অরুপ ব্রহ্মালোকে যাঁরা উৎপন্ন হন, তাঁরা অরূপ ধ্যানেই লাভ করে থাকেন। তাঁদের কোন রূপ বা দেহ নেই। ওখান কার আয়ু কমপক্ষে ২০ হাজার কল্প হতে উর্ধ্বে ৮৪ হাজার কল্প বৎসর।

স্বর্গ ও ব্রহ্ম লোক বৌদ্ধ ধর্মের কাম্য নয়। বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য নির্বান। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রায় সময় বলে থাকেন দুর্বলের স্বর্গ কামনা। উত্তমের ব্রহ্মলোক কামনা। উত্তম হতে উত্তমের নির্বান কামনা। স্বর্গসুখ ক্ষনিকের জন্যে ও ব্রহ্ম সুখ কিছু দীর্ঘ কালের জন্যে। এ সুখগুলি অতিক্রম করে নির্বান সুখ অর্জন করতে হবে। যে কোন ধ্যানে জ্ঞান বাড়ে। যেমন অষ্ট সমাপত্তি ধ্যানে একত্রিশ লোক ভুমির শীর্ষস্থান পর্যন্ত লাভ করা যায়। কিন্তু মার্গফল লাভ করা যায় না। ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত পথ বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে একত্রিশ লোকভুমি অতিক্রম করা যায়। অর্থাৎ চারিমার্গ, চারি ফল ও নির্বান লাভ করা যায়। নির্বান লাভ করতে পারলে একত্রিশ লোক ভুমিতে বারবার জন্ম গ্রহন করে বিভিন্ন দুঃখ ভোগ করতে হবে না। বিভিন্ন পুণ্য কাজ ও শীল পালনে স্বর্গে যাওয়া যায়। শমথ ভাবনা বা সমাপত্তি ধ্যানে রূপব্রহ্ম লোক ও অরূপ ব্রহ্মালোকে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত ধ্যান সুখে অতিবাহিত করা যায় । কিন্তু বিদর্শন ভাবনায় নব লোকোত্তর ধর্ম বা নির্বান লাভ করা যায়। স্বর্গসুখ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যে উদাহরন দিয়েছেন, তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যেমন কোন এক লোক রাঙ্গামাটি হতে ঢাকায় গেল। যতদিন পর্যন্ত তার পকেটে টাকা পয়সা থাকবে ততদিন ঢাকায় অবস্থান করতে

পারবে। টাকা পয়সা শেষ হলে পুনরায় রাঙ্গামাটিতে চলে আসতে হবে। ঠিক তেমনি কোন লোক এ মনুষ্য লোকে পুণ্যকাজ ও শীল পালন করে মৃত্যুর পর স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়। যতদিন পর্যন্ত তার আয়ূ ক্ষয়, পুণ্যক্ষয় ও শীলক্ষয় না ঘটবে ততদিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। এখানে তার জন্যে মুলধন হল পুণ্য ও শীল পালন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে স্বর্গলাভ করাকে আখ্যায়িত করেছেন দুর্বলের স্বর্গ কামনা। প্রজ্ঞাচক্ষু সম্পন্ন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে অনেক সময় দেশনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভুত, প্রেত, যক্ষ বৃক্ষদেবতা, পশু, পক্ষী, বিভিন্ন জীব জন্তু, নরক, নাগ, দেবতা, মার, এবং ব্রহ্মা সম্বন্ধে দেশনা করে থাকেন। পরবর্তী খন্ড অর্থাৎ বনভন্তের ৪র্থ খন্ডে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রকাশ করার জন্যে আশা রাখি। আপাততঃ ব্রহ্ম লোক সম্বন্ধে একটা উদাহরন প্রকাশ করছি।

অনেক সময় আমরা অর্থাৎ অষ্ট শীল পা'লন কারীরা সময় ও সুযোগ বুঝে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান করি থাকি। যেমন পরিচিত লোক বা বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুর পর কোথায় জন্ম গ্রহন করেছেন তা শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হতে জানতে পারি। একদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে জিজ্ঞাসা করলাম ভন্তে, মহান সাধক রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব কোথায় জন্ম গ্রহন করেছেন? তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন ব্রহ্মলোকে। এরকম সাধকরাই ব্রহ্ম লোকে অবস্থান করেন। তিনি এখন ঝুলন্ত অবস্থায় আছেন। আবার মনুষ্যলোকে আসবেন। আম পেকে গেলে যেমন মাটিতে পড়ে যায় ঠিক তেমনি মহান সাধক রাম কৃষ্ণ পরম হংসদেব মনুষ্য লোকের প্রতি আকর্ষন আছে। অন্য এক সময় তিনি জনৈক হিন্দু ভদ্রলোককে বলেছিলেন- কয়েকতলা ভবন হ'তে নীচে বা মাটিতে যেভাবে দেখা যায় ঠিক সেভাবে রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব পৃথিবীকে দেখতে পান। এমনকি আমরা যখন তাঁর সম্বন্ধে বলাবলি করে থাকি তখন তিনি চেয়ে থাকেন ও শুনতে পান। যাঁরা ব্রহ্ম চর্য্যা পালন করে ধ্যান সমাধি করেন তাঁরা ব্রহ্ম লোকে উৎপন্ন হন।

অন্য এক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দেশনা প্রসঙ্গে রাম কৃষ্ণ পরম হংস দেবের প্রধান শিষ্য মহান সাধক বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন তিনি এখন অরূপ ব্রহ্ম লোকে। সেখানে কোন রূপ নেই বলে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি ও নেই।

পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্যে আর একটি উদাহরণ দিয়ে এ নিবন্ধটি শেষ করছি। ভগবান বুদ্ধ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করে চিন্তা করলেন এ ধর্ম খুবই গভীর ও পন্ডিত জনের বেদনীয়। সুতরাং সাধারণ লোক এ ধর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। তখন ব্রহ্ম লোক হতে মহা ব্রহ্মা এসে ভগবান বুদ্ধকে প্রার্থনা করে বললেন-ভগবান, পৃথিবীতে অনেক লোক আছে তাঁরা আপনার ধর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম। অনুগ্রহ পুর্বক দেব মনুষ্যের হিতার্থে আপনার নির্বান ধর্ম প্রচার করুন। প্রথমে তিনি অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান লাভী আলাড় কালাম ও রাম পুত্র রুদ্রককে স্মরন করলেন। বুদ্ধ চক্ষুতে দেখলেন আলাড় কালাম এক সপ্তাহ আগে দেহ ত্যাগ করে অরূপ ব্রহ্ম লোকে উৎপন্ন হয়েছেন। রাম পুত্র রুদ্রক গতকাল কালগত হয়ে তিনি ও অরূপ ব্রহ্ম লোকে উৎপন্ন হয়েছেন। অতপর ভগবান বুদ্ধ পঞ্চ বর্গীয় ভিক্ষু সংঘকে ধর্মচক্র প্রবর্তন সুত্র দেশনা বা নির্বান ধর্ম দেশনা করে তাদেরকে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ভিক্ষু শ্রমন ও উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রায় সময় দেশনা প্রসঙ্গে বলেন-ভগবান বুদ্ধের ধর্মের আয়ু ৫ হাজার বৎসর। বর্তমানে ২৫৪০ বুদ্ধাব্দ চলছে। যদি কেউ উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত বুদ্ধের নির্দেশিত পথ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি নবলোকোত্তর ধর্মের অধিকারী হতে পারবে। পার্থিক জগতের যাবতীয় সুখ, স্বর্গ সুখ ও ব্রহ্ম সুখ অর্থাৎ একত্রিশ লোকভূমির সুখ নির্বান সুখের সাথে তুলনা করলে কিছুই নয়। তোমাদের লক্ষ্য অচ্যুতভাবে ঠিক রাখ। বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য নির্বান।

কোথা হতে দুঃখের সৃষ্টি হয়?

আজ ৩০ শে জুলাই ১৯৯৬ ইংরেজী সোমবার। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সাধনা কুঠিরের উপরের তলা। সময় ভোর বেলা। তাঁর শিষ্যদেরকে দেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি যে লোকাত্তর দেশনা প্রদান করেন তা আমার শারীরিক অসুস্থতা ও জ্ঞান পরিধির অভাবে সম্পুর্ণ ধারন করতে পারেনি। তবুও যৎ সামান্য ধারন করেছি তা আপনাদের নিকট প্রকাশ করছি। তাঁর দেশনার

প্রধান সারমর্ম হল কোথা হতে দুঃখের সৃষ্টি হয়? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন উদাহরন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন-অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান হতে এ দুঃখগুলির সৃষ্টি হয়। অবিদ্যার অর্থ না জানা। কি না জানা। দুঃখ কি না জানা। দুঃখ সমুদয় কি না জানা। দুঃখের নিরোধ কিসে হয় না জানা। দুঃখ নিরোধের পথ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে না জানা। অর্থাৎ কোন কিছু সম্বন্ধে না জানা বা অজ্ঞানতাই অবিদ্যা।

তিনি বলেন- তৃষ্ণা হল দুঃখের কারন। কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা। পঞ্চ ইন্দিয়ে অসার সুখ ভোগ করাকে কাম তৃষ্ণা বলে। ভব তৃষ্ণা অর্থ হল ভবে ভবে অর্থাৎ কামলোকে ও রূপলোকে ঘুরে ঘুরে জন্ম গ্রহন করে সুখ ভোগ করা। বিভব তৃষ্ণা হল ~~অরূপলোকে অনন্তকাল পর্যন্ত অবস্থান করে ধ্যান সুখে মগ্ন থাকা।~~ উচ্ছেদ জনিত বীত তৃষ্ণা।

উপাদন অর্থ উৎস, উৎপত্তি মূল বুঝায়। উপাদান চার প্রকার। কাম উপাদান, আত্ম উপাদান, দৃষ্টি উপাদান ও শীলব্রত উপাদান। কাম উপাদানঃ- পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক ইন্দ্রিয়ে সব সময় দৃঢ়ভাবে গ্রহন করে। কি গ্রহন করে? গ্রহন করে লোভ মোহ, দ্বেষ মোহ অর্থাৎ লোভ, দ্বেষ মোহ গ্রহন করে। যেমন উদাহরন স্বরুপ সাপ সব সময় বেঙ তালাশ করে। ঠিক সেরুপ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শকে সব সময় তালাশ করে ও পিছনে পিছনে ধরার জন্য ধাওয়া করে। তাতে সুখের পরিবর্তে দুঃখের ভাগী হয়।

আত্ম উপাদান অর্থ হল দেহের মধ্যে আত্মা নামে এক জীব আছে। সেটা অজর অমর, শাশ্বত বলে মনে করে। তাতে ভীষন অজ্ঞানতার সৃষ্টি হয়ে দুঃখ মুক্তির পথ খুঁজে পায়না। তাতে অনন্তকাল পর্যন্ত দুঃখে কালাতিপাত করে। আত্মা যে অনিত্য, দঃখ, অনাত্মা ও ক্ষয় ব্যয় শীল বুঝতে সক্ষম নয়।

দৃষ্টি উপাদান ঃ- দৃষ্টি উপাদান হল মিথ্যাদৃষ্টি উপাদান অর্থাৎ কোন বিষয় বা জিনিষ ভাল মন্দ বিবেচনা করে মন্দটা বাদ দিয়ে ভালটা গ্রহন করতে পারে না। যেমন অন্ধ ব্যক্তি যে কোন জিনিষ ভাল মন্দ বিচার করতে সক্ষম নয়। ঠিক দৃষ্টি উপাদান গৃহীত ব্যক্তি ও সেরূপ সব সময় সুখ মনে করে দুঃখে পতিত হয়।

শীলব্রত উপাদানঃ-কেউ কেউ নির্বান ধর্ম বুঝতে না পেরে অন্য ধর্ম, পর ধর্ম, হীন ধর্ম ও মিথ্যা ধর্ম আচরন করতে থাকে। তারা মনে করে এ ধর্মে সুখ আছে, মুক্তি আছে ও শান্তি আছে। তাতে তারা সুখের পিছনে, মুক্তির পিছনে. ও শান্তির পিছনে ধাবিত হয়ে বিপরীতে ফল লাভ করে থাকে। যেমন গরুর মত কচি ঘাস ও পাতা খাওয়াকে গোব্রত বলে। কুকুরের মত মাটি হতে জিহ্বা বা মুখ দিয়ে আহার করা। এটাকে কুকুর ব্রত বলে।

সকল দুঃখের মুল অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কাম উপাদান, আত্ম উপাদান, দৃষ্টি উপাদান ও শীলব্রত উপাদান আছে বলে মানুষ সহজে মূক্তির পথ খুঁজে পায় না। এ সমস্ত উপাদান ধ্বংস হলে কি হয় জান? সত্ত্ব মরে, আত্মা মরে ও মার মরে। যেমন চারি আর্য সত্যের মধ্যে দুঃখ সত্য হৃদয়ঙ্গম হলে সৎকায় দৃষ্টি বা আত্ম বাদ সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হয়। দুঃখ সমুদয় নিরোধে উচ্ছেদ দৃষ্টি সম্পুর্ণ রূপে উচ্ছেদ হয়। নিরোধ সত্য দর্শনে শাশ্বত দৃষ্টি সম্পুর্ণ রূপে উচ্ছেদ হয়। মার্গ সত্য দর্শনে অক্রিয় দৃষ্টি সম্পুর্ণ রূপে উচ্ছেদ হয়।

যারা উচ্ছেদ দৃষ্টি বাদী তারা এক গুয়ে। পুনঃ জন্ম নেই বলে, মরনের পর ও দুঃখ নেই, মরনের পর সবশেষ হয়ে যায়, এ রকম তারা বলে থাকে। তাদের মধ্যে বহু দোষ থাকে।

সৎকায় দৃষ্টি বাদীরা পঞ্চ স্কন্ধে আমি আছি বা আমার ধারণা করে। পঞ্চ স্কন্ধ বলতে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে বুঝায়।

অক্রিয়াদৃষ্টি বাদীরা দান, শীল, ভাবনা ও পাপ পুন্যের বিশ্বাস করেনা। এগুলির কোন ফলও নেই এ ধারনা তাদের বদ্ধমুল।

শ্বাশ্বত দৃষ্টি বাদীরা কিছু মাত্র ধার্মিক থাকে, পরকাল ও বিশ্বাস করে, কিন্তু তাদেরকে বুঝানো খুবই কঠিন। তারা সব সময় নিজকে ভাল, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে উদাত্ত কণ্ঠে বলেন- তোমরা জ্ঞান আহরন কর। কিসের জ্ঞান জান? শুধু লোকোত্তর জ্ঞান। লোকোত্তর জ্ঞানে সব দুঃখের অবসান ঘটে। সুতরাং তোমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান ধ্বংস করে পরম সুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষ কর। নির্বান এমন অবস্থা,

তা অন্য কেউ দেখিয়ে দিতে পারবে না। যেমন মিলিন্দ রাজা নাগসেন স্থবিরকে বলেছিলেন-নির্বান কোথায়? দেখায়ে দিন। তিনি বলেছিলেন-মহারাজ, বাতাস আছে? রাজা বললেন-হ্যাঁ আছে। স্থবির বললেন-তা হলে বাতাস দেখিয়ে দিন। রাজা বললেন-বাতাস দেখিয়ে দেয়া যায় না। শুধু অনুভব করা যায়। স্থবির আবার বললেন-তা হলে নির্বান ও দেখিয়ে দেয়া যায় না। শুধু নিজে নিজে অনুভব করা যায়। এ বলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সবাইকে নির্বান প্রত্যক্ষ করার জন্যে উৎসাহিত করে তাঁর দেশনার ইতি টানলেন।

জ্ঞানের বোরকা পরিধান কর

একদিন রাজ বনবিহার দেশনালয়ে অনেক উপাসক উপাসিকা উপস্থিত হয়েছেন। তৎমধ্যে ৪/৫ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও আছেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। বর্তমানে ফেনী পি, টি, আই এ প্রশিক্ষন নিচ্ছেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনার ফাঁকে তাঁরা বললেন-ভন্তে, আমাদের সামান্য জিজ্ঞাস্য আছে। বনভন্তে বললেন- বলতে পার। তাঁরা বললেন-আমরা যেখানে আছি সেখানে অনেক মুসলিম শিক্ষয়িত্রী আছেন। তাঁরা আমাদেরকে অনেক প্রশ্ন করে থাকেন। সেগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারিনি। সেজন্য আমাদের লজ্জা লাগে। আপনার নিকট প্রশ্ন গুলির সমাধান চাই। প্রশ্নের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন হল তাঁরা বোরকা পরিধান করেন। আমরা বোরকা পরিধান করি না। সেজন্য আমাদেরকে 'বেহায়া' বলে আখ্যায়িত করেন। এটার সঠিক উত্তর আমরা দিতে পারিনি। সুতরাং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট এটার সঠিক উত্তরের জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বললেন-বোরকা দুই প্রকার। জ্ঞানের বোরকা ও কাপড়ের বোরকা। জ্ঞানের বোরকা পরিধান করলে পাপে স্পর্শ করতে না পারে। কাপড়ের বোরকা পরিধান করলে পাপে স্পর্শ করতে পারে। সুতরাং তোমরা জ্ঞানের বোরকা পরিধান কর; পাপ যেন তোমাদেরকে স্পর্শ করতে না পারে। বিশুদ্ধ ভাবে পঞ্চশীল পালন কর। কথাবার্তা, কাজকর্ম ও বেশভুষা মার্জিত ভাবে চলা উচিত। যেমন ব্লাউজের হাত হাতের কনুই পর্যন্ত ও নীচে কোমর পর্যন্ত

থাকে। শরীর নমনীয় ও প্রসাধনী ব্যবহার করা৷ উচিত নয়। সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। মনকে সব সময় পবিত্র রেখো। মানুষের মন থেকে সবকিছু অর্থাৎ ভাল মন্দ উৎপত্তি হয়। মন্দটা বাদ দিয়ে ভালটা গ্রহন কর। তাতে তোমরা ইহকাল ও পরকাল সুখে অতিবাহিত করতে পারবে। শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে তাঁরা অতীব সন্তুষ্ট হয়েছেন। দেশনালয়ে অন্যান্য উপাসক-উপাসিকারা ও বনভন্তের উক্ত দেশনা শুনে খুবই উৎফুল্ল চিত্তে গ্রহন করেছেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপদেশ ও বকুনি দিয়ে উপাসক-উপাসিকাদেরকে জ্ঞানদান করে থাকেন। এ ব্যাপারে পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্যে আর ও কিছুটা ঘটনাবলী প্রকাশ করছি। একদিন আমার সুপরিচিতা জনৈক মহিলা আমাকে বললেন-দাদা, অনুগ্রহ পুর্বক শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে আমার বাসায় নেয়ার জন্যে ফাং (আমন্ত্রন) করে দিন। আমার-ভয় লাগে। আপনি আমার পক্ষ হয়ে ফাং করে দিলে ভাল হয়। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম এটা একটা পুন্যের কাজ। উক্ত ভদ্র মহিলা কস্‌মেটিক ব্যবহার করার অভ্যাস আছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বন্দনা করে ফাং এর জন্যে প্রার্থনা করার সাথে সাথেই তিনি তোয়ালে নাকে মুখে দিয়ে বললেন-"মিলা বাচ্ পাং অর"। হাক্‌খনে ওগোলানি এব। যা-যা। "এটার অর্থ হল সুগন্ধে প্রসাধনীর গন্ধ বা মেয়েলোকের গন্ধ সহ্য করতে পারছি না। হঠাৎ বমি আসতে পারে । এখান থেকে চলে যাও। সে মহিলা চলে যাওয়াার পর আমি বসে আছি। তিনি আমাকে বললন-তুমি ও চলে যাও। একথা গুলি বলার পর উপস্থিত সবাই হেসে উঠলেন। কালক্রমে দেখা গেল উক্ত মহিলা সাদাসিদে ভাবে চলাফেরা করেন এবং কোন রকম কস্‌মেটিক ব্যবহার করেন না। তাহলে দেখ যায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বকুনি অমৃতের সমান কাজ করে।

আর একদিন জনৈকা এম, এ ক্লাশের ছাত্রী শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট উপদেশ দানের প্রার্থনা জানালেন। তিনি অতি সংক্ষেপে উপদেশ দিয়ে বলেন-"দেখলে দেখতে পার, শুনলে শুনতে পার, বুঝলে বুঝতে পার, এবং অনুমান করলে অনুমান করতে পার। কিন্তু আসক্ত হই ও না। "এ সংক্ষিপ্ত উপদেশটি যাঁদের জ্ঞান ভান্ডার আছে তাঁরাই উক্ত উপদেশটির যথাযথ মুল্যয়ন করতে পারবেন।

সম্মানিত উপসিকাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আগামীতে অর্থাৎ "বনভন্তের দেশনা" ৪র্থ খন্ডে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মুখনিঃসৃত অভিজ্ঞা পুর্ণ এ ধরনের রহস্য মুলক ঘটনাবলী উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে পরিবেশন করার আশা রাখি।

সৎসংগী না পেলে একাকী থাকা ভাল

আজ ৫ই আগষ্ট ১৯৯৬ইং রোজ সোমবার। স্থান শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সাধনা কুঠিরের উপরের তলা। সন্ধ্যায় তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্ম দেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি দেশনায় বলেন-সঙ্গী সাথী অনেক প্রকার আছে। তৎমধ্যে সৎসংগী পাওয়া বিরল। সৎসংগী সব সময় সৎপরামর্শ, সৎউপদেশ ও সৎজ্ঞান বিতরন করেন। আর অন্যান্য সংগীরা বিপরীত দিকে পরিচালিত করে। তাহলে তোমরা-

একাকী বিহার শ্রেয় ঃ
আপনি আপন,
মুর্খ হতে সহায়তা
নাহি প্রয়োজন।
না করিয়া পাপ তুমি
কর একা বিচরন।।

মানুষ সাধারণত বিভিন্ন দলে অন্তর্ভুক্ত থাকে। তারা বিভিন্ন পাপে জড়িত থাকে। পাপ করতে লজ্জা বোধ করে না। পাপে লজ্জা মোটে ও বুঝে না। তারা সব সময় মনে করে তাদের কর্থাবার্তা ও কাজ কর্ম সঠিক। অন্য জনের গুলি ভুল ও মিথ্য। আসলে তারা মুর্খ। শিক্ষিত হোক অথবা অশিক্ষিত হোক তাদের ৬টি দোষ থাকে। তারা ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল, দোষকে নির্দোষ, নির্দোষকে দোষ, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করে। মুর্খরা সহজে মুক্ত হতে পারে না। অন্যান্য ধর্মালম্বীদের তো দুরের কথা, এমন কি নিজ ধর্মালম্বীর লোক ও এই পাপ করে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-চারি আর্যসত্য না জানিলে, না বুঝিলে, প্রতীত্য সমুৎপাদ না জানিলে, না বুঝিলে নির্বান ধর্মের দিকে হাত বাড়াই ও না।

আগে মার্মা ভিক্ষুরা চারি আর্য্য সত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি পুঙ্খানপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করতে অপারগ ছিল বিধায় পার্বত্য অঞ্চলে তত ধর্মের উন্নতি হয়নি। যেহেতু বৌদ্ধধর্ম তত সহজ নয়। ভগবান বুদ্ধও ৬ (ছয়) বৎসর কঠোর সাধনা করে বুদ্ধত্ব জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি। অবশেষে তিনি নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান ও সুজাতা প্রদত্ত পায়স অন্ন খেয়ে বোধিবৃক্ষ তলে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তিনি ৩৭ প্রকার বোধি পক্ষীয় ধর্ম লাভ করে বলেছিলেন-নৈরঞ্জনা নদী আমার বহু উপকারী, উপসিকা সুজাতা ও বোধিবৃক্ষ আমার বহু উপকারী।

তিনি বলেন মহাউপাসিকা বিশাখা সহ বহু উপাসিকা ধর্মের উন্নতি সাধন করেছে। সে সময় ভিক্ষুরা উপাসিকাদেরকে দয়া করে নির্বাণের দিকে পরিচালিত করত। কিন্তু বর্তমানে কতিপয় দুঃশীল ভিক্ষুরা বিপরীত দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

কে নেবে তোর রক্ষার ভার,
সামনে চল না,
নইলে যাবি যমের দ্বার।

বর্তমানে অনাচারী ভিক্ষুরা যে ভাবে নারী নিয়ে পাশা খেলছে; ভবিষ্যতে কর্মের ন্যায়দন্ডে তাদের বিচার হবে। অধিকন্তু বর্তমানে ও বিচার হওয়া উচিত। সম্রাট অশোকের আমলে ৬০ হাজার অনাচারী ভিক্ষুর শাস্তি হয়েছে। তাদের চীবর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। বর্তমানে সে রকম আজ্ঞাচক্র বিদ্যমান নেই বলেই অনাচারী ভিক্ষুগন সংঘে স্থান পাচ্ছে। আজ্ঞা চক্রর সাথে ধর্মচক্র এগিয়ে যেতে পারলে সুখ হয় ও নির্বান অধিগত হওয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে নানা প্রকার যুক্তি ও উপমা দিয়ে নির্বান অধিগত করার জন্যে উপদেশ, শিক্ষা, জ্ঞান ও ট্রেনিং নেয়ার নির্দেশ দেন। নির্বাণের উপদেশ, শিক্ষা, জ্ঞান ও ট্রেনিং নেয়ার মাধ্যমে তোমাদের আত্মদমন, চিত্তদমন ও ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে। শীল শিক্ষার দ্বারা তোমাদের ৮টি ব্যতিক্রম ক্লেশ সম্পুর্ণ রূপে ধ্বংস হবে। সমাধি শিক্ষার দ্বারা তোমাদের ৫টি পর্যটন ক্লেশ ধ্বংস হবে। প্রজ্ঞা শিক্ষার দ্বারা তোমাদের ৭টি অনুশয় ধ্বংশ হবে। যেমন কাম অনুশয়, ভব অনুশয়, বিচিকিৎসা অনুশয়,

অবিদ্যা অনুশয়, মান অনুশয়, মিথ্যা দৃষ্টি অনুশয় ও প্রতিষ অনুশয়। আলম্বন পেলেই অনুশয় গুলি জেগে উঠে।

অনুশয়ের একটি উপমা দিয়ে তিনি বলেন-যেমন ধর, কোন এক লোক আমগাছের নীচে ঘুমিয়ে আছে ইত্যোবসরে একটি পাকা আম তার হাতের কাছ পড়ে রয়েছে। সে ঘুম থেকে উঠে আমটি দেখার সাথে সাথে তার আম খাওয়ার ইচ্ছা জাগল অথচ তা ঘুমাবার আগে ছিলনা। এখানে তার ঘুম হল সুপ্ত অনুশয়। জেগে উঠে আম খাওয়ার ইচ্ছা হল অনুশয়ের ~~আর~~ জাগরিত অবস্থা আর ঘুম থেকে জেগে আম দেখা হল অনুকুল নিমিত্ত বা আলম্বন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো একটি উপমা দিয়ে বলেন-য়েমন ধর, একজন লোক এক জায়গায় বসে আছে। তার সামনে একজন যুবতী নারী আসছে। যদি সে আসক্ত যুক্ত ভাবে উক্ত যুবতীকে দর্শন করে তার সুপ্ত অনুশয় জেগে উঠবে। যদি সে অনাসক্ত ভাবে উক্ত যুবতীকে দর্শন করে তার অনুশয় ধবংশ হবে। তাহলে অনাসক্ত ভাবে থাকার উপায় কি? অনাসক্তভাবে থাকার একমাত্র উপায় দর্শনে স্ত্রী নেই, পুরুষ নেই, আত্মা নেই, সত্ব নেই এবং কোন জীব ও নেই বলে জানতে হবে। শুধু দর্শন করতে হবে চারি মহাভুত। যেমন আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু। এ চারি মহাভুত দর্শন করলে অনুশয় জাগরিত হবে না।

তিনি আরো বলেন-নির্বান লাভ করতে হলে ৮টি ব্যতিক্রম ক্লেশ ৫টি পর্যটন ক্লেশ এবং ৭টি অনুশয় ক্লেশ বীর বিক্রমে ধ্বংস করার জন্যে সচেষ্ট হও। যারা এ ২০টি ক্লেশ সম্পুর্ণ রুপে ধ্বংস করতে পারবে তারা ইহ জীবন সার্থক বলে মনে করতে পারবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-মানুষ অপরাধ করলে কারাগারে বন্দীবস্থায় শাস্তি ভোগ করে। ঠিক সে রকম এ পৃথিবীটা ও কারাগার সদৃশ। বারবার জন্ম গ্রহন করা মহা দুঃখজনক । এ দুঃখ থেকে কি ভাবে মুক্ত হওয়া যায়? তা হলে আপিল কর। কি রকম আপিল? অবিদ্যা কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার আপিল। তৃঞ্চা কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার আপিল। আলস্য, তন্দ্রা, ঘুম ও চঞ্চলতা কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার আপিল কর। নির্বান প্রত্যক্ষ করলে অবিদ্যা, তৃঞ্চা, আলস্য, তন্দ্রা, ঘুম, চঞ্চলতা প্রভৃতি চিরতরে চলে যাবে। এগুলো দুর্বলতা ও অকর্মন্যতার লক্ষন। সারিপুত্র মোদগলায়ন ৩০ বৎসর ঘুম যাননি।

তিনি আরো বলেন সিদ্ধার্থ যখন জন্ম গ্রহন করেন ঋষি কালদেবলের বয়স তখন শত বৎসরের মত। কালদেবলের ভাগিনা নালকের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বৎসর। সিদ্ধার্থ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করবেন তখন নালককে প্রব্রজ্যা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। নালকের প্রতি ঋষির নির্দেশ "যত ঘুম তত দুঃখ" যত দুঃখ তত ঘুম। ভিক্ষু শ্রমনদের মাত্র ৪ ঘন্টা ঘুমানো উচিত। গৃহীদের জন্যে মাত্র ৬ ঘন্টা। ঘুম যদি দুঃখ হয় সেটা পাপ ও বটে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-ভগবান বুদ্ধের সময় অবস্থা স্বাভাবিক ছিল। সে সময় অনায়াসে অর্হত্বফল লাভ করতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা আছে। তবে এখন ও সময় আছে ভগবান বুদ্ধের আইন কঠের করলে মার্গফল লাভ করাা যায়। কি খাব? কোথায় খাব? কে দেবে? আমি কস্ট পাচ্ছি। আমার বিছানা কোথায়? আমি কোথায় শয়ন করব এ হীন চিন্তা পরিহার করলে নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করতে পারবে।

বিছানা সম্বন্ধে তিনি বলেন-পৃথিবীই বিছানা। গাছের নীচে পাতার বিছানা খুবই উপযুক্ত। আমি নিজেই ছিলাম। ঝামেলা নেই। বুদ্ধের আইনে অবিদ্যা তৃঞ্চা দুঃখ। মারেও দুঃখ পায়। মার সিদ্ধার্থকে বলেছিল-তুমি সামান্য মানব। তুমি চুরি করে পালিয়ে এসেছ। তুমি এখান থেকে যাও। না হলে তোমাকে খন্ড খন্ড করে নৈরঞ্জনা নদীতে ভাসিয়ে দেবো। শেষ পর্যন্ত মার বুদ্ধের কাছে পরাস্ত হয়ে চলে যেতে বাধ্য হল।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে জোর দিয়ে বলেন-তোমরা জ্ঞানের বলে উচ্চতা লাভ কর। লোভ, দ্বেষ মোহহীন ভাবে থাকলে অচিরেই তোমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। তাতে তোমাদের চিত্তের অনাবিল পরম সুখ নির্বান লাভ করতে পারবে।

কি সুখ? সুখ কোথায়?

আজ ৬ ই আগষ্ট/৯৬ইং মঙ্গলবার ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে শিষ্যদেরকে তিনি তাঁর ধ্যান কুঠিরে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন।

তিনি প্রথমেই বলেন-যারা তির্যক লোকে আছে তারা কি সুখে আছে? যারা মনুষ্যলোকে আছে তারা কি সুখে আছে? যারা স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকে আছে

তাঁরা কি সুখে আছে? সুখ না থাকলে সেখানে যাবে কেন? তাঁরা শুধু লৌকিক সুখে মত্ত থাকে। লৌকিক সুখে মুক্ত হতে পারে না। পুনরায় জন্ম গ্রহন করতে হয়। পুনর্জন্মে বিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-যাবতীয় তৃষ্ণাক্ষয় করতে পারলে পুনর্জন্ম হয়না। মনে মনে অহংকার না করলে পুনর্জন্ম হয় না। আত্মা হল মানুষের মুক্তির অন্তরায়।

আত্মাকে সুদমিত যখন করিবে। তাঁকে দেবতা, ব্রহ্মা, মার কেউ পরাজয় করতে পারবে না; দুর্লভ অর্হত্ব ফল তখন পাইবে। যে নিত্য সংযমী ও আত্মজয়ী, নিজকে যে জয় করতে পেরেছে সে জয় সহস্রজনকে জয় করার চেয়ে ও শ্রেষ্ট জয়।

তিনি বলেন-বর্তমানে ছাত্র নেতা ও বিভিন্ন নেতা দেখা যায়। তারা নিজে ও মুক্ত নয়, অপর কে ও মুক্ত করতে পারে না। ভিক্ষুদের মধ্যে ও সৎপুরুষ ভিক্ষু ও অসৎপুরুষ ভিক্ষু আছে। যারা সৎপুরুষ ভিক্ষু তাঁরা অপরকে অবজ্ঞা নিন্দা ও ঘৃনা করেন না। নিজকে ও আত্ম প্রশংসা করেন না। জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন করে ছিলেন যে, বুদ্ধ কি সর্বজ্ঞ? বুদ্ধ বললেন সর্বজ্ঞতা বললে নিন্দা করা হয়। তবে তিনি কি? সম্যক সমুদ্ধ নিজের ও অপরের পুর্ব নিবাস সম্বন্ধে ভাল ভাবে জানেন। জীবের বা সত্বদের গতি সম্বন্ধে জানেন এবং আসবক্ষয় জ্ঞান সম্বন্ধে ভাল ভাবে জানেন।

আসবের ক্ষয় যতদিন না হয় ততদিন এ সব ভিক্ষু বিশ্বাস করিওনা। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন-যে ব্যক্তি মা বাপ আত্মীয়স্বজন থাকলে ও নেই বলতে পারে। রাজ্য থাকলে ও রাজ্য নেই বলতে পারে। শিক্ষিত হলে ও শিক্ষিত নয় বলতে পারে। সবকিছু থাকলে ও কিছু নেই বলতে পারে। এমন কি বুদ্ধ জ্ঞান থাকলে ও বুদ্ধজ্ঞান নেই বলতে পারে সে ব্যক্তি পরম সুখ নির্বান লাভ করতে পারে। সবকিছু আছে বললে অজ্ঞান হয়। মোহ অজ্ঞানতা সহ বিজ্ঞপ্তি কল্পনা হলো আমিও আমার বাড়ী আমিত্ব ধারণা।

তিনি বলেন পৃথিবীতে যত স্থান আছে তৎমধ্যে জম্বুদ্বীবই শ্রেষ্ঠ বোধিসত্বদের মনোনীত স্থান। জম্বুদ্বীব বলতে ভারত বর্ষকে বুঝায়। ভারত বর্ষের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ সবচেয়ে উত্তম স্থান। পৃথিবীতে বহু ধর্ম প্রচারক এসেছেন। কেউ ঈশ্বরের পুত্র, কেউ ঈশ্বরের দূত, কেউ অবতার এবং কেউ

তাদের নিজস্ব মত প্রচার করেন। কিন্তু শংকরাচার্য অবিদ্যাকে মায়া করে (ঋদ্ধি) ব্রহ্মন্য ধর্ম প্রচার করেন। আর ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ অবিদ্যাতে বিদ্যা উৎপত্তি করে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।

সম্যক সম্বুদ্ধ যিনি গুনের ভান্ডার।
মুক্তির সঠিক পথ করিল প্রচার।।
ঠিক যে প্রনালি যথা হইল বর্ণন।
আর্যগন যে পথে করেছে গমন।।
আর্যনীতি আচরনে স্থির যেবা রয়।
ইহ-পরকাল তাঁর শান্তি সুখ হয়।।
স্মৃতি বিদর্শনে যিনি স্থির বীর্য হন।
সম্ভবে সপ্তম দিনে নির্বান দর্শন।।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-যাঁরা দৃঢ় বীর্য সহকারে একচিত্ত একক্ষনে স্মৃতি, বির্দর্শনে থাকতে পারেন তাঁরা মাত্র সাত দিনে অর্হত্ব ফল লাভ করতে পারেন। তাতে লাগবে শুধু শ্রদ্ধা, স্মৃতি, একাগ্রতা ও প্রজ্ঞা। শ্রদ্ধা বুদ্ধের উপদশের প্রতি চিত্ত নমিত করে। স্মৃতি দারোয়ানের মত পাপ পাহারা দেয়। একাগ্রতায় মানসিক সারাংশ সংগঠন করে। প্রজ্ঞায় যাবতীয় বিষয় প্রকাশ করে।

প্রজ্ঞা রত্নমালা যিনি করে পরিধান।
ভবে অবভাষ হবে শীঘ্র অবসান।।
তড়িতে অমৃত প্রাপ্তি হইবে তাহার।
ভবে আগমনে রুচি না হবে আর।।

ত্যাগেই সুখ। তার একটা উদাহরন দিয়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-কোন এক জমিতে বা পাহাড়ে বারবার ফসল করে ফসল হয় না। শুধু পরিশ্রম, টাকা পয়সা খরচ এবং সময়ের অপচয় হয় মাত্র। তা হলে জীবিকার উপায় অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ সেই জমি বা পাহাড় বাদ দিয়ে অন্য জমি নির্বাচন করতে হবে, যেটা হবে উর্বর অনায়াসে ফসল ও টাকা পয়সা পাওয়া যায় এবং খরচ কম। এখানে কৌশল অবলম্বন করা হল ভগবান বুদ্ধের নীতি। খারাপ জমি ত্যাগ করাা হল, দুঃখের কারনগুলি ত্যাগ করা। যে দুঃখের কারন ত্যাগ করতে না পারে সে চিরদিন দুঃখ ভোগ করে।

তিনি বলেন-দুঃখ গুলি কোথা হতে উৎপন্ন হয়? পাপ থেকে। মানুষ যখন পাপ করতে করতে পাপে ডুবে যায় তখন রাজা ও অধার্মিক হয়। সে সময় আকাশ বাতাস বিষাক্ত হয়ে পড়ে। তাতে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয় এমন কি আকাশে আজন্মা প্রেত জন্মে। এ প্রেতের প্রভাবে বহু লোকের অকাল মৃত্যু ঘটে। তা হলে উপায় কি? একমাত্র উপায় হল বুদ্ধের আশ্রয়, ধর্মের আশ্রয় এবং সংঘের আশ্রয়। ত্রিরত্নের আশ্রয় ও গভীর ভাবে বিশ্বাস করে চারি আর্যসত্য দর্শনই প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি ও প্রকৃত মুক্তি দেবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-ভগবান বুদ্ধ কোন দিন ভিক্ষুকে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেননি। তিনি প্রচার করেছেন দুঃখ মুক্তি নির্বান। এ জগতে যে যে কর্ম করবে সে সে কর্ম ফল ভোগ করবে। ভাল করলে ভাল ফল। খারাপ করলে খারাপ ফল। অনাথ আশ্রম কোন দিন ভাল ফল দেবে না। নিজের এবং অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চারি আর্যসত্যের প্রচার করা একান্ত দরকার।

তিনি আরো বলেন-বনভন্তে এখন সুফল ভোগ করছেন। তাঁর মত তোমরা ও চেষ্টা কর। সুফল পেতে হলে ভিত রচনা কর। নির্বাণের শিক্ষা অনুশীলন কর। নির্বাণের উপদেশ গ্রহন কর। তাতে তোমাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে। নির্বাণের জ্ঞান অনুশীলনে চারি আর্যসত্য সম্যক ভাবে প্রত্যক্ষ হবে। নির্বাণের ট্রেনিং নিতে হলে আত্মদমন চিত্ত দমন ও ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে। সত্ব-আত্মা ধ্বংস কর। যাঁরা সত্ব আত্মা ধ্বংস করেছেন তাঁরা বিভিন্ন খাদ্য খাওয়ার ইচ্ছা করেন না। কি করলে শান্তি হবে? কোথায় গেলে ভাল লাগবে? আমার প্রান কেমন কেমন করছে। বিভিন্ন জনের জন্য প্রান কাঁদছে। এগুলি সম্পুর্ণ বন্ধ হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন ভগবান বুদ্ধ চারি বৌদ্ধ পরিষদকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন-যারা আমার উপদেশে কর্ণপাত না করবে এবং শ্রদ্ধা না করবে তারা নিশ্চিয়ই চারি অপায়ে পতিত হবে। কামনা বাসনা বিজয়ী পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ সত্যধর্মের সন্ধান পেয়ে পরের বৃথা কথায় কর্ণপাত না করে আপন মনে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। তোমরা কামনা জয় ও বাসনা জয় কর। সংসারের যাবতীয় সুখ ভোগ ইস্তফা দাও। কাম তৃষ্ণা

সংসারে থাকতে চায়। ভব তৃষ্ণায় ভবে ভবে বিচরন করতে চায়। বিভব তৃষ্ণায় উচ্ছেদ জনিত বীত তৃষ্ণায় থাকতে চায়।

তিনি আরো বলেন-সম্পত্তি ছাড়া কেউ সুখ ভোগ করতে পারে না। মনুষ্যগন মনুষ্য সম্পত্তি, দেবগন দেব সম্পত্তি এবং ব্রহ্মাগনের ব্রহ্মা সম্পত্তির দরকার। এ সব সম্পত্তির উর্দ্ধে হল নির্বান সম্পত্তি। শ্রদ্ধা হতে সকল সম্পত্তির উৎপত্তি হয়। ইহ পরকাল, কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করলে লৌকিক সম্যক দৃষ্টি হয়। চারি আর্যসত্য গভীর ভাবে বিশ্বাস করলে লোকোত্তর সম্যক্ দৃষ্টি হয়। মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা দেশের অমঙ্গল ও নানাবিধ দুঃখ আনায়ন করে। সম্যক্ দুষ্টিতে দেশের মঙ্গল ও নানাবিধ সুখ সমৃদ্ধি আসে।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে একটি তাৎপর্যপুর্ণ উদাহরন দিয়ে তাঁর দেশনার ইতি টানলেন। তিনি বলেন-পুকুরে অনেক প্রকার মাছ আছে। তৎমধ্যে পুটি মাছই অন্যতম। তারা কুলের ধারে গেলে বকে ধরে খেয়ে ফেলে। মাঝখানে গেলে শৈল ও বোয়াল মাছে ধরে খেয়ে ফেলে। তা হলে তাদের উপায় কি? তাদের একমাত্র উপায় হল ঝোপের আড়ালে থাকা। যে গুলি চালাক সেগুলি কুলের ধারে ও যায় না। মাঝখানে ও যায় না। তারা ঝোপের আড়ালে প্রানে বেঁচে যায়। ঠিক তেমনি পুটি মাছের মত তোমাদের মহাবিপদ। একদিকে মারের কবল অন্য দিকে চারি অপায়ে পতন। তাহলে তোমরা কোনদিকে যাবে? তোমাদের জন্য ভগবান বুদ্ধ একটা উপায় বা কৌশল দিয়ে গেছেন। সেটা হল আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন। আর্য অষ্টাঙ্গিক পথ বা বুদ্ধ জ্ঞান হল পুঁটি মাছের ঝোপ স্বরূপ একমাত্র আড়াল। যে আড়ালে থাকলে মার অথবা অপায় নাগাল পাবে না। তখন তোমরা বুঝতে পারবে সুখ কি এবং সুখ কোথায়?

বিঃদ্রঃ-আজ ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে যে ধর্মদেশনা প্রদান করেন তার কিছু অংশ আপনাদের প্রতি প্রকাশ করলাম। কারন তাঁর অনর্গল ভাষন ও কবিতা গুলি আমি যথাযথ লিপিবদ্ধ বা ধারন করত পারিনি বলে দুঃখিত।

দুঃশীল, দুষ্প্রাজ্ঞ ও অধার্মিক ব্যক্তিরা নিজের ও অপরের ক্ষতি করে

আজ ১৩ই আগষ্ট /১৯৯৬ ইংরেজী মঙ্গলবার, শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ভিক্ষু শ্রমন ও উপোসথ পালন কারীদের প্রতি ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি প্রথমেই বলেন-আজকাল প্রায় ভিক্ষুরা বি. এ. ও এম. এ. পাশ করে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার দিকে মন দিয়েছে কিন্তু এগুলি ভিক্ষুদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। তাদের ঐ কর্মসমুহ হীন, সাধারন ও অনার্য। বৌদ্ধ ধর্মে আছে শুধু চারি আর্য সত্যের আশ্রম। তোমরা জঙ্গলে থেকে মরে যাও। তবু ও হীনকাজে মন দিও না। সত্যের আশ্রম করতে হলে ভগবান বুদ্ধের উপদেশে নির্বান প্রত্যক্ষ কর। যদি কাহারো পুর্বজন্মের পাপ থাকে তাকে প্রব্রজ্যা ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভগবান বুদ্ধের সময়ে জনৈক জেলে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করে ছিল। কিন্তু বুদ্ধ তাকে প্রব্রজ্যা দেননি। পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য আনন্দ জেলেকে প্রব্রজ্যা দিয়ে ছিলেন। সে ছেলেটি পুর্বজম্মে জনৈক পচ্চেক বুদ্ধ হতে পাত্র কেড়ে নিয়েছিল। তার পুর্ব জম্মের সে পাপের কারনে ভিক্ষায় গেলে কিছুই পেতনা। এবং পরবর্তীতে তাকে বিহারের যাবতীয় পানি সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ঠিক তেমনি পুর্বজম্মে তোমরা যদি পাপ কার্য করে থাক ইহজন্মে কিছুই পাবে না। পুর্বজম্মে যগি পিন্ডদান, বিহারদান ও যাবতীয় দান দিয়ে থাক ইহজম্মে বিপুল পরিমানে দান পাবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গরীব লোক মার্গফল লাভ করে মরে গেছে তার একমাত্র কারন পুর্বজন্মে সে দান দেয়নি। আবার অন্যদিকে দেখা যায় ধনী ব্যক্তিরা মার্গফল লাভ করে দীর্ঘায়ূ সম্পন্ন হয়েছেন এবং বিপুল পরিমান দানীয় সামগ্রী পেয়েছেন। এটা হল পুন্যের কারন। তবে আজকাল প্রায়ই দেখা যায় গরীব লোকের ছেলেরা ঘরে ভাত খেতে না পারলে প্রব্রজ্যা নেয়। কেউ কেউ লেখাপড়া করতে না পারলে প্রব্রজ্যা নিয়ে স্কুল কলেজে পড়ে। এগুলি হল হীন অনার্য ব্যক্তির কাজ। রাজমাতা আরতী রায় বলেছেন আমি যে প্রায় বিশ একর পাহাড় বন বিহারের জন্যে দান দিয়েছি তা শুধূ শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে কেন্দ্র করে দেয়া হয়েছে। অন্য কাউকে দিতাম না।

দেশনা প্রসংগে তিনি আরো বলেন বিগত ১৯৯৫ ইংরেজীতে শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ ভন্তে (শ্রীমৎ শীলালংকার মহাথের) বন বিহারে বর্ষাবাস উদযাপন করেছেন। তিনি জানতে পারলেন বন বিহারের পাশ্ববর্তী এলাকায় বিশেষ করে পশ্চিম পার্শ্বে যে বড়ুয়া পাড়া আছে, তারা নাকি প্রায় লোকেরা মদ তৈরী করে, মদ বিক্রি করে, মদপান করে এবং মধ্যে মধ্যে চুরি করে। তাদের কার্যকলাপ শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। রাজ বনবিহার হল আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিহার। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান হতে সদ্ধর্ম প্রান উপাসক-উপাসিকারা (বড়ুয়া) এখানে এসে থাকেন। বড়ুয়া পাড়ার লোকদের কার্য কলাাপ দেখে তাঁরা নিন্দা জ্ঞাপন করেন। পুর্ব কৃত পাপে তারা গরীব হয়েছে। এ কার্যকলাপ পরিত্যাগ না করলে ভবিষ্যতে তারা মনুষ্য লোকে আসতে পারবে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নারী সম্বন্ধে বলেন-নারীরূপে জন্ম নেয়া দুঃখজনক। এ সংসারে যারা হীন ও সাধারন তারা নারীকে ভোগ্য পন্য বলে মনে করে। তারা শিয়াল সেজে মোরগ (নারী) ধরে নিয়ে যায়। যারা সাধারন তারা শুধু নারী লোভ নয়, প্রয়োজন বোধে রাজ শক্তি, অস্ত্র শক্তি ও জন শক্তি প্রয়োগের পর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে।

তিনি আরো বলেন-তোমরা তৃষ্ণাক্ষয় করে নির্বান লাভ কর। শীল পালন করতে করতে মরে যাও। বৌদ্ধধর্ম হল অহিংসা ধর্ম। বুদ্ধাদি সৎপুরুষ থাকলে সে জাতি নিঃশেষ হয় না। বৌদ্ধধর্ম না মানলে ও বিশ্বাস না করলে ধ্বংস অনিবার্য। যাঁরা শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক তাঁরা ক্ষমামৈত্রী দিয়ে সবকিছু জয় করেন। অত্র অঞ্চলে ৬ হাজার শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক ভিক্ষু শ্রমন হলে সুখ ও শান্তি স্থাপন হবে। চিত্ত হতে পাপ মুক্ত, নন্দিরাগ ও অবিদ্যা মোহ ছিন্ন করতে না পারলে চিরদিন সুখ দুঃখের অধীন থাকতে হবে।

আসবের ক্ষয়কাল না হয় যতদিন।
এসবে ভিক্ষু বিশ্বাস
করিও না ততদিন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদিগক উৎসাহ দিয়ে বলেন-অর্হৎ হওয়ার এখন ও সময় আছে। যদি তোমাদের পুর্ব জন্মের পারমী থাকে, ইহজন্মের দৃঢ়

প্রচেষ্টা এবং ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত পথে চল। যদি তোমরা অসৎপুরুষের সংসর্গে থাক, বেচাকেনা কর এবং রং বস্ত্র নিয়ে স্কুল, কলেজে লেখাপড়া কর, তবে কোন দিন নির্বান লাভ বা মুক্ত হতে পারবে না। যারা দুঃশীল, দুষ্প্রাজ্ঞ ও অধার্মিক তারা নিজের ও অপরের ক্ষতি সাধন করে।

আশীর্বাদের প্রত্যক্ষ ফল

আপনারা বোধ হয় জানেন অথবা দেখেছেন রাজ বনবিহারের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকেন। রাঙ্গামাটিতে 'ডিয়ার পার্ক' হল আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র। কিন্তু বর্তমানে পর্যটকদের ডায়েরীতে রাজ বনবিহার ও স্থান পেয়েছে। সপ্তাহের অন্যান্য দিন থেকে শুক্রবার লোক সমাগম বেশী হয়। কেউ পর্যটনের উদ্দেশ্যে আসেন। কেউ পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। কেউ সমবেত ভাবে সংঘদান ও অষ্ট পরিস্কার দান করার উদ্দেশ্যে। কেউ ব্যক্তিগত দান দেওয়ার জন্য। কেউ রোগের বা বিভিন্ন সমস্যার নিরসনের জন্যে। কেউ আর্শীবাদ প্রার্থনা করার উদ্ধেশ্যে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রায় সময় বলে থাকেন সর্বদুঃখ হতে মুক্তি লাভ করার আর্শীবাদই সবচেয়ে উত্তম।

লৌকিক ভাবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রোগের সমস্যা হতেও অব্যাহতি পেয়েছেন, তার যথেষ্ট প্রমান রয়েছে। চাকমা ও বড়ুয়া সম্প্রদায় অনেকে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আর্শীবাদ লাভ করে প্রত্যক্ষ ফল পেয়েছেন। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সে গুলির উল্লেখ করতে পারছিনা। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই আশীর্বাদের প্রত্যক্ষ ফল পেয়ে মহা উপকৃত হয়েছেন। তৎমধ্যে মাত্র ৩টি প্রমানিক ঘটনা আপনাদের অবগতির জন্যে প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতে বনভন্তের দেশনা ৪র্থ খন্ডে আরো তথ্য পরিবেশন করার আশা রাখি।

১। একদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্য শ্রদ্ধেয় জ্যোতিসার ভিক্ষুর সাথে আলাপ করছিলাম। কথা প্রসংগে তিনি বললেন জনৈক খলিফা প্রায় সময় বনবিহারে আসে। তার মৃগী রোগ ছিল। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আর্শীবাদে ভাল হয়। বনবিহারের সেলাই মেশিনে কোন গোলযোগ দেখা দিলে সে মেরামত

করে দিয়ে যায়। কোন পারিশ্রমিক নেয় না। বিগত ১৯শে আগষ্ট ১৯৯৬ ইংরেজী রোজ সোমবার আমি তার সাথে পরিচয় করার জন্যে যাই। সে রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পুর্ব পার্শ্বে সেলাই কাজ করে। তার নাম আহমদ রেজা খলিফা। কলেজের পিছনেই তার বাড়ী। জন্মস্থান রাঙ্গামাটিতে। হৃষ্ট পুষ্ট শরীর ও শ্যামবর্ণ চেহারা। বয়স আনুমানিক ৩২ বৎসর। সে অনর্গল চাকমা কথা বলতে পারে। সাক্ষাৎকারে সে বলল-আমি বহুদিন যাবত অসুখে ভুগছিলাম। বহু টাকা পয়সা খরচ করেছি। কিন্তু আরোগ্য হইনি। অবশেষে আমার মনে একটা সুবুদ্ধি আসলো। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশীর্বাদ নিলে মনে হয় ভাল হয়। প্রায় সময় বনবিহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট রোগ মুক্তির জন্যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন "যাও"। তাতে আমার সর্বশরীর শিহরিয়ে উঠে। সে-দিন হতে দেখা গেল আমার কোন রোগ নেই। ভাল হয়ে ও এযাবত আগের মত বনবিহারে আসা যাওয়া করি। সে আরো বলল-একদিন আমার জনৈক সংগী (বেবী চালক) আমাকে বনবিহারে না যাওয়ার জন্যে নিষেধ করে। আমি বললাম আমি কাহারো ক্ষতি করছি না। কেন যাবো না? অতপর দেখা গেল উক্ত বেবী চালক পরদিনই দুর্ঘটানায় পতিত হয়। পরিশেষে সে বলল-মহাপুরুষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে সকলেই গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত।

২। জনৈক বেবী টেক্সী চালক (মোল্লা) আমাকে দেখা মাত্রই বলে থাকে, আপনি বনবিহারে যাবেন? বনবিহারে যাওয়ার তার খুব আগ্রহ। যাত্রী কম হলে ও তার কোন অসন্তোষ নেই। একদিন সে আমাকে বলল, শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশীর্বাদে আমার ছেলে বেঁচে গেছে। ঘটনার বিবরনে বলল, আমার বাসা কাঁঠালতলী নদীর ধারে। পাড়ার ছেলে মেয়েদের সাথে আমার ছেলে মেয়েরা ও নদীতে স্নান করে ও পানিতে খেলা করে। একদিন খেলা করতে করতে আমার ছেলেটি পানিতে ডুবে যায়। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা চেঁছামেছি করায় পাড়ার লোকেরা উদ্ধার করতে ছুটে এলো। সে সময় আমার স্ত্রী কোন এক বিশেষ দরকার বশত পাড়ায় অন্য বাসায় যায়। সেখান থেকে শুনতে পেল ছেলে পানিতে ডুবে গেছে। দৌড়ে আসার সময় মনে মনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে স্মরন করে বলল, আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করুন। যদি বেঁচে থাকে আপনার বিহারে হাজার বাতি জ্বালাবো। দৌড়িয়ে সে

দেখল ঘাটে অনেক লোক ছেলেকে খোঁজা খুঁজি করছে। সে কেঁদে কেঁদে ঘাটের অদুরে অর্থাৎ প্রায় ৮ হাত দুরে নামার সাথে সাথেই ছেলেকে পেল অল্প পানির ভিতরে। ছেলের নাকে মুখে ফেনা বেরুচ্ছে ও অজ্ঞান। নাড়াচড়ায় কিছুক্ষন পর জ্ঞান ফিরে আসে।

প্রায় সময় লক্ষ্য করা যায়, বনবিহারে বোরকা পরিহিত জনৈক মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মদেশনা শুনতে অভ্যস্থ হয়েছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মদেশনা দেওয়ার সময় কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু উক্ত মহিলার জন্যে ব্যতিক্রম দেখা যায়। অন্যান্য মহিলারা তাকে বসার জন্যে অনুরোধ করলে ও সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেশনা শুনতে পছন্দ করে। বনবিহারে প্রায় সময় মুসলিম মহিলা দেখা যায়। তৎমধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাই বোধ হয় মোল্লা ড্রাইভারের স্ত্রী।

৩। একদিন জনৈক সরকারী অফিসার (নাম ঠিকানা আপাতত দিলাম না) আমাকে বললেন- দাদা, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। আপনার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট আমাকে নিয়ে যান। তাঁর কাছ থেকে আমাকে আশীর্বাদ নিয়ে দিন। আমি এখন মহাবিপদে আছি। আমার সাক্ষী কেউ নেই। শত্রুতা মুলক ভাবে আমাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ফেলেছে। আমার আর কোন উপায় নেই। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ছাড়া কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। ঘটনার বিবরন শুনে তাঁকে বললাম-আগামী কাল সকাল ৮ টায় আসুন। আপনাকে নিয়ে বনবিহারে যাব। যথাসময়ে না এসে তিনি ঠিক ১০ টায় তাঁর স্কুটার নিয়ে আমার দোকানে উপস্থিত হন। আমি তাঁকে বললাম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সাথে দেখা করতে হলে একটা সময় আছে। ১০ টা ৩০ মিনিটে তিনি স্নান করবেন, ১১ টায় ভোজন করবেন এবং ১১ টা ৩০ মিনিটে তিনি তাঁর ধ্যান কুঠিরে যাবেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে স্কুটার যোগে চললাম। কিছুদুর যাওয়ার পর স্কুটারের তৈল নিঃশেষ হয়। পেট্রোল পাম্প থেকে তৈল নিয়ে বনবিহারের পোঁছলাম বেলা ১০ টা ৩৫ মিনিটে। সে সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে স্নান ঘরে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি স্নান ঘরে গিয়ে বন্দনা করে বললাম-ভন্তে একজন সরকারী অফিসার আপনার নিকট দেখা করতে চান। দয়া করে একটু আসুন। উক্ত অফিসারকে উপরের তলায় নিয়ে য্যাওয়ার সাথে সাথেই বনভন্তে বললেন-তোমার বাড়ী কোথায়? তিনি

বললেন-টাংগাইল। ভন্তে আমাকে শক্রতা মুলক ভাবে বিপদে ফেলেছেন। দয়া করে আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমি যেন বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারি। বনভন্তে বললেন আমি যা বলি তা মনোযোগ দিয়ে শুন ও সে অনুযায়ী চল। তোমার নিশ্চয় বিপদ কেটে যাবে। তুমি তাকে শক্র মনে কর না। মিত্ররূপে গ্রহন কর। তার মঙ্গল ও সুখ কামনা কর। আমার কথা গুলি পালন কর। এখন যেতে পার ।

কিছুদিন পর তাঁর বিভাগীয় তদন্তে তিনি সম্পুর্ণ নির্দোষ প্রমানিত হন। এ আনন্দ সংবাদ নিয়ে তিনি শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বললেন-ভন্তে আপনার আশীর্বাদে মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। এ জন্যে আপনাকে জানাচ্ছি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

নির্বান সুখ প্রদান করে

আজ ২৭ শে আগষ্ট/১৯৯৬ ইংরেজী রোজ মঙ্গল বার। স্থান শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সাধনা কুঠির। তাঁর শিষ্য ভিক্ষু শ্রমনদিগকে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলন। তিনি প্রথমেই বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করে বলেন রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বৌদ্ধ ধর্ম গবেষনা করে বুঝতে পারলেন যে বর্তমান বিশ্বে যাঁরা বৌদ্ধ ধর্ম আচরন বা পালন করবে তাঁরা নানা ভাবে প্রতিকুল পরিবেশের সম্মুখীন হবে বা হিমশিম খাওয়ার সম্ভবনা আছে বৈকি। তার কারন বর্তমানে হিংসার প্রবলতা বেশী বা মার শক্তি বেশী। মৈত্রী নেই বললেই চলে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের এ মন্তব্যটি কয়েকবার উচ্চারন করেন। কিন্তু অন্যদিকে তিনি বলেন বৌদ্ধ ধর্ম আচরন বা পালন করলে চিত্তে অনাবিল সুখ অনুভব করবে। বাহ্যিক দৃষ্টি বা লোকিকে যে ব্যক্তি নেই তার বৌদ্ধধর্ম আচরন করা কোন সমস্যা নয়। সমস্যাগুলি হল সাধারন ব্যক্তির জন্যে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ লোক গরীব, জ্ঞানের দুর্বলতা ও শ্রদ্ধার দুর্বলতায় ভুগছে। সম্পত্তি ছাড়া মানুষ ভাল ভাবে বাঁচতে পারে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে মানুষের সম্পত্তির দরকার। তবে তার জন্য চিত্তে থাকতে হবে বিপুল জ্ঞান ও গভীর শ্রদ্ধা। বার্মায় সম্পত্তি আছে। সেখানকার লোকদের জ্ঞান ও শ্রদ্ধা আছে। এখানে সম্পত্তি ও নেই, জ্ঞান

এবং শ্রদ্ধা ও নেই। যদি ও থাকে সামান্য তম। তাতে লোকদের কতটুকুই উন্নতি হবে?

আমাকে থাইল্যান্ড ও ভারতে আমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু আমি কোথা ও দেশের বাইরে যাই না। অন্যান্য ভিক্ষুরা দেশের বাইরে যায় কেন জান? তারা কেউ যায় লেখা পড়া করার উদ্দেশ্যে, কেউ যায় বেড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং কেউ যায় টাকা পয়সা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। সে ব্যাপারে আমার লজ্জা লাগে। কেন না আমাদের দেশের লোক অত্যন্ত গরীব। আবার অন্য দিকে আমাকে না চিনলে তাদের সন্দেহ ও হতে পারে। সুতরাং না যাওয়াই উত্তম এবং প্রয়োজন ও নেই। লৌকিক ধর্ম দুঃখ ও পাপ। লোকাত্তর ধর্ম সুখ ও পুন্য। লোকোত্তরে মার্গ ফল ও জ্ঞান লাভ করতে পারলে পরম সুখ। যদি কেউ অর্হৎ হলে ও কিছু না পায় তবে লোকে তাকে সন্দেহ করবে। সুখ সুবিধা না হলে উন্নতি হয় না। রাজ বনবিহার হল উপাসক, উপাসিকাদের স্মৃতিস্বরুপ। বনবিহারে কেন দান করে জান? শুধু দুটি কারন। প্রথমটি হল বনভন্তে টাকা পয়সা স্পর্শ করেন না। দ্বিতীয়টি হল বনভন্তে ভোগ করেন না। শুধু ত্যাগই করেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্য বৃক্ষজিৎ সম্বন্ধ বলেন-যে কোন ভিক্ষু বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করতে না পারলে বিশ্বাস নেই। বৃক্ষজিৎ প্রব্রজ্যা ছেড়ে এখন দুঃখ পাচ্ছে। সে যোগ্য নয় বলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। আমি বহু লোককে স্ত্রী পুত্র মরে গেলে কাঁদতে দেখেছি। গৃহীকালে সে দুঃখ সমুহ দেখে আমি প্রব্রজ্যা নিয়েছি। কিসে সুখ হয় জান? প্রথমে দেহ সম্বন্ধে জানতে হবে। দ্বিতীয় মন সম্বন্ধে জানতে হবে। তৃতীয় নির্বান সম্বন্ধে জানতে হবে। এগুলি সম্বন্ধে জানার পর চিত্তে অনাবিল সুখ অনুভব হবে। কেউ আন্দাজ করে বললে হবে না।

ভগবান বুদ্ধের সময়ে অনেক উপাসিকা বিহারদান ও অন্যান্য পুন্য কাজ করতো। বর্তমানে শ্রীলংকা ও বার্মায় উপাসিকারা বেশী পুন্য করে ও দান করে। ধর্মের উন্নতি কল্পে তারা খুব সচেতন। এখানেও উপাসকাদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মের উন্নতি কল্পে দান করে। তাদের মধ্যে লাকী চাক্মা অন্যতমা। ভুলবশত তাকে সমালোচনা করার কারন নেই। সে যদি উদ্যোগী না হতো এ ধ্যান কুঠির নির্মিত হতে হয়ত কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হতো। বর্তমানে আমার তেমন কিছু অভাব নেই। যার যার সাধ্য অনুযায়ী দান

দিয়েছে। তাদের বিপুল পুন্য সঞ্চয় হয়েছে। চাকমা বড়ুয়া, মার্মা হিন্দু ও মুসলিমদেরকে তজ্জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-তোমরা সাধারন ভাবে থেকো না। সাধারন ব্যক্তিরা নানা দুঃখ ও সমস্যায় জড়িত থাকে। অসাধারনের কোন দুঃখ নেই। কোন সমস্যা ও নেই। অসাধারন ব্যক্তিরা নির্বান সুখ প্রত্যক্ষ করেন। নির্বানই পরম সুখ প্রদান করে। সুতরাং প্রত্যেকেই অসাধারন হওয়া উচিত।

প্রবারনা পুর্ণিমা উপলক্ষে দেশনা

আজ ২৭ শে সেপ্টেম্বর /১৯৯৬ ইংরেজী রোজ শুক্রবার। রাজ বনবিহার অনুষ্টান মঞ্চ। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সকাল ১০ টা ১০ মিনিট হতে ১০ টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ধর্ম দেশনা করেন।

দেশনার শুরুতেই তিনি বলেন-মানুষ কি মরে? চোখে দেখে, কানে শোনে ও মনে অনুমান করে। চোখ দ্বারা আসক্ত হয়, কান দ্বারা আসক্ত হয় এবং মন দ্বারা আসক্ত হয়, এ ত্রিবিধ দ্বারে আসক্ত হলে মানুষ দুঃখ পয়। আসক্ত মন দুঃখ হতে মুক্তি পায় না। তাকে ইহকাল দুঃখ ও পরকাল দুঃখ পেতে পেতে অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। কাজেই তোমরা দৃশ্য হোক বা অদৃশ্য হোক চোখে, কানে ও মনে অনাসক্ত ভাবে থাকতে পারলে চিত্ত দুঃখ পাবে না। তাতে দুঃখের পরিবর্তে চিত্তে অনাাবিল সুখ অনুভব করবে। অনুমান কি রকম জান? ধর, এক মাইল দুরে ধুঁয়া দেখা যাচ্ছে। অনুমানের দ্বারা বুঝা যায় ধুঁয়া আছে বলে আগুন ও থাকবে। চোখ দ্বারা, কান দ্বারা ও মন দ্বারা অবিদ্যা তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। সেই অবিদ্যা তৃষ্ণা রোধ করতে পারলে চিত্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়।

তিনি বলেন- কেউ কেউ লংকা, বার্মায় যায়। যদি তারা চোখে, কানে ও মনে অবিদ্যা তৃষ্ণা রোধ করতে না পারে তবে তাদর সেখানে যাওয়া নিষ্ফল ছাড়া কিছুই নয়। অবিদ্যা-তৃষ্ণা রোধ হলে প্রথমেই শ্রোতাপত্তি ফল লাভ হয় এবং ক্রমান্বয়ে সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হয়।

শ্রাস্ত্রে দেখা যায় যারা গরীব তারা মার্গফল লাভ করে মরে গেছে। আর যারা ধনী ব্যক্তি তারা বেঁচে গেছে। তার কারন গরীব ব্যক্তিরা পুর্ব রক্ষিত পাপের কারনে গরীব হয়ে এসেছে। তারা হইজন্যে [illegible]প্রত্যয় না পেয়ে মরে গেছে। আর যারা ধনীকূলে জম্ম গ্রহন করেছে তারা পুর্ব জম্মের পুন্যের প্রভাবে বিপল পরিমান দানীয় সামগ্রী পেয়ে জীবিত আছে।

লোক মুখে শুনেছি-বার্মায় জনৈক চাকর ভাবনা করত। এমন কি হাল চষতে চষতে পর্যন্ত ভাবনা করত। কালক্রমে সে ব্যক্তি ভিক্ষু হয়ে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন।

যারা শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করে তারা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে অথবা উচ্চ কূলে জম্ম হয়। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন শ্রোতাপত্তিফল লাভ করে মরে যাওয়া ও ভাল।

তিনি আরা বলেন-বনভন্তে ধন-পাতায় ভাবনা করার সময় কেউ কেউ বলেছে-বনভন্তে টাকা পয়সাা স্পর্শ করেন না অথবা কোন কিছু জমা করেন না তিনি নিশ্চয়ই মারা যাবেন। অতঃপর দেখা গেল বনভন্তে এখন ও জীবিত আছেন। যারা সে রককম উক্তি করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই মরে গেছে। তারা মনে করেছে-তাদের স্ত্রী পুত্র, মা, বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন, টাকা-পয়সা, সম্পত্তি প্রভৃত বিদ্যামান আছে; তারা মরবে না। বনভন্তের সে সব কিছুই নেই। বনভন্তে নিশ্চই মরবেন সেই এমন একদিন।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-যার শীল আছে সে ধনী। যার শীল নেই সে গরীব। বুদ্ধ অর্থ ধনী ও জ্ঞানী। তোমরা বুদ্ধকে বিশ্বাস কর। ধর্মকে বিশ্বাস কর এবং সংঘকে বিশ্বাস কর। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-মাত্র একদিন শীল পালন করে মরে যাওয়া ও ভাল। একশত বৎসর দুঃশীল অবস্থায় বেঁচে থাকা উচিত নহে।

বুদ্ধের সময়ে পাঁচ শত উপাসিকা উপোসথ শীল পালন করে ভাবনা করছিল। হঠাৎ একদিন তারা যে ঘরে থাকত সে ঘরে আগুন ধরে মারা যায়। কেউ কেউ মন্তব্য করল যে তারা শীল পালন করে ও মরে গেল কেন? তাদের পুর্ব রক্ষিত পাপে মারা গেছে। তারা ও পুর্ব জম্মে অন্য জনকে

আগুন লাগিয়ে মেরেছে। এখানে উপসিকাদের শীল পালন ও ভাবনা বিফলে যায়নি। তারা কেউ কেউ মরনের পুর্বে শ্রোতাপত্তি, কেউ কেউ সকৃদাগামী এবং কেউ কেউ অনাগামী ফল প্রাপ্ত হয়েছে। পুর্ব রক্ষিত গুরুতর পাপ না থাকলে ধর্মচারীকে ধর্মে রক্ষা করে।

এখানে দেখা যাচ্চে যে যারা বনভন্তেকে মারা যাবে বলেছে কিন্তু তিনি মরেননি। বরঞ্চ তাঁকে বিপুল পরিমান দান দিয়ে বিহারাদি গড়ে তুলেছেন। এটা ও তাঁর পুর্ব রক্ষিত পুন্যের ফল। যাদের পুর্ব রক্ষিত পুন্য জমা থাকে তারা এমনকি বুদ্ধ কালে ও অর্হত্বফল লাভ করতে পারে। জনৈক বৃদ্ধ ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিল-কিভাবে আর্য সংঘ হওয়া যায়? মার্গফল লাভ বা অর্হত্ব হলেই আর্য সংঘ হওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধ তাকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন।

অতীতের যাহা কিছু ফেলে দাও অতীতে।
কদাপি না দিও তারে পুনঃআর্বিভাব হতে।।

অতপর সে বৃদ্ধ বুদ্ধের উপদশ শুনে অর্হত্বফর লাভ করেন। কিন্তু সে বৃদ্ধ শ্বেত অবস্থায় মারা যায়। ভিক্ষু সংঘ বুদ্ধের নিকট জানতে চাহিলেন সে উক্ত বৃদ্ধ গৃহী না সংঘ। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন সে বৃদ্ধ সংঘভুক্ত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-তোমরা সৎপুরুষের উপদেশ গ্রহন কর। জ্ঞান যোগে চিন্তা কর। প্রনালী বদ্ধ ভাবে চিন্তা ধারায় অবস্থান কর। চারি আর্যসত্য জ্ঞান ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি জ্ঞানে স্বাধীন বা নির্বান প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধের সময়ে ৫৭ হাজার শ্বেত বস্ত্র ধারী গৃহী মার্গফল লাভ করেছে।

তিনি আরো বলেন-তোমরা অধীন থাকি ও না। অধীন থাকা দুঃখ ও পাপ। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, প্রভৃতি থাকলে অধীন ও পাপ। তোমাদর নির্বাণের চিত্ত ও নির্বাণের মন হতে হবে। নারীর দিকে চিত্ত ও নারীর দিকে মন হলে (পুরুষের দিকে) অধীন ও অতি সাধারন ভাবে থাকতে হবে। সাধারন মানুষ দুঃখ পায়। অসাধরন ব্যক্তি দঃখ মুক্ত ও স্বাধীন থাকে। অষ্ট পুগ্গল ব্যক্তিরা প্রকৃত স্বাধীন। স্বামী-স্ত্রী হলে অধীন ও দুঃখ। যে কেউ স্ত্রী হলে ছোট হয়ে যায়। আবার স্বামী হলেও ছোট হয় ও দুঃখ পায়। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী পাপ, দুঃখ ও মিথ্যা।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- পূর্বকালে নারী পুরুষ ছিল। বর্তমানেও নারী পুরুষ আছে। কিন্তু পূর্বকালে অন্যান্য ধর্ম ছিল না। বিভিন্ন স্কুল কলেজও ছিল না। তারা অবিদ্যা তৃষ্ণা ধ্বংস করে স্বাধীন বা মুক্ত হতো। যারা অজ্ঞান তারা সন্দেহ করে। বিশ্বাস করে না। যাঁরা জ্ঞানী তারা ধর্মের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ করে না, তারা ত্রিরত্নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসবান ও সদ্ধর্মের আস্থাশীল হন।

উপসংহারে তিনি বলেন- তোমরা সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে দূরীভূত কর। জ্ঞানের দ্বারা যাবতীয় অজ্ঞানতা মিথ্যাকে পরাভূত করে স্বাধীন ও অসাধারণ হয়ে পরম সুখ নির্বাণ লাভ করতে সচেষ্ট হও।

বিকাল বেলায় ধর্ম দেশনা

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিকাল ৪ টা ১৮ মিনিট হতে ৫ টা ২৮ মিনিট পর্যন্ত ধর্মদেশনা করেন। তিনি প্রথমেই বলেন- মানুষ মাত্রেই ভুল করে। অর্হত্বফল লাভ না হওয়া পর্যন্ত ভুল করতে থাকে। তবে মধ্যে মধ্যে অর্হত্বেরা ও ভুল করতে পারেন। মানুষ অজ্ঞানী হলে নারী পুরুষ সুখ বলে মনে করে। তারা নানাবিধ গলদ ও অপরাধ করে। আবার দেখা যায় পাপমতি মার মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। মার পাঁচ প্রকার থাকে। ক্লেশ মার, স্কন্ধমার, অভিসংস্কার মার, বশবর্তী দেব পুত্র মার ও মৃত্যু মার। ক্লেশ মারে মানুষকে যাবতীয় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে নিয়োজিত করে। স্কন্ধ মারে মানুষকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করায়। অভিসংস্কার মারে মানুষকে নব নব বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত করে নানা যোনি ভ্রমনে সহায়তা করে। দেবপুত্র মার মানুষকে মুক্ত হতে দেয় না। বরঞ্চ বিপদে পরিচালিত করে। মৃত্যুমার মানুষকে জীবনের যে কোন মুহূর্তে পরকালে নিয়ে যায়।

জনৈক ব্যক্তি বলেছে- শ্রদ্ধেয় বনভন্তেও মরবেন। তার উত্তরে তিনি বলেন যে ক্লেশমার জয় করেছেন, যে অভিসংস্কার মারকে জয় করেছেন, যে দেবপুত্র মারকে জয় করেছেন তিনিই মৃত্যু মারকে জয় করেছেন। সাধারণ জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। যার জন্ম নেই তার মৃত্যুও নেই। মৃত্যু দুঃখ অতি ভয়ংকর। মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যা কিছু কর্ম করেছ তা কর্ম নিমিত্ত গুলি তার চোখের সামনে এসে পড়ে। কর্ম নিমিত্ত গুলি গতি নিমিত্তে পরিণত

হয়। গতি নিমিত্ত অনুযায়ী মানুষ পুনঃজন্ম নেয়। যেমন কেউ মৃত্যুর পূর্বে আগুন দেখে। তারা মৃত্যুর পর নরকে পতিত হয়। যারা মৃত্যুর সময় মানুষ দেখে তারা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যারা পশু-পক্ষী দেখে তারা মৃত্যুর পর পশু-পক্ষী হয়ে আসে। যারা ফুল বাগান ও সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী দেখে তারা মৃত্যুর পর স্বর্গে উৎপন্ন হয়। তারা আবার সজ্ঞানে মৃত্যু বরণ করে।

এক সময় ভগবান বুদ্ধ বলেছেন হে ভিক্ষুগণ, নখের উপরে যে বালি আছে তা বেশী না মহাপৃথিবীর বালি বেশী। তারা বললেন- মহাপৃথিবীর বালি বেশী, তিনি আবার বলেন- যারা বুদ্ধের নীতি অনুসরণ করে তারা হল নখের উপরের বালির মত। আর যারা বুদ্ধের নীতিতে কর্ণপাত করবে না তারা মহাপৃথিবীর বালির মত অপায়ে পতিত হয়। যার সংযোগ নেই তার বিয়োগ নেই। যারা নারী পুরুষে সুখ আছে বলে তারা সব সময় অজ্ঞানতার অন্ধকারে অন্যায় অপরাধ, ভুল ও গলদ করতে অভ্যস্থ হয়। যারা অজ্ঞানী তারা সহজেই ভুল স্বীকার করে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বৌদ্ধ ধর্মে সামান্য মশা-মাছি পর্যন্ত মারতে পারে না। মানুষ মারাতো দূরের কথা। দেখা যায় অন্যান্য ধর্মে প্রাণী হত্যা করলে পাপ নেই বলে। তা কি সত্য? উদাহরণে তিনি বলেন- যেমন ধর, একখানা সাদা কাপড় হল বৌদ্ধ ধর্ম। সামান্য মাত্র দাগ লাগলেই দেখা যায় ও বিশ্রী দেখায়। অন্যান্য ধর্ম হল কাল কাপড়। কাল কাপড়ে নানাবিধ দাগ পড়লেও সাধারণতঃ কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু বহুবিধ দাগ যে আছে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সুতরাং কাল কাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। তারা বলে থাকে কাল কাপড়ে কোন পাপ নেই বা দোষ নেই। কেউ কেউ বলে থাকে অংগুলীমাল বহু মানুষ হত্যা করে কিভাবে অর্হৎ হয়েছিলেন? তাঁর ব্যাপার অন্য রকম। তিনি পূর্ব জন্মে বিপুল পূন্য সঞ্চয় করেছেন। ইহজীবনে বিপথে পরিচালিত হয়ে ছিলেন মাত্র। তা ত্যাগ করে ভাগবান বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে অর্হৎ হয়েছেন।

কেউ কেউ বলে থাকে বনভন্তে প্রথম জীবনে ধন-পাতায় প্রখর গরম ও প্রচন্ড শীতের মধ্যে কিভাবে ধ্যান করেছেন? বর্তমানে তাঁকে এয়ার কন্ডিশন যন্ত্র দান দিয়েছে। বনভন্তে বলেন- এয়ার কন্ডিশন জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর গরম দূরীভূত করে ঠান্ডা ভাব উৎপন্ন করে। ঠিক সে রকম নির্বাণ মানুষের

নানাবিধ দুঃখ গুলি দূরীভূত করে চিত্তে অনাবিল সুখ অনায়ন করে। যখন যে ব্যক্তি নির্বাণ প্রাপ্ত হয় তখন সে ব্যক্তি তালাশ করে তার দুঃখ গুলি কোথায় গেল? এয়ার কন্ডিশন যেমন গরম তাড়িয়ে ঠান্ডা আনায়ন করে, ঠিক তেমনি নির্বান ও দুঃখ গুলি তাড়িয়ে অনাবিল পরম সুখ নির্বাণ আনায়ন করে।

তিনি বলেন- নির্বান সুখ যে কেউ অনুভব করতে পারবে না। উপমা সহকারে তিনি বলেন- জনৈক ব্যক্তি পাকা আম খেয়ে মিষ্টি প্রমাণ পেয়েছে। অন্যজনেও সে রকম না খেয়ে মিষ্টি না টক বলতে পারবে না। যতক্ষন পর্যন্ত উপলব্ধি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস হবে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পাকা ও মিষ্টি আমের উদাহরণ দিয়ে বলেন- শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা হল পাকা ও মিষ্টি আম। যার আদিতে কল্যাণ, যার মধ্যে কল্যাণ এবং যার অন্তে কল্যান। বিদর্শনে সকল সংস্কার অনিত্য, সকল সংস্কার দুঃখ এবং সকল সংস্কার অনাত্ম বলে জানে। সংগে সংগে চিত্ত চৈতসিক, রূপ ও নির্বান সম্বন্ধে ভালরূপে জানে। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা সম্বন্ধে জানলে চারি আর্য সত্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা যায়। ৩৭ প্রকার বোধি পক্ষীয় ধর্ম সম্বন্ধে যে জানবে তার সূত্র বিনয় ও অভিধর্ম সম্বন্ধে বুঝতে অসুবিধা হবে না এবং সে নিশ্চয়ই অর্হত হতে পারবে।

তিনি জনৈক উপাসিকার উক্তি দিয়ে বলেন- উক্ত উপাসিকা প্রায় সময় উপোসথ পালন করে থাকে। একদিন জনৈক যুবতীকে উপোসথ পালন করতে দেখে বলল- তুমি যুবতী, তোমার উপোসথের প্রয়োজন নেই। আমরা বৃদ্ধা হয়েছি, উপোসথ আমাদের প্রয়োজন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- যারা অজ্ঞানী তারা এরকম কথা বলে থাকে। যুবতীদের কি আর দুঃখ? কিন্তু না প্রত্যেক বয়সের লোকের দুঃখ থাকে। তদুপরি তারা যে কোন সময় মরতে পারে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন- উক্ত যুবতীকে যদি পাঁচটি ভীমরুল এসে কামড় দেয়, তখন বুঝতে হবে সে কতটুকু সুখী? আগের মত হাসবে, না কাঁদবে? যে জন্ম জ্বরা, ব্যাধি, মরণ অতিক্রম করেছে তার অনাবিল সুখ অনুভত হয়।

তিনি ব্যাধি দুঃখ সম্বন্ধে বলেন- এক সময় এক এলাকায় মহামারী হয়েছিল। সবাই মৃত্যু ভয়ে শংকিত। এমন কি ডাক্তার পর্যন্ত ভয় পেয়েছে।

যে দূর থেকে রোগী দেখে এবং দূর থেকে ঔষধ দিয়েছে। সেই নির্বান যেতে পারবে, যে প্রত্যেক মানুষ এক একটি দুঃখের পুঞ্জমাত্র বলে মনে করে।

তিনি চারি ঈর্ষাপথ সম্বন্ধে আবার বলেন মানুষ শুধু বা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। বসতে বসতে হাটতে হয়। আবার এক সপ্তাহ পর্যন্ত বসে থাকতে পারবে না। হাটতে হাটতে শয়ন করতে হয়। এক সপ্তাহ পর্যন্ত হাটতে পারবে না। আবার শয়ন করতে করতে দাঁড়াতে হয়। এক সপ্তাহ পর্যন্ত শয়ন করতে পারবে না। সুতরাং চারি ঈর্ষাপথে সুখ কোথায়? চারি ঈর্ষাপথে দুঃখ বললে পাপ উৎপন্ন হয় না। তা হলে দুঃখ ও পাপ নিরোধ করার উপায় কি? বসতে পাপ উৎপন্ন হলে, বসতে জ্ঞান উৎপন্ন করতে হবে। দাঁড়াতে পাপ উৎপন্ন হলে দাঁড়াতে জ্ঞান উৎপন্ন করতে হবে। শয়নে পাপ উৎপন্ন হলে শয়নে জ্ঞান উৎপন্ন করতে হবে। গমনে পাপ উৎপন্ন হলে গমনে জ্ঞান উৎপন্ন করতে হবে।

লোভ, তৃষ্ণা, অজ্ঞানতা, সৌন্দর্য স্পৃহা ত্যাগ করে অশুচি ভাবনা করলে দেহের প্রতি ঘৃনা ও অশুচি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। নারী পুরুষ জীবিত হোক বা মৃত হোক অশুচি, ঘৃণিত বললে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঘৃনা না করলে অজ্ঞান আসক্তি করলে পাপ উৎপন্ন হয়। প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান হলে নির্বাণ আয়ত্ব করতে পারবে। প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান না হলে পারবে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- কে সুখী? যে ত্যাগ করতে পারে সেই প্রকৃত সুখী। তা হলে তোমরা দুঃখকে প্রত্যেক দিন নানাবিধ জিনিষ দিয়ে লালন পালন করছ কেন? রাগ দুঃখ, হিংসা দুঃখ ও অজ্ঞানতা দুঃখ। যে মুক্ত ও সুখী হতে চায় তার রাগ মুক্ত হতে হবে, হিংসা মুক্ত হতে হবে এবং অজ্ঞানতা মুক্ত হতে হবে।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- ধর্ম কথা শুনে ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলে সুখ। জ্ঞানী পাপ করে না শুধু ত্যাগই করে। অন্ধকার রাতে বিদ্যুৎ চমকালে যেমন পথ দেখা যায় সে রকম ধর্মচক্ষুতে নির্বাণের কান্তি জ্যোতি দেখতে পায়। ধর্ম বোধ, মার্গ, ফল ও নির্বাণ লাভ করতে পারলে পরম সুখ ও মুক্ত হয়।

আসল পন্ডিত হও

আজ ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ ইংরেজী রবিবার। ভোরবেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদের প্রতি ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি প্রথমেই বলেন- প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি জানলে মিথ্যার দিকে না চলে সত্যের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। অবিদ্যার কারণে নানাবিধ দুঃখের সৃষ্টি হয়। সে দুঃখ গুলি যতদিন পর্যন্ত ধ্বংস করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবে। বিদ্যা উৎপত্তি হলে সুখ ও উৎপত্তি হয়। সে সুখ হল আসল সুখ।

তিনি কবিতার ছন্দে বলেন-
কোথায় যে কতভাবে জন্ম নিয়েছি।
জন্ম মৃত্যু শোকতাপ কত যে সহেছি।।
নিদারুন দুঃখ তাপে জর্জরিত এপ্রাণ।
মুক্ত তবে আজি বাঁধিতে পারিবে না-
এ দুঃখ কারাগার।।

যে প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি বুঝতে পারে, জানতে পারে ও পরিচয় হতে পারে সে মার ভুবনে থাকবে না। মার ভুবন অধীন, ভয়ংকর ও দুঃখ।

তিনি উপমায় বলেন- তোমরা মাছের ফাঁদ (চাঁই চেনো?) মাছ যেমন ফাঁদ চিনে না। অনায়াসে ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারায়। ঠিক সেরকম পুরুষের (নারীর) ফাঁদ হল নারী (পুরুষ)। যারা অজ্ঞানী তারা এ ফাঁদে পড়ে অনন্তকাল পর্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে থাকে। অন্যটা হল মারের ফাঁদ। যাঁরা কাম লোক, রূপলোক ও অরূপলোকে থাকবে তারা মারের ফাঁদে পতিত হবে। মার এ ত্রিলোক থেকে মুক্ত হতে দেয় না। মাছ যেমন চাঁই চেনে না, অন্ধজন ও ভব কারাগার চিনে না। তারা ভব কারাগারে পড়ে সহজে মুক্ত হতে পারে না। যারা জ্ঞানী তারা নারী–পুরুষের চাঁই ও মারের চাঁই এ প্রবেশ করে না। তাহলে তোমরা বল- ওহে মন চিত্ত, চাঁই এর ভিতর যেয়ো না। সাবধান, সেদিকে মনচিত্ত দিও না। নির্বান হল চাঁই এর বাইরে ও মুক্ত। তোমরা নির্বানের মনও নির্বানের চিত্ত কর। বিদর্শন ভাবনা করলে জ্ঞান চক্ষু উদয় হয় এবং চাঁই এর ভিতরে ঢুকতে হয় না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন বিড়াল বাঘের মত হলেও বাঘ হতে পারে না। শুকর ভালুকের মত ঘু ঘু করলেও ভালুক হতে পারে না। সকল পন্ডিত এক সমান হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কেউ কেউ সামান্য কিছু জেনেও বড় পন্ডিতের মত নিজকে প্রমাণিত করতে চায়। পন্ডিত কাকে বলে? যারা সহনশীল, জীবের প্রতি দয়া, ক্ষমা, মৈত্রী ও পূণ্য কর্মে নির্ভীক এবং সর্বদা অক্ষুন্নমনা ব্যক্তিকে পন্ডিত বলে।

তিনি বলেন- বর্তমান যুগে জড় বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাধারণ মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়েছে। এ বিজ্ঞান গুলিও এক প্রকার যাদুর মত। চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি জ্ঞান উদয় হলে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের কর্মকান্ড কিছুই নয়। জড় বিজ্ঞানের বহু দোষ আছে। যেমন মানুষ মারার কলা-কৌশলাদি। নির্বানে আজে বাজে গন্ডগোল ও ভেজাল নেই।

তিনি একটি উপমা দিয়ে বলেন- শংখ মার্কা খাঁটি সরিষার তৈলের টিনে লেখা থাকে- ভেজাল প্রমাণে এক হাজার টাকা পুরস্কার। তেমনি খাঁটি বৌদ্ধ ধর্ম বা নির্বান ধর্ম যে পালন করে তার জন্যে ও পুরস্কার আছে। সে পুরস্কার হল পরম বিমুক্তি সুখ নির্বান। নির্বান হল ভেজাল বর্জিত।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কায়গতাস্মৃতি ভাবনার উপর জোর দিয়ে বলেন- তোমরা নারীদের প্রলোভনে পড়না। যারা ৩২ প্রকার অসূচী ভাবনা করবে তারা কখনো নারীর (পুরুষের) প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এদেহ অনিত্য, এদেহ দুঃখ পূর্ণ, এদেহ অনাত্ম, এদেহ অসূচী, এদেহ দোষপূর্ণ, এদেহ মুক্তির বিঘ্নকারক বলে সাধু পুরুষেরা সর্ব দুঃখের আধার এদেহকে ত্যাগ করে পরম সুখ নির্বান লাভ করে থাকেন।

গলিত অসূচী দেহ পচনেই সার।
রক্ত মাংস মল মূত্র পুঁজের ভান্ডার।।
ক্ষয় লয় দুঃখ শুধু অনাত্ম লক্ষন।
অহরহ কর কায়ে কায়ানু দর্শন।।
অসূচী লক্ষন দেখে স্মৃতির সাধনে।
প্রজ্ঞার আলোক জ্বালাও অনিত্য দর্শনে।।
স্মৃতি প্রজ্ঞা বলে দেখ চিত্ত ক্ষয় ক্ষন।
ক্ষয় ব্যয় দেখে কর আসক্তি বর্জন।।

বিদর্শন জ্ঞান চক্ষু কর উম্মিলন।
রূপ স্কন্ধ দেখ ঘৃন্য অশুভ লক্ষন।।
বেদনার অনুভূতি দুঃখ হাহাকার।
ক্ষনেতে ভোজবাজি অনিত্য অসার।।

তিনি বলেন- পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। পঞ্চস্কন্ধ নিত্য, সুখ ও আত্মা বললে বিপরীত বলা হবে। ওহে মন, তুমি সেদিকে যেয়োনা। জ্ঞানীরা অসূচীর ফাঁদে পড়ে না। তারা পঞ্চস্কন্ধ যে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা তা ভাল ভাবে দেখে তাতে আসক্ত হয় না। একবার ভগবান বুদ্ধ জনৈক নারীর প্রতি উৎকণ্ঠিত যুবক ভিক্ষুকে এ উপদেশ দিয়ে মুক্ত বা অর্হত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তিনি কবিতার ছন্দে বলেন-
কে বা কাহার তুমি, অনিত্য রংগভূমি।
কর্মশেষে তুমি আমি সব হবে বিসর্জন।।
দুনিয়ার ব্যাপার বড়ই চমৎকার।
আপন কর্মে ঘুরছে মানুষ ভাবে নাকো একবার।।
আমি বুঝি আমি শুধু পাকা।
আর বুঝি অন্য কেউ সবাই বোকা।।

উপসংহারে তিনি বলেন- কেউ কেউ মনে করে আমি একমাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপন্ডিত। অন্যকেউ কিছু জানেনা। এ কুৎসিৎ ধারনা বলতে গিয়ে সদ্ধর্মের প্রতি গ্লানি করা হয় মাত্র। তাহলে পন্ডিত কাকে বলে? পূর্বেও বলা হয়েছে তবুও পুনঃর্বার বলা হচ্ছে। যার সহনশীলতা আছে, জীবের প্রতি দয়া আছে, ক্ষমা আছে, মৈত্রী আছে ও পূন্য কর্মে নির্ভীক এবং সর্বদা অক্ষুন্ন মনা ব্যক্তিরা পন্ডিত নামে অভিহিত হন। সুতরাং তোমরা পন্ডিত হওয়ার জন্যে দৃঢ় প্রচেষ্টায় এগিয়ে চল। যেন আসল পন্ডিত হতে পার।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কি?

আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ ইংরেজী সোমবার। ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্য ভিক্ষু শ্রমনদেরকে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি প্রথমেই বলেন- তোমরা এখানে প্রব্রজ্যা নিয়েছ কি জন্যে? উদ্দেশ্যই বা কি?

প্রব্রজ্যা অর্থ- যাবতীয় সংসার দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া। সারা সংসার জীবনে যে দুঃখ গুলি পেয়েছ সে গুলি অনুধাবন করে পরবর্তী দুঃখ গুলিকে আসতে না দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অর্থাৎ পূর্বের দুঃখগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে। এবং বর্তমানে তোমরা কি কি দুঃখ পাচ্ছ, সে গুলি মোচন করার জন্য প্রব্রজ্যা নেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। যারা স্বামী–স্ত্রী হয়েছে তারা দুঃখে পতিত হয়েছে। স্বামী ও দুঃখে, স্ত্রী ও দুঃখে, রয়েছে। নারী পুরুষ নিয়ে সংসার জীবন গড়তে হয়। সংসার জীবনে বহু দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে করতে সংসার স্রোতের অতল তলে তলিয়ে যেতে হয়। যার কোন ঠিকানা থাকে না।

আজ তোমরা দৃঢ় সংকল্প কর, আর যেন তোমাদেরকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে না হয়। বল, আমি আর সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হব না। নির্বান যাব। আমি, মানুষ, নারী ও পুরুষ বললে অজ্ঞান হয়, পাপ হয় এবং দুঃখ থেকে মুক্ত হয় না। আমি বা অবিদ্যা তৃষ্ণায় নতুন নতুন জিনিষ চায়। পুরাতন তার ভাল লাগে না। সুতরাং আমি মানুষ, নারী, পুরুষের দেহ ও মনচিত্ত নিয়ে থেকো না। তাহলে বল, ওহে মন! ওহে চিত্ত! তুমি তাদের মধ্যে আর থেকো না। আমি, নারী, পুরুষ ও মানুষের ভাব ত্যাগ কর।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- মানুষ হলেই নানাবিধ দলে অন্তর্ভূক্ত থাকে। তাতে দলে দলে হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি এমন কি প্রাণে বধ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং কোন দলেই থাকা উচিত নয়। তোমরা কোথায় থাকবে জান? দলে নয়,আশ্রয়ে। কার আশ্রয়ে? বুদ্ধের আশ্রয়ে, ধর্মের আশ্রয়ে এবং সংঘের আশ্রয়ে। তোমরা নারী, পুরুষের মাঝে থাকবে না। মানুষটি নিয়েও থাকবে না। মানুষ পাপ করে পাঁচটি কারণে। যেমন- রাগের কারণে, হিংসার কারণে, অজ্ঞানতার কারণে অহংকারের কারণে এবং মিথ্যা দৃষ্টির কারণে। বনভন্তে কোন দলেও নেই। সুতরাং তোমরাও কোন দলে থেকো না। আমি অর্থাৎ মান, সম্মান তালাশ করনা। যে ভিক্ষু শ্রমণের পারাজিকা পাপ না থাকে তাকেও শীলবান বলা চলে। শীলবানকে স্বর্গের দেবতারাও প্রশংসা করে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নির্বান গমনের পথ নির্দেশ করে বলেন যেমন ধর, একজন লোক ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। প্রথমে তল্পিতল্পা গুটিয়ে

গাড়ীতে টিকেট নিল। তখন সে স্রোতাণত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হল। যখন চট্টগ্রামে পৌছল তখন সে সকৃদাগামী লাভী হল। যখন কুমিল্লায় পৌছল তখন সে অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হল। যখন তার গন্তব্যস্থল ঢাকায় পৌছল তখন তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হল।

তিনি বলেন- বৌদ্ধ ধর্ম আয়ত্ব করতে হলে চারটি বিষয় দরকার হয়। (১) সত্য ধর্মের আলোচনা (২) সত্য ধর্মের চর্চা (৩) সত্য ধর্মের অভ্যাস (৪) সত্য ধর্মের গবেষণা। তোমরা বল, এ সমস্ত জ্ঞান চর্চায় রত থেকে উত্তম সম্পদ গুলি (স্রোতপত্তি ফল, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী ও অর্হৎফল) লাভ করবে। চারি আর্যসত্য জ্ঞান ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি জ্ঞান আয়ত্ব হলে বৌদ্ধধর্ম জানবে, বুঝবে, পরিচয় হবে, দেখবে এবং ভাল ভাবে স্বাদ গ্রহণ করবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- যে কাজ করলে তোমাদের মুক্তির অন্তরায় হয় সেগুলি কর না। অনর্থক কাজ করা বেকুফের লক্ষন। বেকুফ লোক নির্বাণ যেতে পারে না। শুধু জ্ঞানীরা নির্বান যায়। এ জগতে অনেক প্রকার ছায়া আছে। যেমন, গাছের ছায়া সুশীতল। তার চেয়ে সুশীতল মাতাপিতার ছায়া। তার চেয়ে ও সুশীতল ছায়া রাজার। তা অপেক্ষা অনন্তগুনে বেশী সুশীতল ভগবান বুদ্ধের ছায়া। নারী, পুরুষ সংসার করলে বুদ্ধের ছায়ায় (নির্বান) যেতে পারে না।

তিনি বলেন- ঘর জামাই বা যে ব্যক্তি আপন ঘর ছেড়ে শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস করে তার মত কপাল পোড়া লোক এ সংসারে খুব কম থাকে। তার চেয়ে দুর্ভাগা নেই যার মা বাবা নেই। তাকে অনাথ বলে। বর্তমানে দুই প্রকার আশ্রম দেখা যায়। একটি হল অনাথ আশ্রম। অন্যটি হল সত্যের আশ্রম। যারা গৃহী তারা অনাথ আশ্রম গড়ে তুলতে পারে। ভিক্ষুদের জন্য নয়। যারা অনাথ আশ্রম করে তারা দেশ বিদেশ থেকে অনেক বেতন ভাতা পায়। সত্যের আশ্রমে ও তেমনি বেতন ভাতা পায়। সেগুলি কি রকম জান? সেগুলি তাদের থেকে অনেক গুণে বেশী। সেগুলি টাকা পয়সা নয়। শুধু চিত্তে অনুভব করা যায়। আবার ধাপে ধাপে প্রমোশন বা পদোন্নতিও আছে। সেগুলি হল স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব ফলে উন্নীত হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- নির্বান হলে মাছ মাংসাদি অন্যান্য জিনিষ ভাল লাগবে না। তখন জাগতিক সমস্ত জিনিষ তুচ্ছ মনে হবে। তবে চিত্তে অনাবিল শান্তি, সুখ, চির স্বস্থি প্রতিষ্ঠিত হয়ে অনন্ত সুখে অবস্থান করবে।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- পৃথিবীতে অনেক প্রকার বিষ আছে। কিছু সংখ্যক বিষ ঔষধে ভাল হয়। যেমন- সাপের বিষ মন্ত্রে ভাল হয়। কিন্তু জাগতিক বা যাবতীয় তৃষ্ণা বিষ সহজে ভাল হয় না। যেমন- লৌকিক সুখের প্রেমের বিষ, ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ বিষ এবং ভব বিষ সহজে নিরাময় হয় না। উপমায় বলা যায় বৃক্ষজিৎ ভিক্ষু প্রেমের বিষে মৃত্যু বরণ করছে।

স্বল্প সুখ পরিত্যাগ করে বিপুল সুখ আহরণ কর

আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ ইংরেজী শনিবার। ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্ম দেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি প্রথমেই বলেন- তোমরা গৃহী জীবনে শতকরা ৯৯ ভাগ দুঃখ পেয়ে থাক। মাত্র ১ ভাগ সুখ ভোগ করে মধ্যে মধ্যে হাসিতে মগ্ন থাক। তোমরা গৃহীকালের গৃহী সুখ মনে স্থান দিও না। বনভন্তে গৃহীকালে বহু দুঃখ কষ্ট পেয়ে ভিক্ষু (বনভন্তে) হয়েছেন। সে রকম তোমরা ও দুঃখ কষ্টকে উপলব্ধি করে জীবনের অগ্রগতি সাধন কর। হরি লাল যেমন বিশ্ব যুদ্ধে গিয়ে জীবনে বেঁচে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে রকম আমিও (বনভন্তে) পঞ্চ মারের সাথে যুদ্ধ করে জীবনে বেঁচে এসে সত্য ধর্ম প্রচার করছি।

তিনি বলেন- ভগবান বুদ্ধ যেভাবে দেশনা করে মানুষকে বুঝাতে পারেন, সারিপুত্র সেভাবে পারেন না। বনভন্তেও সারিপুত্রের মত দেশনা করতে পারেন না। সুতরাং তোমাদেরও জ্ঞান শক্তির প্রয়োজন। জ্ঞানের দুর্বলতা ও বুঝিবার শক্তি না থাকলে কিছুই সঞ্চয় করতে পারবে না।

তিনি বলেন- কোন এক স্থানে ধর্ম সভা হচ্ছে। জনৈক পন্ডিত ভিক্ষু উক্ত সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। পিছনে কিছু সংখ্যক কলেজ ছাত্র-ছাত্রী দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে ভাষণ শুনছে। তাদেরকে বসার জন্যে বললেও তারা বসল না। ছাত্র–ছাত্রীরা বলল- 'জ্ঞানের ক্ষমতা থাকলে নিজ অভিজ্ঞা বলে ভাষণ দান করুন। বই পুস্তকের ভাষণ আমরাও জানি'। বই পুস্তকের ভাষণ হল বন্দুকের গুলির মত ফুরিয়ে যায়। অভিজ্ঞতা পূর্ণ ভাষণ হল অফুরন্ত সাগরের ঢেউ–এর মত। আজকাল এম. এ. পাশ (মহিলাদের মধ্যে)ও কম নেই নয়। তাই বড় ডিগ্রী নিয়ে যাকে তাকে বুঝানো সম্ভব নয়। অতপর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- আমি পুস্তকের কথা না বলে জ্ঞান শক্তি দিয়ে ভাষণ দান করি। ধর্মদেশনা হল চারি আর্য সত্য পুংখানুপুংখরূপে বুঝিয়ে বলা। ধর্মদেশনা চারি আর্য সত্যের বাহিরের কথা হলে কি রকম হয় জান? ধর, কোন এক শিকারী ছনের ঝোপ বাতাসে নড়তে দেখল। সে মনে করল হরিন ছন নাড়ছে এবং সে অনগর্ল গুলি করতে করতে তার গুলি শেষ করল। ঠিক সেরকম যারা আন্দাজ করে ধর্ম দেশনা প্রদান করে তারা সেই হরিণ শিকারীর অবস্থায় পড়বে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- চারি আর্য সত্যের জ্ঞান চিত্তে উদয় করে ভালভাবে দেখে ধর্মদেশনা করলে ফলপ্রসূ হয়। না দেখে, না বুঝে ধর্ম দেশনা করলে ঠিক ঐ শিকারীর অবস্থা হবে অনিবার্য। যেমন চারি আর্য সত্য উদয় করে (ধর্মদেশনা করতে হয়) প্রথমে দুঃখ সত্য ভালভাবে দেখে দুঃখ সত্য দেশনা করতে হয়। দ্বিতীয় সমুদয় সত্য ভালভাবে দেখে সমুদয় সত্য দেশনা করতে হয়। তৃতীয় নিরোধ সত্য ভালভাবে দেখে নিরোধ সত্য দেশনা করতে হয়। চতুর্থ মার্গ সত্য ভাল ভাবে দেখে মার্গ সত্য দেশনা করতে হয়। তাতেই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

তিনি বলেন- ৮ (আট) প্রকার দুঃখ স্বরূপ অষ্ট সংবেগ ভালভাবে জেনে ধর্মদেশনা করতে হয়। এ ৮ প্রকার দুঃখ অখন্ডনীয়। পঞ্চ স্কন্ধই দুঃখের কারণ বা দুঃখের মূল উৎস।

তিনি আরো বলেন- চারি ইর্যাপথ দুঃখ। কোন সুখ নেই। চারি ইর্যাপথে যে সুখ বলে সে নির্বান যেতে পারবে না। বসাতে, দাঁড়াতে, গমনে ও শয়নে দুঃখ গুলি ভালভাবে দেখে ধর্মদেশনা করলে সার্থক ধর্মদেশনা হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন- কিসেই সুখ? স্ত্রী পুত্রে সুখ? বাড়ী গাড়ী সুখ? বিপুল সম্পত্তি সুখ? কিছুতেই সুখ নেই। আছে শুধু দুঃখ। তৃষ্ণা থাকলে সুখ নেই। তৃষ্ণা না থাকলে প্রকৃত সুখ। যদি কেউ আহার, চীবর, ঔষধ ও বিছানাদির প্রতি তৃষ্ণা করে থাকে, সে নরকে পড়বে। এ চারি প্রত্যয়ে তৃষ্ণা মুক্ত হলে মহা সুখ।

তিনি বলেন অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও মান করলে বিপদ আসে। তিনি আরো বলেন- নারী কোকাকোলা দান করলে পানীয় নিতে পারবে। বোতল ফেরত দিতে হবে। এখানে কথা হচ্ছে যে, দানীয় সামগ্রী হল পানীয় এবং বোতল হল নারী। যে নারী (বোতল) গ্রহণ করে সে নরকে পড়বে। মধ্যে মধ্যে এ রকম ঘটনাও ঘটে থাকে। তা মহা পাপের বিষয়। জ্ঞানের দুর্বলতা থাকলে এ রকম ঘটে থাকে। তোমরা ভগবান বুদ্ধের নিকট এরকম প্রার্থনা কর-

দাও প্রভু জ্ঞান বল, শক্তি অমরতা।
ত্যাগের বিমল বুদ্ধি দৃষ্টি অসারতা।।

জ্ঞানের বলে উচ্চতা লাভ কর। ভিক্ষু যদি (কাঁচা) অজ্ঞানী হয় সে তৃষ্ণা, উপাদান করে, তার অধোগতি ছাড়া গত্যন্তর নেই।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে উপদেশ দেন। অজগর সাপে হরিণ ধরে কেমন করে জান? বহেরা গাছের গোড়ায় প্রায় হরিণেরা বহরা খেতে আসে। অজগর সাপ ও সে গাছের গোড়ায় হরিণ ধরার জন্যে যায়। অজগর বুদ্ধি করে জংগল হতে শুকনা পরিত্যাক্ত পাতা তার দেহে সারি বদ্ধ ভাবে সাজিয়ে (ঢাকিয়ে) গাছের গোড়া পর্যন্ত রাখে। আর বহরা গুলি লেজের সাহায্যে পাতার সারির খুব কাছে রাখে। এবং সুচতুর অজগরটি পাতার নীচে থেকে বহেরার স্তুপের কাছে মুখ লুকিয়ে রাখে চুপ করে থাকে। যখন হরিণ বহেরা খেতে আসে তখন হঠাৎ ধরে ফেলে। ঠিক সেরকম আমাদের দেশে অজগরের মত কিছু সংখ্যক ভিক্ষু আছে। তারা ভিক্ষু নাম ধারী হয়ে হীন কাজে প্রবৃত্ত হয়। এখানে হরিণ হল যুবতী নারী। ভিক্ষু হল অজগর। পাতা হল রং বস্ত্র। বহেরা গাছ- হল বিহার।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- যারা অজ্ঞানী ভিক্ষু তারা অজগর হয়। আর যারা বুদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞানী তারা কোকাকোলার পানীয়ের মত শুধু পানীয় গ্রহণ করে। বোতল গ্রহণ করে না। বোতল হল কোম্পানীর।

উপসংহারে তিনি বলেন- বুদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞানী হলে সুখ, পুন্য ও মুক্ত হয়। ১৪ প্রকার বুদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে প্রথম পাঁচ প্রকার অর্জন করতে পারলে মুক্ত হওয়া যায়। চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধ জ্ঞান কি? যথা- (১) দুঃখে জ্ঞান, (২) দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, (৩) দুঃখ নিরোধে জ্ঞান, (৪) দুঃখ নিরোধ গামিনী পটিপাদায় জ্ঞান, (৫) আসব ক্ষয় জ্ঞান, (৬) পূর্বনিবাস জ্ঞান, (৭) জীবের গতি সম্বন্ধে জ্ঞান, (৮) বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান, (৯) পরচিত্ত বিজনন জ্ঞান, (১০) দিব্যকর্ণ জ্ঞান, (১১) নানা অর্থ জ্ঞান, (১২) নানা বর্ণে জ্ঞান, (১৩) নানা ভাষা নানা ব্যাকরণে জ্ঞান, (১৪) প্রতিভান সম্বন্ধে জ্ঞান। মোট ১৪ প্রকার বুদ্ধ জ্ঞান। সুতরাং তোমরা স্বল্প সুখ পরিত্যাগ করে বিপুল সুখ আহরণ কর। বিপুল সুখ অর্থাৎ বুদ্ধ জ্ঞান অর্জন কর।

মূর্খ দুঃখী ও পন্ডিত সুখী

আজ ১লা অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী মঙ্গলবার। ভোর বেলায় তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। সংসারে মুর্খ হওয়া বড়ো দুঃখজনক। পন্ডিত ব্যক্তিরা সুখী। অনেকে মনে করে, যারা লেখা পড়া জানে না তারা মুর্খ। শিক্ষিত ব্যক্তিরা পন্ডিত। বৌদ্ধ মতে তা ঠিক নয়। মূর্খদের চিত্ত অসংযম, কায় অসংযম ও বাক্য অসংযম। তাদের ক্ষুধা, আলস্য, মৈথুন, ঘুম ও মদের আসক্তি বেশী থাকে। মুর্খেরা চিত্তে, কায়ে ও বাক্য দ্বারা দুঃখ সঞ্চয় করে। তাতে তারা বিভিন্ন দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে না। যেমন জেলেরা মাছ ধরলে কোন পাপ নেই বলে মনে করে। পাপ কি তারা বুঝে না। ঠিক সে রকম মূর্খকে উপদেশ দিলে গ্রহণ করে না। তাহলে তারা কিভাবে মুক্ত হবে?

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- মূর্খকে পন্ডিত বানাও, অসাধুকে সাধু বানাও। যারা পন্ডিত তারা সহনশীল, ক্ষমা, মৈত্রী, দয়ালু, পূণ্য কর্মে নির্ভীক ও সর্বদা

অক্ষুন্ন মনে থাকে। যারা সাধু তাঁরা প্রাণী হত্যা করে না। চুরি করে না, অবৈধ কামাচার করে না, মিথ্যা কথা বলে না ও নেশা দ্রব্য সেবন করে না। যারা মূর্খ ও অসাধু তাদেরকে পন্ডিত ও সাধু বানানো মহা কঠিন ব্যাপার। মূর্খ, পন্ডিত, সাধু ও অসাধু কর্মেই তাদের পরিচয়। যারা মুর্খ ও অসাধু তারা পাপ করতে লজ্জা, ভয় ও ঘৃনা করে না। আর যাঁরা পন্ডিত ও সাধু তাঁরা পাপ করতে লজ্জা ভয় ও ঘৃনা করেন।

তিনি বলেন- শুধু সম্পত্তি ও জ্ঞাতিবর্গ ত্যাগ করলে প্রব্রজ্যা লাভ করা যায় না। যে চিত্ত সংযম, আত্ম সংযম ও ইন্দ্রিয় সংযম করেছেন তিনিই (প্রকত) প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারবেন। এ ত্রিবিধ সংযমে মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তারা পাপ থেকে মুক্ত হয়। স্মৃতিসহকারে থাকলে পাপ হয় না। স্মৃতি অর্থ সব সময় সর্তকতা অবস্থায় থাকা বুঝায়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- মার ভূবনে থাকলে আপত্তি হয়। মার ভূবন অর্থ লৌকিক জগত (মনুষ্য, দেবতা, ব্রহ্মা) বুঝায়। অ-মার ভুবনে থাকলে আপত্তি নেই। অ-মার ভুবন অর্থ স্রোতাফত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মাগস্থ ও ফলস্থ বুঝায়।

প্রতীত্য সমুৎপ্রাদ নীতি জানলে, বুঝলে, দেখলে, পরিচয় হলে ও স্বাদ পেলে চার অপায় বন্ধ হয়। প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি না জানলে, না বুঝলে, না দেখলে, পরিচয় না হলে ও স্বাদ না পেলে চার অপায়ে পতিত হবে।

তিনি দুঃশীল ও সুশীল সম্বন্ধে বলেন- গাধা ও গরু একসাথে থাকলে অনেকেই চিনতে ভুল করবে। কিন্তু গাধার স্বভাব এক রকম, গরুর স্বভাব অন্য রকম। গাধার স্বভাব দুঃশীল। গরুর স্বভাব সুশীল। অজ্ঞানতা করে নারী পুরুষ সুখ বললে এবং তাতে আসক্ত থাকলে নরকে পড়বে সন্দেহ নেই।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- যারা জ্ঞানী তারা সবকিছু বুঝে। যারা অজ্ঞানী তারা কিছুই বুঝে না। মুক্তি লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নারীর (পুরুষ) সংস্পর্শে না থেকে জংগলে বাঘের পেটে গেলে ও উত্তম। নারীকে (পুরুষকে) আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু হিসেবে দেখলে পাপ হয় না। নারী-পুরুষ হিসেবে দেখলে পাপ বা আপত্তি হয়।

তিনি বলেন- ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় নির্বানে সার আছে ও মূল্য আছে। কিন্তু নারী পুরুষের সার ও নেই, মূল্যও নেই। লোভ, আসক্তি ও অজ্ঞানতা থাকলে নির্বান যেতে পারবে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যখন শিষ্যদেরকে দেশনা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর অতিবৃদ্ধ শিষ্য ভিক্ষু তাকে বন্দনা জানালেন। বনভন্তে বৃদ্ধ শিষ্যকে বললেন- কেমন ভাল আছ তো? (শাখা বিহারের ভিক্ষু) তোমাকে সেবা যত্ন করে তো? উত্তরে ভিক্ষু বললেন- আপাততঃ ভাল আছি। কিন্তু যথাযথ সেবাযত্ন পাচ্ছি না। অতঃপর বনভন্তে বললেন- বৃদ্ধ হয়ে প্রব্রর্জীত হলেই এ রকম হয়। ইক্ষুর রস খেলে যে ভাবে শুধু চোঁচা থেকে যায় বৃদ্ধকালে প্রব্রর্জীতদের অবস্থাও সে রকম হয় গুরুত্ব কম থাকে। প্রায় লোকেরা বৃদ্ধ হলে ঘৃনা করে ও অবজ্ঞা সূচক বাক্য ব্যবহার করে। আবার যাদের সৎজ্ঞান আছে তারা কোন সময় বৃদ্ধদেরকে অযত্ন, অবজ্ঞা ও ঘৃনা করে না। বৃদ্ধ কালে ও আসক্তি থাকে। দেহের প্রতি আসক্তি, লোভ ও অজ্ঞানতা থাকলে দুঃখ পেতে হয়। কামের আদীনব ভাব দেখে কামের প্রতি লোভ, আসক্তি ও অজ্ঞানতা কর।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে অতিবৃদ্ধ ভিক্ষু ও সকল শিষ্যদের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেন- প্রতীত্য সমুৎপ্রাদ নীতি ভালভাবে জানলে বুঝলে, দেখলে, পরিচয় হলে, স্বাদ পেলে সুখ হয়, মুক্ত হয় এবং নির্বান প্রত্যক্ষ হয়।

সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়

আজ ২রা অক্টোবর, ১৯৯৬ ইংরেজী বুধবার। ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। প্রথমেই তিনি আবৃত্তির ভংগিতে কয়েকটি ভাষণ দান করেন।

১। অবিদ্যার আঁধারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে ও নিঃশব্দে নীরবে ও তৃষ্ণা, তুমি তৃষ্ণা বহিচ্ছ কেন? (২ বার)

২। নৈতিকতার স্খালন দেখে ও মানবতার পতন দেখে ও নির্লজ্জ অলসভাব বহিছ কেন?

৩। জ্ঞান বিহীন নিরক্ষরের খাদ্য বিহীন নাগরিকের নেত্রী বিহীনতা গৌন কেন?

৪। সহস্র ভরসার উদ্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষজনের সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোল না কেন?

৫। ব্যক্তি যদি ব্যক্তি কেন্দ্রীক সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত তবে শিথিল সমাজকে ভাঙ্গ না কেন?

৬। সহস্র ভরসার উদ্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষজনের সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোল না কেন?

৭। স্রোতাস্বিনী কেন নাই রও তুমি নিশ্চয়ই মুক্ত নও, তাহলে মুক্তি দাও না কেন?

৮। উম্মত্ত ধরার মারের সংগ্রামে শত শত দুঃখ রাশিকে আলিঙ্গন করা, লক্ষ কোটি নর নারীকে জাগালেনা কেন?

(অবিদ্যার আঁধারে - ঐ)

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ৮টি উক্তি ভাষনের পর বলেন- বর্তমানে মানুষ স্কন্ধ, ক্লেশের নিপীড়নে পাগলের মত উম্মাদ প্রায়। কোথায় যায়, কোথায় খায় এবং কি বলে তার কোন ঠিক ঠিকানা সে নিজে জানে না। সুতরাং ক্লেশ, স্কন্ধকে প্রতিরোধ করার জন্য উৎসাহ দিয়ে বলেন- বিনা যুদ্ধে নির্বান যেতে পারবে না। প্রথম তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে নারীর সঙ্গে (পুরুষ) নারীকে যুদ্ধে পরাজয় করা সহজ ব্যাপার নয়। সিদ্ধার্থ যখন গোপাকে ফেলে নৈরঞ্জনা নদীর কুলে ধ্যানে গেলেন তখন পাপমতি মার বলল- হে সিদ্ধার্থ তুমি চোরের মত তোমার প্রাণ প্রিয়সী গোপাকে ফেলে চুরি করে এসেছ। এখান থেকে তুমি চলে যাও। না হলে তোমাকে খন্ড খন্ড করে নৈরঞ্জনা নদীতে ভাসিয়ে দেবো। সিদ্ধার্থ পাপমতি মারকে পরাস্ত করলেন।

তিনি বলেন- দ্বিতীয় বার যুদ্ধ করতে হবে পঞ্চ মারের সাথে। যেমন- স্কন্ধমার, ক্লেশমার, অভিসংস্কারমার, দেবপুত্র মার ও মৃত্যুমার। এগুলির সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হতে হবে।

তৃতীয় বার যুদ্ধ করতে হবে আত্মার সাথে। আত্মা মানুষকে মুক্তির পথে বাঁধা দেয়। যুদ্ধে আত্মাকে পরাস্ত করে সে বাঁধা অপসারণ করতে হবে আমি

বা আমিত্ব অনাগামী পর্যন্ত থাকে। ৯ (নয়) প্রকার আমিত্বকে যুদ্ধে পরাজয় করা সহজ ব্যাপার নয়।

তিনি বলেন- পাপমতি মার নারী পুরুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করায়, কেন না তার গন্ডীর মধ্যে থাকলে বা তার অধীনে থাকলে সে ভালবাসে। কাম বন্ধনে আবদ্ধ করা তার প্রধান কাজ। কামে আবদ্ধ হলে নির্বান যেতে পারবে না। নারী বলে, পুরুষ তুমি আমার সাথে থাক। পুরুষ বলে, নারী তুমি আমার সাথে থাক। উভয়ে একসাথে থাকলে মারের সাথেও থাকতে হবে এবং আত্মার সাথেও থাকতে হবে।

ইহা ও উল্লেখ থাকে যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দেশনা দেয়ার সময় গতকালের মত অতিবৃদ্ধ ভিক্ষুদ্বয় বন্দনা করলেন। তখন বনভন্তে বললেন- এ জগতে যত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আছে তারা প্রায় জনই পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে যুবক যুবতী হয়ে কাম সুখ করার আখাঙ্খা করে। বৃদ্ধ ভিক্ষুদেরকে উপলক্ষ্য করে বলেন-

মিত্রের মিত্রতা জান বিপদ সময়।
বীরের বীরত্ব দেখ যুদ্ধের সময়।।

তিনি পুনরায় বললেন- স্ত্রী লোকের রূপে, রসে, শব্দে, গন্ধে ও স্পর্শে পুরুষের চিত্ত বিচলত হয়। স্ত্রী (পুরুষ) পাপ, দুঃখ, মিথ্যা সে যে কোন সময় মারা যেতে পারে। তোমরা এভাব বল, আমি নির্বান ধর্ম গ্রহণ করব। লোকোত্তর ধর্ম গ্রহণ করব। অন্য সকল ধর্ম কর্ম ত্যাগ করব। নির্বান ধর্মে আজে বাজে নেই, গন্ডগোল নেই, ভেজাল নেই, শুধু সুখ। অন্য যাবতীয় ধর্মে আজে-বাজে, গন্ডগোল, ভেজাল ও দুঃখ থাকে। সমস্ত পাপ ধর্ম ত্যাগ কর। লোভই পরম রোগ। নারী পুরুষ উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্তি, লোভ করলে রোগগ্রস্থ হয়। এ আসক্তি লোভ স্বরূপ রোগ চিকিৎসা না করলে নির্বান যেতে পারবে না। কামের প্রতি লোভ, কামের প্রতি আসক্তি ও অজ্ঞান না করলে অনন্ত সুখের অধিকারী হতে পারবে।

যে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে, দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে, সে ব্যক্তির আপত্তি হয় না। চিত্ত যদি গোপনে ও পাপ করে আপত্তি হয়। যার চিত্ত সুখ যে কখনও পাপ করেনা, সে মুক্ত। চিত্ত সংযম করলে চিত্ত পাপ করে না। পাপকে লজ্জা কর, ভয় কর এবং পাপকে ঘৃণা করে। নিস্পাপ ব্রহ্মচর্য আচরণ করে অনবদ্য সুখ হয়। ব্রহ্মচর্য শিথিল কর না। যে আর্য অষ্টাংগিক

মার্গ পথে চলে সে ব্রহ্মচারী। সুপথে বা সোজাপথে না চলে অন্য পথে চলা অর্থ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ থেকে সরে যাওয়া।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে শিষ্যদের প্রতি বলেন- নারী হল পথ ছেড়ে জংগলে প্রবেশ করার মত। তা হলে তোমরা যুদ্ধ কর। কার সাথে? নারীর সাথে, মারের সাথে এবং আত্মার সাথে। আত্মা বল্‌লে অহঙভাব উৎপত্তি হয়। মানুষ ধনে, জনে, স্ত্রী পুত্র ও পান্ডিত্যে অহংকার করে থাকে। মনোবৃত্তি মার, ভোগ চেতনায় মার একে দমন করা বড় সাংঘাতিক কঠিন ব্যাপার। স্ত্রী পুরুষের প্রবৃত্তিতে অবিদ্যা উৎপন্ন হয়।

সে রকম কোন দিন বলবে না। নারী (পুরুষ) একজন যক্ষিনী। তাদেরকে লোভ করলে শেষ করে ফেলবে, রক্ত, মাংস স্বরূপ জ্ঞান, কুশল, বুদ্ধি চোষে খাবে। তাহলে তোমরা নির্বান যাও। নির্বানে মুক্ত, স্বাধীন, নিরাপত্তা ও নির্ভয়।

কারণ, হেতু, প্রত্যয় ও নিদান

আজ ৩রা অক্টোবর, ১৯৯৬ ইংরেজী বৃহস্পতিবার। ভোর ৫ টায় তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্ম দেশনা দিচ্ছিলেন। প্রথমেই তিনি কারণ, হেতু, প্রত্যয় ও নিদান সম্বন্ধে বলেন- বৌদ্ধ ধর্মে কিছু লইতে দেয় না। খাইতে দেয় না এবং কোন কিছু গ্রহণ করতে দেয় না। যদি অতি প্রয়োজন হয় অনাসক্ত ভাবে লইতে হয়, খাইতে হয় এবং কোন কিছু গ্রহণ করতে হয়। কারণ হেতু, প্রত্যয় ও নিদান সম্বন্ধে না জানলে, না বুঝলে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানবে না। বৌদ্ধ ধর্ম তিন প্রকারে শ্রেষ্ঠ। যেমন মার্গ, ফল ও নির্বানে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হলে টাকা, পয়সা, সোনা, রূপা, ধন সম্পদ প্রভৃতি গ্রহণ করতে পারবে না। মার্গ, ফল ও নির্বান অজ্ঞানে বুঝতে পারে না।

তিনি একটি উপমা দিয়ে বলেন- দুই শত হাত পানিতে মাত্র আট হাত লম্বা বাঁশ দিয়ে ঠাঁই চাইলে ঠাঁই পাবে? কোন দিন পাবে না। সেরকম যারা বনবিহারে শ্রমন ও ভিক্ষু হয়, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শ্রমন ভিক্ষু কাপড় ছেড়ে চলে যায়। কেন যায় জান? দুইশত হাত পানিতে আট হাত লম্বা বাঁশ দিয়ে ঠাঁই পাচ্ছে না বলে। এখানে নির্বান হল দুইশত হাত পানি

এবং তাদের জ্ঞান হল মাত্র আট হাত লম্বা বাঁশ। তলদেশ কোথায় তারা জানে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি যে বুঝতে পেরেছে সে তলদেশ নাগাল পেয়েছে। এবং বৌদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সুতরাং সুখ ও পেয়েছে। তা হল বুঝা যাচ্ছে নির্বান খুব গভীর। তোমাদের চারি আর্য সত্য জ্ঞান ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি জ্ঞান অর্জন হলে বুঝতে হবে তলদেশ পেয়েছ। না পেলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। মার্গ, ফল ও নির্বান তথা তলদেশ চর্মচক্ষে দেখা যায় না। তা জ্ঞান দ্বারা না জানলে জানা যায় না। জ্ঞান দ্বারা দর্শন না হলে বুঝা যায় না, দর্শন করা যায় না, পরিচয় হয় না এবং চিনা যায় না।

ভগবান বুদ্ধ বলেন- নির্বানে যাও। অন্য জনে বলে- আমি যাব না। তাহলে কে বুঝেনি? সে রূপ বনভন্তে বলেন- তোমরা নির্বানে যাও। তোমরা যদি বল- আমরা নির্বানে যাব না। এখানে কে বুঝেছে এবং কে বুঝেনি? বুদ্ধের কথা ধরলে অনাথ আশ্রম করবে না। সত্যের আশ্রম করবে। আর যদি নিজের কথা অনুযায়ী কর? কামভোগ করলে কোন পাপ নেই ও দোষ নেই? অজ্ঞানীরা কাম ভোগ করে এবং জ্ঞানী হলে কাম ভোগ করে না।

তিনি বলেন- বুদ্ধের আমলে বুদ্ধ মূর্তি, ধর্ম বই ও মাইক ছিল না। বুদ্ধ মূর্তিকে ছোয়াইং দেয় কেন? ভগবান বুদ্ধ না থাকলেও তাঁর ধাতু অস্থি গুলি এখনও আছে। এখানে বুদ্ধ মূর্তিকে ছোয়াইং দেয়া হচ্ছেনা। জ্ঞানকে দেয়া হচ্ছে। বুদ্ধ মূর্তি হল জ্ঞানের প্রতীক মাত্র। বুদ্ধ না থাকলেও তাঁর বাণীগুলি এখনও আছে সকলের সুবিধার্থে বই আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দূরবর্তী লোকদের শোনার সুবিধার্থে, মাইকের ব্যবহার হচ্ছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- এ দেহ থাকতে জন্ম, জ্বরা, মরনাদি ধ্বংস করতে না পারলে মরনের পর বারবার জন্মগ্রহণও মৃত্যু বরণ করে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হবে। নির্বান হলে পুনরায় দুঃখ ভোগ করতে হয় না। নির্বান হলে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অজ্ঞানীরা বলে থাকে মরে গেলে দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু একমাত্র যার চিত্ত নিরোধ ও গতি নিরোধ হয়েছে সে শুধু মুক্তি পেয়ে থাকে। চিত্ত উৎপন্ন ও গতি উৎপন্ন হলে পঞ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যেমন মানুষ, দেবতা, প্রেত, নরক ও তির্যক, এ পঞ্চ গতিতে গমনাগমন হয়। অজ্ঞানীরা যাবতীয় দুঃখ পেয়ে মৃত্যু হলে উত্তম

বলে মনে করে এবং বলে থাকে যে মরেছে সে দুঃখ থেকে মুক্ত হয়েছে। যারা জ্ঞানী তাদের জন্ম মৃত্যু নেই। সুতরাং তাদের কোন দুঃখ ও নেই।

তিনি আরো বলেন- আনাপানা স্মৃতি দ্বারা নির্বান লাভ করা যায়। তবে অজ্ঞানীরা শ্বাস-প্রশ্বাস টানলে ও ফেললেও তাতে জ্ঞান নেই বলে তাদের জন্ম মৃত্যু হচ্ছে, নির্বান লাভ হচ্ছে না। যারা জ্ঞানী তারা শ্বাস গ্রহণ করলে জ্ঞান যোগে গ্রহণ করে এবং নিঃশ্বাস ফেললে জ্ঞান যোগে ফেলে। আর যারা অজ্ঞানী তারা শ্বাস গ্রহণ করলে অজ্ঞানে গ্রহণ করে এবং নিঃশ্বাস ফেললে অজ্ঞানে ফেলে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- যারা কাপড় ছেড়ে চলে যায়, তারা কি বুঝে চলে যায়? না, না বুঝে চলে যায়? উপবাস থাকলে বাবুর্চি বা স্ত্রীর প্রয়োজন হয়। বনভন্তে ও বহুবার উপবাস ছিলেন। তার কোন দিন বাবুর্চি বা স্ত্রীর প্রয়োজন হয়নি। ভিক্ষুর পক্ষে স্ত্রী লোক গ্রহণ করা দূরের কথা, ছুঁইলেই পাপ হয়। একবার ডাঃ অরবিন্দ ভিক্ষু হওয়ার আশা করেছিল। তার স্ত্রী তাকে অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু সে ভিক্ষু হয়নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে তার ততটুকু সাহস ও জ্ঞান নেই। (এ কথাটি বলার পর সবাই হেসে উঠলেন)। তিনি বলেন- একবার দেবদত্ত ভগবান বুদ্ধকে বলেছিল- আমি ভিক্ষু সংঘ পরিচালনা করব। বুদ্ধ বললেন- আগে নিজকে নিজে পরিচালিত কর, পরে অন্যজনকে পরিচালিত করতে পারবে। নিজে মুক্ত হয়ে অপরকে মুক্ত করতে পারে। ঠিক সেরকম নিজে সুপরিচালিত হলে অপরকে পরিচালিত করতে পারে।

বিনা মূল্যে নির্বাণ সুখ পাওয়া যায়। অন্যান্য জিনিষ মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। বনবিহারেও কোন কিছু মূল্য দিতে হয় না। তবে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করতে হবে। বৌদ্ধ ধর্মে বলতে হয় সকল সংস্কার অনিত্য, সকল সংস্কার দুঃখ ও সকল সংস্কার অনাত্ম। অনিত্য অর্থ সূত্র, দুঃখ হল বিনয় এবং অনাত্ম হলে অভিধর্ম। অনিত্য-ক্ষয় ব্যয়শীল, বলে, দুঃখ,-যাহা অহরহ নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং অনাত্ম-যাহা অনিচ্ছাবশে সংগঠিত হয়, আপনার নহে বলে। ত্রিপিটককে বিস্তারিত করলে চারি আর্য সত্য বুঝায়। চারি আর্য সত্যকে বিস্তারিত করলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বুঝায়। অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বিস্তারিত করলে ৩৭ প্রকার বোধি পক্ষীয় ধর্মকে বুঝায়। ৩৭ প্রকার বোধি পক্ষীয় ধর্মকে

বিস্তারিত করলে চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ বুঝায়। ভগবান বুদ্ধ প্রথমে সংক্ষিপ্ত দেশনা করেন। পরিশেষে বিস্তারিত ভাবে দেশনা করেন।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দুই লাইন বিশিষ্ট গাথা বলে তার দেশনা সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

সুবিচারে সবিনয়ে চালায় অন্যজন।
ধর্মস্থ মেধাবী নামে অভিহিত হন।।

লৌকিক সত্য ও লোকোত্তর সত্য

আজ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৯৬ ইংরেজী। ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। প্রথমেই তিনি বলেন- তোমরা কি জন্যে ভিক্ষু শ্রমন হয়েছ? আর না অন্য কিছু? কেউ কেউ যাত্রা দলের অভিনয়ের মত ভিক্ষু শ্রমন হয়ে থাকে। তা কি করম জান? যেমন যাত্রা দলে কেউ রাজা হয়, রাজার বেশ ধারণ করে, কেউ প্রজা, প্রজার বেশ ধারণ করে। অন্যান্য জন অন্যান্য জনের বেশ ধারণ করে থাকে। তোমরাও ভিক্ষু শ্রমনের বেশ ধারণ করে ভিক্ষু শ্রমনের অভিনয় করতেছ নাকি? যারা অভিনয়কারী তারা রাত্রে অভিনয় করে দিনে নিজ নিজ পোষাক পরিধান করে। ঠিক সে রকম তোমরাও যাত্রা দলে অভিনয় কর না। সত্য সত্যই ভগবান বুদ্ধের নীতি অনুসরণ করে প্রকৃত ভিক্ষু শ্রমণ হও।

তিনি বলেন- সত্য দুই প্রকার। ব্যবহারিক সত্য ও পারমার্থিক সত্য। অন্য নামে বলা যায়- লৌকিক ও লোকোত্তর। লৌকিক- মা বাপ, ভাইবোন, স্ত্রী–পুরুষ, ধন-সম্পদ প্রভৃতিকে বুঝায়। লোকোত্তরে মা, বাপ ভাই বোন, স্ত্রী পুরুষ, ধন-সম্পদ প্রভৃতি কিছু নেই (বুঝায়)। লৌকিক গুলি স্বপ্ন সদৃশ, লোকোত্তর গুলি বাস্তব। যেমন একজন লোক রাত্রে ঘুমের সময় দুই মন স্বর্ণ পেয়েছে, দিনে সে গুলি নেই। অন্যজন সত্যি সত্যিই দুই মন স্বর্ণ পেয়েছে। প্রথম জন পেল কল্পনা প্রসূত এবং দ্বিতীয় জন পেল বাস্তবে। প্রথম জন হল লৌকিক ও দ্বিতীয় জন লোকোত্তর।

তিনি আরো বলেন- যেমন ধর, একজন লোক স্ত্রী পুত্র ছেড়ে ভিক্ষু হয়েছে। যদি সে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তার কি ছাড়া হয়েছে? চিত্তের

মধ্যে স্থান দিলেও ছাড়া হবে না। আন্দাজ করে ছাড়লে ও ছাড়া হবে না। সিদ্ধার্থ গোপাকে যেমন করে ছেড়ে দিয়েছেন তেমন করে ছেড়ে দিতে হবে।

রাজা মিলিন্দ ভিক্ষু নাগসেনকে প্রশ্ন করেছিলেন- শ্বেত বস্ত্র নিয়ে মার্গ, ফল ও নির্বাণ লাভ করতে পারে কিনা? আচ্ছা, এখন তোমরা কোন দিকে বলবে? তোমরা যেদিকে উত্তর দিবে সেদিকে ধরা পড়বে। ভগবান বুদ্ধের সময়ে একজন নূতন ভিক্ষুকে প্রশ্ন করেছিল। তিনি বললেন- আমি নূতন ভিক্ষু। সুতরাং ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন করতে পারেন। সে রকম তোমাদেরকে প্রশ্ন করলে বলবে আমাদের গুরু শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট প্রশ্ন করুন।

তিনি বলেন- কে খায়? কে খায় না? লোভ ও তৃষ্ণায় খায়। লোভ ও তৃষ্ণা না থাকলে খাবে না। খেলে দেবে, না খেলে কিছুই দেবে না। তা হলে উপায় কি? লোভে আহার করে। তৃষ্ণায় আহার করে। লোভ, তৃষ্ণা নিরোধ করে আহার করলে লোভ তৃষ্ণা মুক্ত হয়। আহার চার প্রকার স্থূল আহার, স্পর্শ আহার, বেদনা আহার ও বিজ্ঞান আহার। এ আহার গুলি কিভাবে নিরোধ করবে?

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই আহার নিরোধের একমাত্র উপায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আহার নিরোধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত হতে পারবে না।

আচ্ছা, যদি কেউ তোমাদেরকে নির্বান সম্বন্ধে প্রশ্ন করে- নির্বান আধ্যাত্মিক না বাহ্যিক? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক ও মন আধ্যাত্মিক- রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ স্পর্শ ও স্বভাব ধর্ম বাহ্যিক। এগুলির মধ্যে কোথায় নির্বাণ? কোথায়ও নেই নির্বান। বাতাস যেমন শরীর দ্বারা অনুভব করা যায় নির্বান ও চিত্তের দ্বারা অনুভব করা যায় মাত্র। চর্ম চক্ষে নির্বাণ দৃষ্টিগোচর হয় না।

মহা জ্ঞানী আর্যগন
যে পথে করেছে গমন।
লভিয়াছে সম্যক দর্শন
সেই পথ লক্ষ্য করে
আচরিবে ধৈর্য ধরে
সার্থক কর এই জীবন।।

এখানে প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হল মহাজ্ঞানী। যে ধর্ম করলে সুখ ও মুক্ত হয়, সে ধর্মে বিশ্বাসও জন্মে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- আচ্ছা বলদেখি, তোমরা নির্বাণ যেতে যেতে অর্ধ পথে নেমে পড়লে কি হবে? যাওয়া হবে না। অনেকে গুন্ডার কবলে পড়ে। গুন্ডা হল নারী। যুবক কেন বৃদ্ধেরা ও গুন্ডার হাতে পড়ে। তোমরা গুন্ডার তালাশ কর না। নির্বাণ তালাশ কর। নির্বাণ ব্যতীত অন্য গুলি পাপ, দুঃখ ও মুক্ত নয়। যারা জ্ঞানী তারা নির্বাণ তালাশ করে। যারা অজ্ঞানী তারা অন্য কিছু তালাশ করে। তোমরা যে গুলি ফেলে এসেছ সেগুলি আবার তালাশ কর না। অবিদ্যা, তৃষ্ণায় লইতে চায় ও থাকতে চায়। অবিদ্যা নিরোধ হলে সব ঠিক হয়। অবিদ্যা, তৃষ্ণা ক্ষয় হলে সব ক্ষয় হয়। সব যদি ক্ষয় হয়ে যায় তার আবার কিসের প্রয়োজন? ট্রেন চলার সময় যদি বিপদ হয় শিখল টানলে পুলিশ রক্ষা করে। ঠিক সে রকম তোমাদের যদি কোন বিপদ এসে থাকে ত্রিশরণ ও ত্রিলক্ষণকে স্মরণ কর। ত্রিশরণে পূণ্য ও সুখ হয়। ত্রিলক্ষনে নির্বান সাক্ষাৎ লাভ হয়।

তিনি আরো বলেন- এ সংসারে যাবতীয় গন্ডগোল ও ভেজাল কে করেছে? অবিদ্যা, তৃষ্ণায় যাবতীয় গন্ডগোল ও ভেজাল করছে। অবিদ্যা, তৃষ্ণায় অন্যায় স্বীকার করে না, ভুল স্বীকার করে না, অপরাধ স্বীকার করে না এবং গলদ স্বীকার করে না।

কোথায় কত ভবে জনম নিয়েছি।
জন্ম মৃত্যু শোক তাপ কত সহেছি
নিদারুন দুঃখ তাপে জর্জরিত এ প্রাণ।
জ্ঞান বলে মুক্ত তবে আজি, গাই মুক্তির গান-
বাঁধিতে পারিবে না আর এ'দুঃখ কারাগার।।
মুক্ত হয়েছি আমি লভিব নির্বান।।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বীর বিক্রমে দেশনা করে বলেন- যারা কাপুরুষ তারা নির্বান যেতে পারে না, যারা বীর পুরুষ তারা নির্বান যেতে পারে।

ভিক্ষুরা ভাত খায় কেন? ভিক্ষুর লাভের জন্যে নয়, মানুষের সুখ হওয়ার জন্যে জীবিতে ইন্দ্রিয় রক্ষা করে নির্বাণ যাওয়ার মার্গ আবিস্কারের মানসে।

নির্বানে মানুষ নেই, নারী পুরুষ নেই। মানুষ, নারী-পুরুষ-দুঃখ-পাপ ও মুক্ত নয়। মানুষ মিথ্যা ও নারী–পুরুষ মিথ্যা। চিত্তে অবিদ্যা উৎপত্তি হলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনে দুঃখ উৎপত্তি হয়। যদি কেউ বলে সুখ, সেগুলি সুখ নয়, দুঃখ রাশি মাত্র। চারি আর্য্য সত্য উদয় হলে সম্যক দৃষ্টি উদয় হয়। সম্যক দৃষ্টি দুই প্রকার। লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি। নারী পুরুষ মরবে কিন্তু কর্ম মরবে না। তোমরা কর্ম ধ্বংস কর। কর্ম ক্ষয় ও পাপ ধর্ম ত্যাগ করলে পুনজন্ম হয় না, পাপ ধর্ম ত্যাগ করলে নির্বাণ প্রত্যক্ষ হয়। নির্বাণে কর্মও নেই, ধর্মও নেই। কিন্তু এ জগতে প্রত্যেককে কর্মফল ভোগ করতে হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগেই শ্রেষ্ঠ

আজ ৫ই অক্টোবর, ১৯৯৬ ইংরেজী রোজ শনিবার। ভোর ৫ টায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্ম দেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি দেশনার শিরোনামেই বলেন- বৌদ্ধ ধর্ম হল যে ত্যাগ করে তার জন্যে এবং তাদের কাছে বৌদ্ধ ধর্ম সুখ ও শ্রেষ্ঠ। পাপ ধর্ম ত্যাগ করে নির্বাণ ধর্ম গ্রহণ করলে বৌদ্ধ ধর্মে (সকলের) বিশ্বাস আসে। আর কাহারো কোন বিষয় সন্দেহ থাকে না। যে ভোগ ধর্ম গ্রহণ করে নির্বাণ ধর্ম গ্রহণ করে না, তার জন্যে অশেষ দুঃখ জমা হয়ে থাকে। সে সব সময় দুঃখ বহন করে চলে। সে কোন দিন নির্বান যেতে পারবে? অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মার দর্শনে মানুষের পূন্য হয়, সুখ হয় ও মুক্ত হতে পারে। আর যারা নিত্য, সুখ ও আত্মা বলে তারা পাপ সঞ্চয় করে, দুঃখ সঞ্চয় করে এবং বদ্ধ কারাগারের মত সংসার তৃষ্ণায় আবদ্ধ থাকে।

তিনি বলেন- সুখ সুবিধা না থাকলেও মুক্তির অন্বেষার পথে অন্তরায় হয়। ভগবান বুদ্ধের সময়ে গৃহীরা ভিক্ষুদের জন্যে সুখ সুবিধা, খাওয়া দাওয়া এবং যাবতীয় কিছু পুরন করতেন বলে তাঁরা সহসা অর্হৎ হতে পারতো। তোমরা যদি শীলবান ও প্রজ্ঞাবান হও গৃহীরা নিশ্চিয়ই তোমাদের জন্যে সুখ সুবিধা ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থা করে দেবে। যারা শীলবান ও

প্রজ্ঞাবান তাহাদেরকে স্বর্গের দেবতারা ও বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে থাকে। এমন কি চারিলোকপাল দেবতা পর্যন্ত সাহায্যের জন্য হাজির হয়। তা হলে তোমরা শীলবান ও প্রজ্ঞাবান হও, কিভাবে হবে? চোখ থাকতে ও অন্ধের ন্যায়, কান থাকতে ও বধিরের ন্যায়, মুখ থাকতে ও বোবার ন্যায়, শক্তি থাকতেও দুর্বলের ন্যায় এবং প্রাণ থাকতেও মৃতের ন্যায় থাকতে হবে। তবেই পঞ্চমার মারা পড়বে। পঞ্চমার মারা গেলেই সুখ ও মুক্ত এবং (প্রকৃত) শীলবান, প্রজ্ঞাবান হতে পারবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- কাঁচা (জ্ঞানবিহীন) ভাবে যারা লংকা–বার্মা যায় তারা কোন দিন পঞ্চস্কন্ধ ত্যাগ করতে পারবে না। পঞ্চমার ও ধ্বংস করতে পারবে না। স্কন্ধ থাকলে দুঃখ। স্ত্রী–পুত্র নিয়ে থাকলে হীনতা দেখায়। জ্ঞান বলে উচ্চতা লাভ কর। ভবে ভবে চিত্ত থাকলে উপরে বা নির্বান লাভ করতে পারবে না। লৌকিক এম. এ. পাশ জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান। চারি আর্য সত্য জ্ঞান হল আসল সত্যজ্ঞান।

তিনি আরো বলেন- ভিক্ষু চার প্রকার থাকে। মার্গ দেশক, মার্গজীবি, মার্গজিন ও মার্গদুষক। মার্গ দুষক ভিক্ষু সবচেয়ে খারাপ। গরু ও গাধা যেমন এক সাথে চললেও কিন্তু তাদের মধ্যে চালচলন পৃথক থাকে; সে রকম মার্গ দুষক ভিক্ষু ও অন্যান্য ভিক্ষুর মত হবে না। আবার গাধা যেমন গরুর পালে থেকে নিজেকে গরুর ভান করায় তেমন মার্গ দুষক ভিক্ষুরাও বলে থাকে আমরা প্রকৃত ভিক্ষু। শীল ও প্রজ্ঞার দ্বারা মানুষ শান্তি পায় ও ধনী হয়। ধনী দুই প্রকার। টাকা ও ধন সম্পদে এক রকম ধনী। মার্গ ফল ও নির্বান লাভ করলে এক প্রকার ধনী। ৩৭ প্রকার বোধি পক্ষীয় ধর্ম হল এক একটি বুদ্ধ মূর্তি। যার চিত্তে এগুলি থাকবে তার চিত্তে বুদ্ধ ও থাকবে। তা হলে বুদ্ধের উপদেশ, বুদ্ধের শিক্ষা ও বুদ্ধের ট্রেনিং নিলে তথা বৌদ্ধ ধর্ম জানলে, বুঝলে, দেখলে, পরিচয় হলে এবং তাতে আস্বাদ পেলে পরম সুখ নির্বান লাভ করতে পারবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা বিশ্বাস করবে কাকে? চারি আর্য সত্যকে বিশ্বাস কর। আর কাকে বিশ্বাস করবে? আর বিশ্বাস করবে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে। যারা মুর্খ ও অনর্থকারী তারা দুঃখ পায় ও চারি আর্যসত্যকে বিশ্বাস করে না। আবার মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন, অকৃতজ্ঞ হলেও মহা দুঃখের কারণ হয়।

বৌদ্ধ ধর্মে বেচাকেনা নেই, লেখা পড়া নেই ও চাকুরী নেই। এগুলি হল সাধারণের জন্যে। অসাধারণ হলে এগুলির প্রয়োজন নেই। একখানা বিল্ডিং করতে হলে একজন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হয়। ঠিক সে রকম বৌদ্ধ ধর্ম আয়ত্ব করতে হলেও একজন দক্ষ ভিক্ষুর প্রয়োজন। বনভন্তে তোমাদের বৌদ্ধ ধর্মের ইঞ্জিনিয়ার।

তিনি বলেন- যার চিত্তে একাগ্রতা নেই তার জন্যে সদ্ধর্ম ও নেই। যার চিত্তে একাগ্রতা আছে তার জন্যে সদ্ধর্মও আছে। যার চিত্তে পাপ করতে লজ্জা ও ভয় থাকবে সে অর্হৎ পর্যন্ত হতে পারবে। যার চিত্তে পাপ করতে লজ্জা ও ভয় থাকবে না সে মার্গ ফলাদি কিছুই লাভ করতে পারবে না।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক, কুশল, অকুশল সম্বন্ধে জান। কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোককে লজ্জা কর, দুঃখ বলে মনে কর, ভয়ংকর বলে মনে কর এবং মুক্ত নয় বলে মনে কর। সুতরাং তোমরা সে সব ত্যাগ কর। ত্যাগেই সুখ। ত্যাগেই মহিমা, ত্যাগেই শান্তি।

সার কি? অসার কি?

আজ ৬ই অক্টোবর, ১৯৯৬ ইংরেজী রবিবার। ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর ধ্যান কুঠিরের উপরের তলায় ধর্ম দেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি প্রথমেই বলেন- সাধারণ ব্যক্তি ধন কামনা, পুত্র কামনা, বিবিধ জিনিষ কামনা, রাষ্ট্র কামনা এবং আপন সমৃদ্ধির জন্যে কামনা করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। যারা জ্ঞানী ও মুক্ত হতে ইচ্ছুক তারা কিছুই কামনা করেন না। তাঁরা তিন প্রকার জ্ঞানের অধিকারী হতে চান। সত্যজ্ঞান, কৃত্যজ্ঞান ও কৃতজ্ঞান। সত্যজ্ঞান হল দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান। কৃত্যজ্ঞান হল- যা কিছু কুশলা কুশল ধর্ম আছে তা ভাল ভাবেও জানা এবং লোভ, দ্বেষ, মোহ ধর্মের উৎপত্তি, বিদ্যমানতা সম্বন্ধে যথার্থরূপে অবগত হওয়া। কৃতজ্ঞান হল যা কিছু মিথ্যা ধর্ম আছে যা ত্যাগের উপযুক্ত অর্থাৎ কত পরিমাণ লোভ, দ্বেষ, মোহ

গ্রহীন রয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে উৎপত্তি হতে পারবেনা সে সম্বন্ধে যথার্থরূপে (সম্যকভাবে) অবগত হওয়া। সার ৬ প্রকার, কি কি? যথা- শীল সার, সমাধি সার, প্রজ্ঞা সার, বিমুক্তি সার, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সার ও পরমার্থ সার।

তিনি বলেন- যদি তোমরা সুখ চাও তবে তোমাদেরকে বিচক্ষন হতে হবে। যদি বিচক্ষণ হতে পার, তাহলে দুঃখের মাঝখান হতে সুখ আপনার আপনি চলে আসবে। কামনা বাসনা বিজয়ী জ্ঞানী ব্যক্তি সত্য ধর্মের সন্ধান পেয়ে অপরের বৃথ্য কথায় কর্ণপাত করেন না। যেমন বড় সেগুন গাছ (মাঝখানে) পোকায় খেতে পারে না। তেমন জ্ঞানী ব্যক্তি ও মিথ্যা ধর্মে কলুষিত হন না। উপরোক্ত ৬ প্রকার সার কোন দিন ধ্বংস হয় না। তাহলে তোমরা কি ধর্ম করবে? নিজ ধর্ম, সত্য ধর্ম ও নির্বান ধর্ম। সারকে সার বলতে হবে এবং অসারকে অসার বলতে হবে। যেমন বাঁশকে বাঁশ ও গাছকে গাছ বলতে হবে। উল্টা পাল্টা যেন না হয়। ত্যাগের যোগ্য ত্যাগ কর। গ্রহণের যোগ্য গ্রহণ কর। তবে গ্রহণে অনাসক্ত থাকতে হবে।

গ্রহণের যোগ্য এবং গ্রহণের অযোগ্য জিনিষ সম্বন্ধে তিনি বলেন- ভিক্ষু চারি প্রত্যয় ছাড়া নিত্য ব্যবহার্য বস্তু গ্রহণ করতে পারে। গ্রহণের অযোগ্য বস্তু হল টাকা পয়সা, সোনা রূপা, প্রাণী এবং যেগুলি রান্না হয়নি সে সব খাদ্য দ্রব্য। অনেক সময় দেখা যায় ভিক্ষুদের মধ্যে মতের অমিল হলে এমন কি ভিক্ষুরাও পৃথক হয়ে যায়। যেমন জনৈক রাজা তিনজন ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করে রাজবাড়ীতে এনেছেন। তাদেরকে বহু দানীয় সামগ্রী দান করেছেন। তৎমধ্যে তিনজনকে তিনটি হাতী ও দান করেছেন। তাদের মধ্যে দুইজন বললেন- বৌদ্ধ বিনয়ে হাতী বা প্রাণী গ্রহণ করা নিষেধ। অপর একজন বললেন- কি হবে, এগুলি বিক্রি করে অন্য খরচ মিটানো যাবে। অতপর উক্ত ভিক্ষুদের মত বিরোধের কারণে তারা দুইভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। অতএব যারা প্রজ্ঞাবান তারা কোন দিন গ্রহণের অযোগ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না। আর যারা দুষ্প্রাজ্ঞ তারা প্রতিনিয়তই বুদ্ধ বিনয় লংগন করে। মতের অমিলের কারণেই ভিক্ষুগণ পৃথক হয়। আবার দেখা যায় দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাদের মধ্যে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হতে বাধ্য হয়েছে। তাহলে যারা প্রজ্ঞাবান তারা আসল সার গ্রহণ করেন। আর যারা দুষ্প্রাজ্ঞ তারা অসার গ্রহণ করে, নানাবিধ দুঃখের সৃষ্টি করে।

ভগবান বুদ্ধ ভবিষ্যত বাণীতে বলেছেন- অদূর ভবিষ্যতে ভিক্ষু সংঘের মধ্যে ৫ প্রকার মহাচোর উৎপন্ন হবে। সেগুলি হতে সাবধানে থাকার জন্যে সর্তক হওয়া উচিত।

১। এমন কতগুলি মহাচোর ভিক্ষু উৎপন্ন হবে তারা সহস্রজন একত্রিত হয়ে হত্যা করবে, হত্যা করাবে এবং বহুধন সম্পদ লুট করে গণ্যমান্য ভিক্ষু হিসাবে চলবে।

২। এমন কতগুলি ভিক্ষু উৎপন্ন হবে তারা ত্রিপিটক পারদর্শী হিসাবে পরিচয় দেবে। কিন্তু সেগুলি বুদ্ধ বাণী পরিবর্তে নিজের মতবাদ বলে প্রচার করবে।

৩। এমন কতগুলি ভিক্ষু উৎপন্ন হবে তারা নিজে শুদ্ধ ব্রহ্মচারী না হয়েও অপর ভিক্ষুকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। তারা শুদ্ধ ব্রহ্মচারী নামধারী মহাচোর।

৪। এমন কতগুলি ভিক্ষু উৎপন্ন হবে তারা ভবিষ্যতে গৃহীদের মত জমি ক্রয় করবে, ব্যবসা বাণিজ্য করবে এবং বিবিধ আসবাব পত্র ক্রয় করে বিলাস বহুলভাবে জীবন যাপন করবে। তারা বিভিন্ন ধর্ম অনুষ্ঠানে যা দানীয় সামগ্রী পাবে কিছু কিছু তার মনোনীত ব্যক্তিদের প্রদান করবে। ভবিষ্যতে যেন আরো লাভ সৎকার বাড়ে।

৫। এমন কতগুলি ভিক্ষু উৎপন্ন হবে তারা ধ্যান, মার্গ, ফল ও বিমুক্তি লাভ না করেও উপযুক্ত ও দক্ষ ভিক্ষু হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে লাভ সৎকার আকাঙ্খা করবে। তারা বিভিন্ন হাট-বাজারে ও পথে ধর্ম ভাষণ দিয়ে নিজকে ধন্য বলে মনে করবে।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- ঔষধের গুণাগুন সম্বন্ধে ঔষধ বিক্রেতারা যেভাবে প্রচার করে বনভন্তে ও সেভাবে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু হাট বাজারে ও পথে ঘাটে নয়। নির্জনে ও বিহারে প্রচার করলে ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি পায়। তাহলে তোমরা মিথ্যা ধর্ম, পাপ ধর্ম ও পরধর্ম ত্যাগ কর। এগুলি হল অসার। সত্যধর্ম, পুন্য ধর্ম ও নিজধর্ম গ্রহণ কর। এগুলি হল সার।

জ্ঞানদাতা শ্রদ্ধেয় বনভন্তে

সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক-উপাসিকারা, আপনারা বোধ হয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমাদেরকে উপযুক্ত সময়ে ধর্মদেশনা করেন। প্রয়োজনে আমাদের যাবতীয় ভুল, ভ্রান্তি, গলদ, অপরাধ ও বিভিন্ন ত্রুটি করা হলে তিনি চিত্তের অনুকুলে দেশনার মাধ্যমে সংশোধন করে দেন। কোন আপদ বিপদের সময় আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে তিনি অভয় দান দিয়ে তা মোচন করেন। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহে ও দয়ায় আমরা অর্থাৎ আপামর নরনারী খুবই সন্তুষ্ট। তদুপরি তিনি অতি পরিশ্রমের সাথে অনর্গল ধর্মদেশনার মাধ্যমে আমাদেরকে সর্বোচ্চ দান প্রদান করেন। সে দান হল ধর্মদান জ্ঞান দান ও অভয় দান। তিন প্রকার দানের (জ্ঞান দান, ধর্মদান ও অভয়দান) সম্বন্ধে পূর্বেই অনেক বার বলা হয়েছে। প্রত্যেক উপাসক উপাসিকাদের শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সম্বন্ধে প্রত্যেকের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা নিশ্চইয় থাকবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটে ১৯৭০ ইংরেজী হতে। সে সময় তিনি লংগদুর তিনটিলায় ছিলেন। সে সময় হতে এযাবত তিনি আমাকে নানাভাবে জ্ঞান দান, ধর্মদান ও অভয়দান দিয়ে আমার বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধান, পুরণ করেছেন। এমন কি অদূর ভবিষ্যতে যা কিছু সমস্যার সম্ভাবনা থাকে সেগুলি ও তিনি জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখে সহজ সমাধান করে দিতেন। এরকম সমস্যার সমাধান অনেক আছে। সেগুলি উল্লেখ না করে মাত্র একটি সমস্যার সমাধানের কথা আপনাদের নিকট প্রকাশ করছি। আনুমানিক ১৯৮৪ ইংরেজীর কথা। সে সময় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনের পায়তারা চলছে। আমি প্রায় সপ্তাহে একদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দর্শনে যাই। একদিন তিনি দেশনার ফাঁকে বললেন-অরবিন্দ তুমি প্রায় সময় বনবিহারে এসে থাক। যদি তোমাকে কেউ প্রশ্ন করে-তুমি বনবিহারে এসে কি পেয়েছ? তোমার কি লাভ হয়েছে? এ প্রশ্ন দুইটির সমাধান দিতে পারবে? তিনি বললেন-তুমি সহজে পারবে না। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পার। প্রশ্নের সমাধানে তিনি বললেন-যেমন ধর, জেলেরা জাল দিয়ে মাছ ধরে। গাড়ীর চালকেরা গাড়ী চালিয়ে টাকা পয়সা উপার্জন করে। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা তাদের কর্মের দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে। কিন্তু তোমার বেলায় কি হবে? উত্তরে বলবে- আমার সামর্থ অনুযায়ী আমিও অর্জন

করেছি। সেগুলি জেলে, গাড়ী চালক ও ব্যবসায়ীর মত নয়। সে উপার্জন চোখে দেখা যায় না। শুধু অনুভূতি দ্বারা বুঝা যায়। এরকম উত্তর দিবে।

কিছুদিন পর বনবিহারে যাওয়ার সময় রাজবাড়ী ঘাটের সামনে আনুমানিক ২৫ জন লোক জড়ো হয়ে আলাপ করছে। তারা সবাই রাংগামাটির বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাদের মধ্যে জনৈক ভদ্রলোক আমাকে দেখে বললেন-আপনি একটু দাঁড়ান, আপনাকে প্রায় সময় বনবিহারে যেতে দেখা যায়। আচ্ছা বলুন-আপনি বনভন্তে হতে কি পেয়েছেন? শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিখিয়ে দেয়া প্রশ্নের উত্তর আমার সম্পূর্ণ মনে রয়েছে। আমি বিনা চিন্তায় কম্পিউটারের মত হঠাৎ উত্তর দিতে সমর্থ হই। তাতে সকলের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল পরিলক্ষিত হল। সে ভদ্রলোক পুনবার প্রশ্ন করার সাহস পাননি। অতপর আমি বনবিহারে যেতে যেতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আগাম কথা স্মরণ করতে করতে পৌঁছি এবং প্রমাণ পেলাম যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখে আমাকে আগাম জ্ঞান দান করেছেন।

আমতলী ধর্মোদয় বনবিহারে বনভন্তের দেশনা

আজ ৯ই অক্টোবর/১৯৯৬ ইংরেজী বুধবার। আমতলি ধর্মোদয় বন বিহারে শুভ কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জুরাছড়ি বনবিহার হতে ইঞ্জিন বোট যোগে আসতে সময় লেগেছে ২২ মিনিট। এ বিহার অন্যান্য বনবিহার থেকে একটু ছোট হলে ও বেশ সুন্দর পরিবেশে গড়ে উঠেছে। ধর্মোদয় বনবিহারটি সুবলং খাগড়াছড়ি বিস্তর্ণ বিলের প্রায় পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। উক্ত বিলটি জলমগ্ন হওয়ার দরুন একটা বিরাট জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। এ বিলের পরিধি হবে আনুমানিক ৬ মাইল। পানি কমে গেলে চাষাবাদ চলে।

আমতলী ধর্মোদয় বনবিহার অর্থাৎ মূল বিহারটি মাটির তৈরী এবং চারিদিকে বারান্দা পরিবেষ্টিত বিহারে টিনের ছাউনি ও সামনে টিনের ছাউনিতে দেশনা ঘর অবস্থিত। বিহারের পশ্চিম পাশে স্থায়ী অনুষ্ঠান মঞ্চ ও

তৎসংগে চংক্রমণ ঘর স্থাপিত হয়েছে। বিহারের দক্ষিণ পাশে ভিক্ষু সংঘের জন্যে স্থায়ী আবাস গৃহ নির্মিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের জন্যে যে সাধনা কুঠির তৈরী হয়েছে তা বিহারের দক্ষিণ পাশে পাহাড়ে। বিহার থেকে বনভন্তের কুঠিরে যেতে হলে অনেক দূর ঘুরে পৌছতে হয়। পথটি যেন ধনুর মত বাঁকা। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্যে যে কুঠির নির্মিত হয়েছে তা নির্জন ও গভীর বনে পরিবেষ্টিত। এমন বনভূমিতে যে কোন সাধকের চিত্ত সহজেই ধ্যানে রমিত হওয়ার উপযুক্ত স্থান। এলাকার সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে বেশ সদ্ধর্মের অনুপ্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। অদূর ভবিষ্যতে সদ্ধর্মের উন্নতি হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

সকাল বেলায় অনুষ্ঠানের মধ্যে সংঘদান যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্পন্ন হয়। এ অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ধর্মদেশনা প্রদান করেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞা বংশ মহাথের। তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে এক নাতিদীর্ঘ ও তাৎপর্য পূর্ণ ধর্ম দেশনা প্রদান করে শ্রোতাদের গভীর ভাবে শ্রদ্ধান্বিত করে তোলেন। দুপুরে শ্রদ্ধাবান উপাসকরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে দোলায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপবিষ্ট করান। দুপুর আড়াইটায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় দান শ্রেষ্ট কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠিত হয়। কঠিন চীবর দান শেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপস্থিত ধর্মার্থীদের উদ্দেশ্যে এক ধর্মদেশনা প্রদান করেন।

দেশনার প্রারম্ভেই তিনি পূর্বে রেকর্ডকৃত পঞ্চশীলের মাহাত্ম্য শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে শ্রবন করান। পরে তিনি বলেন- ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করে চিন্তা করলেন যে, এ গভীর ধর্ম কেউ বুঝতে সক্ষম হবে না সুতরাং ধর্ম প্রচার করবনা। মহাব্রহ্মা উপস্থিত হয়ে বললেন-হে ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ, আপনার গভীর ধর্ম ধারণ করার লোক অবশ্যই মিলিবে। অনুগ্রহ পূর্বক আপনি ধর্মদেশনা প্রদান করুন। মহাব্রহ্মার অনুরোধে ভগবান বুদ্ধ প্রথমেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদেরকে ধর্ম প্রচার করেন। ঠিক তেমনি এখানে ও বনভন্তের ধর্মদেশনা ধারণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন লোক আছে কি নেই সন্দেহ হচ্ছে।

তিনি বলেন-ধর্ম কথা কে শোনে? কে বুঝে? যারা জ্ঞানী তারা ধর্ম কথা শোনে ও বুঝে। আর যারা অজ্ঞানী তারা ধর্মকথা শোনে ও বুঝে না। তা হলে অবিদ্যাকে বিদ্যা উৎপত্তি করে মার সৈন্যকে পরাজিত করতে পারলে মানুষ শান্তি ও সুখ পাবে। তোমরা পূর্ব জন্মের পাপের ফলে এখানে জন্ম হয়েছে। স্বীকার কর এ প্রতিকুল জায়গায় জন্ম হওয়ার দরুন নানাবিধ

দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। ভাল জায়গায় জন্ম হলে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারতে। বনভন্তে ৩টি কারণে সংসার করেননি। নারী নিয়ে সংসার করলে পাপ হয়, কোন বিশ্বাস নেই ও নানাবিধ দুঃখ পায়। আচ্ছা নারীরা মুক্ত বা অর্হত হতে পারে কিনা? ভগবান বুদ্ধের সময় অনেক নারী ষড়াভিজ্ঞা অর্হত হয়েছেন তবে এখন সেরকম পরিবেশ নেই।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-অনেকে মনে করে বনভন্তের নিকট টাকা আছে। না হয় বিহার গুলির উন্নয়ন কি ভাবে হচ্ছে? আমি যখন উখিয়া যাই তখন জনৈক মার্মা ভিক্ষু একখানা দরখাস্ত দিয়ে তাঁর বিহারের উন্নয়নের জন্য টাকা চেয়েছেন। কিন্তু বনভন্তের নিকট টাকা কোথায়? তিনি টাকা স্পর্শ ও করেন না। ধনী হয় কি ভাবে জান? শীল পালন করলে। ভালভাবে পঞ্চশীল পালন কর যাতে তোমরা ধনী হতে পারবে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারবে।

তিনি বলেন-মার অর্থ কি জান? মানুষকে মারে বলে মার। বৌদ্ধ মতে মার বলে, হিন্দু মতে শনি এবং ইসলাম মতে শয়তান বলে। মার কাউকে সহজে মুক্ত হতে দেয় না। আর নানাভাবে মানুষকে মুক্তির পথে বাঁধা দেয়। একবার বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষুদের ভোজন শালায় এক কাল বৃষ হয়ে ঢুকেছিল। মার হিসেবে চিনতে পেরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। আর একবার ভিক্ষুনী উৎপলবর্ণাকে বলেছিল তুমি সুন্দরী নারী এখানে বসে আছ কেন? আমি একজন সুদর্শন যুবক আমাকে স্বামীরুপে গ্রহণ কর। উৎপলবর্ণা বললেন-ওহে পাপমতি মার, তুমি আমাকে ভালরূপে চিনোনা। একথা বলায় মার পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কাঁচা (মার্গফল বিহীন) অবস্থায় থাকলে মার অনিষ্ট করতে পারে। পাপমতি মার বনভন্তেকে ও (বহুভাবে) ক্ষতি করতে চায়? অনেক শিক্ষিত নারী প্রব্রজ্যা নিতে চায়। তারা সকলেই কাঁচা। আমি তাদেরকে বলে থাকি তোমাদেরকে চৌকি দিতে পারবোনা। এগুলি বনভন্তের নিকট মারে পাঠিয়ে দেয়। ভগবান বুদ্ধকে যদি কেউ আমন্ত্রণ করে মারে বাঁধা দিতে চায়। এমন কি বুদ্ধকে পরিনির্বাণ যাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করেছে। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার হলে মার কষ্ট পায় এবং তার রাজ্য ধ্বংস হয়। বৌদ্ধ ধর্মে অজ্ঞান থাকলে, না বুঝলে ও মিথ্যা দৃষ্টি থাকলে মার সন্তুষ্ট থাকে। জ্ঞানে শুনে, বুঝে ও নির্বাণ যেতে সহজ হয় এবং মারকে পরাজয় করতে পারে। যারা জ্ঞানী তারা বুঝতে পারে যে আমি দুঃখ পাচ্ছি, আমি

পাপ কাজ করছি। আমি পাপের সাথে, দুঃখের সাথে ও আত্মার সাথে থাকব না। আমি বা আত্মার সব সময় নিজকে ভাল বলে ও অপরকে খারাপ বলে। লংকা-বার্মাতে সকল সুযোগ সুবিধা আছে। এখানে তেমন কিছুই নেই বললে চলে।

আমতলী ধর্মোদয় বনবিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সুনন্দ স্থবিরকে লক্ষ্য করে বলেন এ ভিক্ষু বৃদ্ধ বলে যে কোন নারী তাকে ভিক্ষু জীবন থেকে চ্যুত করতে পারছে না! যুবক ভিক্ষু হলে লোকে মুলা যে ভাবে কামড়িয়ে খায় সেভাবে তাকে খেয়ে ফেলতে চেষ্টা চালাত। বৃদ্ধ ভিক্ষু লৌহার টুকরার মত কামড়িয়ে খেতে পারে না।

এ কথাটি বলার পর সবাই হেসে ফেললেন। যুবক ভিক্ষু যদি দক্ষ না হয় মুলার মত খেয়ে ফেলবে। যারা জ্ঞানী তারা গুন্ডা চেনে। একবার এক নারী (গুন্ডা) মোদ্‌গলায়নকে প্রলোভনে ফেলতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত উক্ত গুন্ডা নারী ও প্রব্রজ্যা নিয়ে ষড়াভিজ্ঞা অর্হত হয়েছে। অর্হৎ হওয়ার পর তার যাবতীয় গোলমাল শেষ হয়েছে। কাঁচা অবস্থায় ভিক্ষু হলে নানা প্রকার দোষ করবে। অর্হত্ব ফল লাভ করতে পারলে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ, স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। তাহলে বুঝতে হবে মানুষ দুঃখ, নারী পুরুষ দুঃখ ও মার দুঃখ, এগুলি থাকলেই নির্বাণ যেতে পারে না।

তিনি বলেন- নারীর অন্যান্য দুঃখ থেকে দুইটি দুঃখ সাংঘাতিক। একটি দুঃখ সন্তান প্রসব করা, অন্যটি হল যদি সতীন থাকে। নারী জন্ম দুঃখ জনক বলে শীল পালন করে ক্রমান্বয়ে নির্বানে চলে যাওয়া উচিত। মন চিত্তের ঘর বাড়ী নেই, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ান দুঃখ, যে লোকের ঘর বাড়ী নেই সে ও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। সেও বহু দুঃখ পায়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন-হার মোনিয়ামের ঘাট খারাপ হলে মেরামতকারীর নিকট নিয়ে যেতে হয়, ঠিক তেমনি বনভন্তে ও হারমোনিয়াম মেরামতকারী। বনভন্তে নারী পুরুষের কল বিকল হলে সেগুলি মেরামত করেন। সেগুলি হল অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ, স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতু। এগুলি মেরামত করে দিতে পারলে স্বাভাবিক হবে অর্থাৎ নির্বাণ যেতে পারবে। বনভন্তের অনেক গুলি নারী পুরুষ (হারমোনিয়াম)

মেরামত করা সম্ভব নয়। সুতরাং অনেক সাহায্যকারীর দরকার। উপযুক্ত সাহায্যকারী হল ভিক্ষু সংঘ। তারা দক্ষ কারিগর হতে পারলে ভবিষ্যতে বহু নারী পুরুষের উপকার হবে।

তিনি বলেন-যে দুঃখ গুলি ভালভাবে বুঝেছে, জেনেছে, পরিচয় হয়েছে এবং দেখেছে সে দুঃখের সাথে না থেকে নির্বাণ চলে যাবে। মানুষ বারবার জন্ম হলে নানাবিধ দুঃখ পায়। যেমন ধর একজন নারী (শিশু) জন্মগ্রহণ করেছে। তার মা বাপ হয়েছে, স্বামী হয়েছে, ছেলে মেয়ে হয়েছে এবং বহু আত্মীয় স্বজন হয়েছে। মারা যাওয়ার পর আবার নারীরূপে জন্ম গ্রহণ করেছে। এগুলি আবার হবে এবং নানাবিধ দুঃখ পেতে হবে। নারী না হয়ে যদি পশু পক্ষী হয়ে জন্ম হয়, তারা কি চিনবে কোন দিন চিনবে না। তারা পশু পক্ষী হত্যা করে মাংস খাবে। তা হলে কোথায় গেলে সুখ হবে? কোন দেশে বা স্থানে গেলে সুখ নেই। নির্বাণ গেলে পরম সুখ মিলবে। সে সুখ কোথায় থাকে? মনচিত্তে। তোমরা বল ওহে মন মানুষের সাথে থাকি ও না ওহে মনচিত্ত দুঃখের সাথে থাকিও না, প্রিয়জনের সাথে থাকিও না, প্রেমের সাথে থাকিও না, ভাল বাসার সাথে থাকিও না, থাক শুধু নির্বাণের সাথে। নির্বাণের সাথে থাকলে কোন দুঃখ নেই, পাপ নেই, ভয় নেই, স্বাধীন ও মুক্ত। সাধু সাধু সাধু।

অলৌকিক ঘটনা ও দৃশ্যাবলীর বিবরণ

(১) ৮ই অক্টোবর/১৯৯৬ ইংরেজী মংগলবার। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে রাংগামাটি হতে আমতলী এসে তাঁর জন্য নির্মিত নিদ্ধারিত কুঠিরে অবস্থান করছিলেন। সন্ধ্যার পর উক্ত বিহারের শ্রদ্ধাবান দায়ক বর্তমান বিহার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু অনিক কুমার চাকমা ও বাবু অশ্বিনী কুমার চাক্‌মা অন্যান্যদের মত তারা দুই জনে ও অষ্ট শীলে অধিষ্ঠিত হয়। তারা দুই জন মিলে সন্ধ্যার পর মূল বিহার হতে বনভন্তের কুঠিরের দিকে যাচ্ছিলেন। (মূল বিহার থেকে বনভন্তের জন্য নির্মিত কুঠিরের দূরত্ব আনুমানিক অর্দ্ধ কিলোমিটার হবে) কিছু দূর যাওয়ার পর তারা অদূরে দেখতে পেলেন রাস্তার উপর দিয়ে এক ছোট ছেলে তাদের আগে আগে

হেঁটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর উক্ত ছেলের মুখ থেকে জয়বাংলা ধ্বনি শোনেন তারা ছেলেটিকে বললেন-লক্ষীটি জয় বাংলা না বলে জয় বুদ্ধ বল। ইহার কিছুক্ষণ পরে উক্ত ছেলেটি তাদের সম্মুখ থেকে পার্শ্ববর্তী জংগলে ঢুকে পড়ে। জংগলে ঢুকাকালীন উভয় দায়ক ছেলেটিকে জংগলে না ঢুকার জন্যে নিষেধ করেন এবং সাপে কামড়াবে বলে ভয় দেখালে ছেলেটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে পড়ে।

(২) ৮ই অক্টোবর/১৯৯৬ ইংরেজী মঙ্গলবার রাত্রী কালীন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর কুঠির থেকে সকল উপাসক উপাসিকাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য বললে তারা চলে যায়। তখন আনুমানিক রাত ১০টা হতে পারে। দুইজন দায়ক বননন্দ চাক্‌মা ও সুশীল কুমার চাক্‌মার ধারণা হলো এখনো বনভন্তের কুঠিরে দুই একজন লোক রয়ে গেছে। তা দেখে আসার জন্য দুইজনে মিলে মূল বিহার থেকে বনভন্তের কুঠিরের দিকে অগ্রসর হয়। কিছুদূর গেলে শুনতে পেলেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কুঠিরে কাহারা যেন পঞ্চশীল গ্রহণ করছে। প্রথমে বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি, ধম্মং শরনং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি শব্দ শোনেন। কিন্তু পরবর্তী শব্দগুলি আর বুঝা গেল না। উক্ত শব্দ শুনার পর তারা মূল বিহারে এসে আবার কিছু লোকজন নিয়ে যান এবং সকলেই শুনেন কাহারা যেন পঞ্চশীল গ্রহণ করছে। পরে তাদের মধ্যে দুইজন লোক সন্দেহ নিরসনের জন্য বনভন্তের কুঠিরের দিকে যান। ভন্তের জন্য পানীয় তৈরীর ঘর পর্যন্ত যাওয়ার পর দেখতে পেলেন এক আশ্বার্য্য জনক আলো কুঠির থেকে বের হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার পরক্ষনেই নিস্তব্ধ হয়ে আসে। কিন্তু পানীয় তৈরীর ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা উক্ত পঞ্চশীল গ্রহণের শব্দ শোনেন। আলোর পরে কোন শব্দ শুনা গেল না।

কঠিন চীবর উদ্বোধনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে

আজ ১১ই অক্টোবর/১৯৯৬ ইংরেজী শুক্রবার। আজ বেলা ৩ টায় জুরাছড়ি বনবিহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বেইন ঘরে পূণ্য শীলা মহা উপাসিকা বিশাখা প্রবর্তিত নিয়মে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কঠিন চীবর তৈয়ারী উদ্বোধন করেন। সংগে ছিলেন তাঁর শিষ্য ভিক্ষু শ্রামনগণ। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বেইন ঘরে উপবেশন করার পর উপাসক উপাসিকারা পঞ্চশীল গ্রহণ করেন।

পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন জুরাছড়ি বনবিহারের সাধারণ সম্পাদক বাবু প্রচারক চাক্‌মা। পঞ্চশীল প্রদান করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞা বংশ মহাথের। শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘরা সূত্র পাঠ করার পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এক সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রদান করেন। দেশনার প্রারম্ভে তিনি বলেন-কঠিন চীবর দান এটা একটা কর্ম। কর্ম দুই ভাবে বিভক্ত, কুশল কর্ম ও অকুশল কর্ম। কর্ম করতে হলে প্রসন্ন মনে বা খুশী মনে করা উচিত। যদি কেউ প্রসন্ন মনে কর্ম করে তাতে মহা পূণ্য সঞ্চয় হয়। সে পূণ্যটি কেমন জান? কেউ রোদের মধ্যে হাঁটলে যেমন তার পিছনে পিছনে বা সংগে সংগে তার ছায়া তাকে অনুসরণ করে। সে রকম পূণ্য কর্ম ও তাঁর ইহজন্মে ও পরজন্মে তার সাথে সাথে চলে যায়। তাতে তার সুখ হয় ও সর্বদিকে শ্রীবৃদ্ধি হয়। আর যদি কেউ দুষ্ট মনে কর্ম করে তার মহা অপূণ্য সঞ্চয় হয়। সে অপূণ্য বা অকুশল কর্মটি কেমন জান? গরু গাড়ীতে জিনিষ পত্র বহন করতে নিশ্চয়ই দেখেছ। গরু সামনের দিকে যত হাটে গাড়ীর চাকা গুলি তত গরুর সাথে সাথে চলতে থাকে। ঠিক সেরকম এখানে গাড়ীর চাকা হল অকুশল কর্ম বা দুষ্ট মন। এ কর্ম ইহজন্মে ও পরজন্মে গাড়ীর চাকার মত অনুসরণ করে থাকে। সুতুরাং দুষ্ট মনে কঠিন চীবর তৈরী না করে প্রসন্ন মনে বা খুশী মনে তৈরী করা উচিত। দুষ্ট মনে করলে ইহ ও পরজন্মে দুঃখ হবে এবং প্রসন্ন মনে বা খুশী মনে করলে ইহ ও পরজন্মে ছায়ার মত সুখ অনুসরণ করবে। তিনি বলেন, এ দেশনাটি ভগবান বুদ্ধ ধর্মপদেও বলেছেন। একুশল কর্মের দ্বারা তোমরা নীচে পতিত না হয়ে উর্দ্ধদিকে অগ্রসর হয়ে জন্মে জন্মে উচ্চকুলে জন্ম গ্রহণ করবে এবং অন্তিমে অনাগত ভগবান আর্যমিত্র বুদ্ধের সময়ে অর্হত্বফল লাভ করতে পারবে। সুতরাং তোমাদের কুশল চিত্ত উৎপন্ন করা একান্ত দরকার।

ধর্মথের হও

আজ ১২ই অক্টোবর, ১৯৯৬ ইংরেজী শনিবার। ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে জুরাছড়ি বনবিহারের কুঠিরে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। প্রথমে তিনি শিষ্যদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন-থের কয় প্রকার জান? থের তিন প্রকার। ধর্মথের, সম্মতিথের ও জাতীথের। যারা শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অনুশীলন করে মার্গ ফল ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন তাদেরকে

ধর্মথের বলে। যারা অল্প বয়সে ভিক্ষু হয়ে বৃদ্ধ হয় তাদেরকে ভিক্ষু সংঘ থেররূপে উপাধি বা সম্মতি দেয়, তাদেরকে সম্মতি থের বলে। যারা বয়সের পদবীতে বৃদ্ধ হয় তাদেরকে জাতি থের বলে। ধর্মথের মুক্ত, স্বাধীন। তার পতনের ভয় নেই। সম্মতি থেরর কোন নির্দিষ্ট গমন মার্গ নেই। মনুষ্য কুলে, দেবকুলে বা ব্রহ্মকুলে ও যেতে পারে। এমন কি চারি অপায়ে পতনের আশংকা ও থাকে। জাতিথের এরও যে কোন সময় চারি অপায়ে পতনের সম্ভাবনা থাকে।

যে ভিক্ষুর পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয় থাকে তার নিষ্পাপ ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে কষ্ট হয়না, এবং এতে তার শ্রীবৃদ্ধি হয়, সুখ হয় ও পূণ্য হয়। যার ব্রহ্মচর্য শিথিল থাকে তার দুঃখ, পাপ সৃষ্টি হয় সে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে না। তোমরা শীলবান ও সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হও। ভোগ লালসা ত্যাগ করতে পারলে অর্হত্বফল লাভ করতে না পারলে ও অনাগামী ফল লাভ করতে পারবে। যারা দুঃশীল তারা (গ্রামের ভিতর প্রায়) হীন গৃহীর ন্যায় জীবন যাপন করে থাকে। তাদের নানাবিধ উপদ্রব ও দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

তিনি বলেন-তোমরা আত্ম দমন, চিত্ত দমন ও ইন্দ্রিয় দমন করে নির্বাণের শিক্ষা, উপদেশ, জ্ঞান ও ট্রেনিং গ্রহণ কর। যদি তোমাদের পূর্ব জন্মের পূণ্য পারমী থাকে তবে গৃহীরা নিশ্চয়ই তোমাদের সকল সুযোগ সুবিধা করে দেবে। যাদের পূর্ব জন্মের পূণ্য পারমী থাকে, তারা ধনী বা লাভী হয়। যাদের পূর্বজন্মের পাপ থাকে তারা গরীব হয়। যারা দান করবে তারা পরকালে তাদের দানফল অবশ্যই পাবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-তোমরা শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক হয়ে অজ্ঞানের দিকে না গিয়ে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হও। বিদেশে যাওয়া বা লেখাপড়া ও টাকা পয়সা সংগ্রহ করা লজ্জাজনক ব্যাপার। নির্বানের দিকে অগ্রসর হও। নির্বাণ যেতে লজ্জা ও ভয় করনা। অপরের (শুধু) ভাত খেয়ে খেয়ে থাকা উচিত নয়। নির্বানে কামনা ও বাসনা নেই।

ইহকালে পরকালে আশা যার
নাহি বিদ্যমান।
বাসনা বন্ধনহীন তাকে বলি
আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ।।

তিনি বলেন-মনচিত্ত নির্বানে থাকলে সুখ হয়। তাকে অমার ভূবন বলে। মার্গ ফল ও নির্বাণ লাভ করলে সুখ হয়। দেহ মার্গ, ফল ও নির্বাণ নয়, মানুষ ও আত্মা মার্গ ফল ও নির্বাণ নয়। মার্গ, ফল ও নির্বাণ হয় শুধু মনচিত্তে। মার্গফল লাভী নয় বলে ব্রক্ষারা ও দুঃখ পাচ্ছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-চাক্‌মা, বড়ুয়ারা অধিকাংশ লোক গরীব। তারা যদি বড়লোক হতে পারতো তারা ও সুখে চলতে পারতো এবং ভিক্ষু সংঘকে ও ভাল ভাবে সুযোগ সুবিধা (বেশী) করে দিতে পারতো। যারা ভিক্ষু হয়ে লেখাপড়া শিখে এবং পরে রং বস্ত্র ছেড়ে বিয়ে করে তারা মহাপাপ করে। এবং গৃহীরা ও যারা তাদের পূজা সৎকার করে সে পাপের কিছু অংশের অংশীদার ও বটে। যেহেতু (তারা পাপ কর্মে সহায়তা করেছেন)।

অবশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-সুবলং-জুরাছড়ি বাসীরা যদি একত্র হয়ে ভাল ভাবে বসবাস করে অদূর ভবিষ্যতে তাদের বিপুল উন্নতি হবে ও সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে। হাঁস মুরগী পালন করলে হীনতা দেখায়। উচ্চ ও আদর্শ পরিবার ও আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার একান্ত দরকার।

জুরাছড়ি বনবিহারে কঠিন চীবর দানে বনভন্তের দেশনা

আজ ১২ই অক্টোবর/১৯৯৬ ইংরেজী শনিবার। বিকাল ৩ ঘটিকায় জুরাছড়ি বনবিহারে দান শ্রেষ্ঠ কঠিন চীবর দান, অষ্ট পরিষ্কার দান, বুদ্ধ মূর্ত্তি দান, শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্যে বিশ্রাম কুঠির দান ও পালং দান (খাট) অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বাবু দিলীপ বাহাদুর (সংগীত রচনা করেছেন বাবু সুনীল কুমার কার্ব্বারী)। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু প্রচারক চাক্‌মা। পঞ্চশীল প্রদান করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞা বংশ মহাথের। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আয়ুসংস্কার বৃদ্ধির জন্যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন বাবু প্রবর্তক চাক্‌মা। সভাপতির ভাষন দেন বাবু ধল কুমার

চাক্‌মা। অত্র বিহারের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বুদ্ধশ্রী ভিক্ষু কঠিন চীবর (দান) গ্রহণ করেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সমবেত উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে ৩টা ৫০ মিনিটে হতে ৫টা পর্যন্ত ধর্মদেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রথমেই বলেন-রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে অনাহারে ও অনিদ্রায় ৬ বৎসর কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি মধ্যম পথ অবলম্বন করতঃ অর্থাৎ কাম সুখ ও আত্ম পীড়ন ত্যাগ করে সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। বোধিমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করে সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হয়ে দেব মনুষ্যের মুক্তির জন্যে ধর্ম প্রচার করেন। সে সময় বহু নর নারী তাঁর ধর্মে প্রবেশ করে অবিদ্যা-তৃষ্ণা ক্ষয় করে পরম সুখ নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

সে রকম বনভন্তে ও নিজে মুক্ত হয়ে ধর্ম প্রচার করতে বের হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান নিয়ম হল আগে আপন উন্নতি লাভ করতে হবে, উৎকৃষ্টতা লাভ করতে হবে এবং শ্রেষ্টত্ব অর্জন করতে হবে। পরবর্তীতে অপরজনকে অবিদ্যা-তৃষ্ণা হতে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সে সময় নারীরাও দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে পারছে। এখন পারবে কিনা? সে সময় স্মৃতি ও প্রজ্ঞার দ্বারা মাত্র ৭ দিনে অর্হত্ব ফল অর্জন করেছেন এমন দৃষ্টান্ত গণনাতীত। তারা চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি পুংখানুপুংখরূপে আয়ত্ব করে মুক্ত হয়েছেন।

পূর্বে জনৈক বুদ্ধের বোন বুদ্ধকে, ধর্মকে ও সংঘকে বিশ্বাস করত না। মরণের পর সে নরকে পতিত হয়েছে। পরিশেষে বুদ্ধের প্রচেষ্টায় নরক দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে স্বর্গে গমন করে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বৃটিশ আমলের পন্ডিত নামধারী ভিক্ষুর উদাহরণ দিয়ে বলেন-কালাচোগা নামে জনৈক ভিক্ষু লংকা, বার্মা গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা করে দেশে ফিরেছে ও রাজা নলিনীলাক্ষ রায়ের রাজ গুরু হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে ১৮ বর্ষা বাস অতিক্রম করে জনৈক রমনীর ফাঁদে পড়ে গৃহী হতে বাধ্য হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে তার অজ্ঞানতা আছে বলে নীচে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। সে যদি চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি ভাল রূপে আয়ত্ব করতে পারত কোন দিন নীচে পড়তে হতো না।

ভগবান বুদ্ধ আনন্দকে বলেছিলেন হে আনন্দ, যে চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি জেনেছে ও দেখেছে সে ধর্মকে জেনেছে ও দেখেছে। যে ধর্মকে জেনেছে ও দেখেছে সে বুদ্ধকেও জেনেছে ও দেখেছে। জনৈক রাংগাচান চাক্‌মা অষ্টশীল পালনকারী জনৈক উপাসিকাকে জিজ্ঞাসা করল- তুমি সব সময় অষ্টশীল পালন করে থাক, বুদ্ধকে দেখেছো কোন দিন? উক্ত উপাসিকা উভয় শংকটে পড়েছে।

একবার ঢাকা হতে আগত জনৈক মুসলিম ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনাদের অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের মূলতত্ব কি? শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বললেন- চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিই বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ব। উক্ত ভদ্রলোকের পূর্ব হতে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কিছু মাত্র জ্ঞান ছিল বলে আমার সংক্ষিপ্ত উপদেশ বুঝতে পেরেছেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে জনৈক রাজ কন্যা সম্বন্ধে বলেন-বুদ্ধের সময়ে সুমেধা নামে জনৈক রাজ কন্যার বিবাহের জন্য ঠিক হয়েছিল। সে তার মা-বাবাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারেনি কেউ। শেষ পর্যন্ত নিজের চুল নিজে মুন্ডন করে প্রব্রজ্যার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। এদিকে রাজ কুমার তাকে বলল- তোমাকে আমার সিংহাসন সহ সমস্ত রাজত্ব দিয়ে দেবো, তবুও আমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ কর। রাজ কুমারকে তার প্রব্রজ্যার উদেশ্যের কথা জানালে রাজ কুমার তাকে প্রব্রজ্যা নেয়ার অনুমতি দিলেন। অবশেষে সুমেধা ষড়াভিজ্ঞা অর্হত্ব ফল লাভ করে জানতে পারলেন পূর্বজন্মে বুদ্ধকে বিহার দান করে তার দুঃখ মুক্তি হয়েছে।

তিনি বলেন-বর্তমানে নারী কেন পুরুষেরা ও অর্হত্বফল অর্জন করতে পারছে না। সে সময় বিশেষ কোন গন্ডগোল ছিল না। বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক দলের গন্ডগোল ছিল না। বিভিন্ন ধরণের ধর্ম ও ছিল না। মানুষ নীরবে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারতো। আর বর্তমানে কি রকম জান? যেমন ধর, এক জায়গায় কয়েকজন ছেলে ভাংগাটিন বাজিয়ে খেলা ও আনন্দ করছে। সেখানে গিয়ে যদি কেউ ধর্ম কথা বা দেশনা করে তা শোনা যাবে? শোনা যাবে না। সে অবস্থায় ধর্ম কথা বলাও উচিত হবে না। এখানে বা বর্তমানে যারা ভাংগাটিন বাজাচ্ছে তারা হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও

দুষ্ট (ছেলেরা) মানুষেরা। পরিবেশ শান্ত ও অনুকুল না হলে কোন ভিক্ষুর পক্ষে টিন বাদ্য কারের মধ্যে ধর্ম কথা ভাষণ দেয়া অনর্থক হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নারী ও পুরুষের মধ্যে কিভাবে অপকর্ম হয় এবং কি ভাবে অপকর্ম হতে বিরত থাকতে পারবে সেটার উদাহরণ দিয়ে বলেন। যেমন ধর, একটা ভাল রেডিও। সকল যন্ত্রাংশ ঠিক আছে। বেটারী দিয়ে চালু করলে বি.বি.সি-র খবর শোনা যায়। এখানে এক অর্থে সর্বাঙ্গিন চালু করে খবর শোনা কুকর্ম করা। (অন্য অর্থে) যদি সে রেডিওর যন্ত্রাংশ অচল রাখে ও সে বেটারী সংযোজন না করে সে রেডিও কোন দিন বাজবে না। এখানে রেডিও হল নারী ও বেটারী হল পুরুষ। আর নারী পুরুষের যন্ত্রাংশ কি জান? নারী পুরুষের যন্ত্রাংশ হল অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতু। যদি এগুলি প্রহীন করে দেয়া যায় অর্থাৎ মনচিত্তকে খুলে ফেলা হলে যাবতীয় অপকর্ম হতে অব্যাহতি পেয়ে পরম সুখ নির্বাণ লাভ করতে পারবে।

ভগবান বুদ্ধের সময়কালীন আরো একটি উদাহরণ দিয়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র বিয়ের সময় হলে বহু কন্যা তার পছন্দ হয়নি। শেষ পর্যন্ত এক স্বর্ণ প্রতিমা তৈরী করে বলল-এ রকম সুন্দরী নারী পাওয়া গেলে আমি বিবাহ করতে রাজি আছি। স্বর্ণ মুর্ত্তি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাফেরা করে সে মুর্ত্তির অবিকল নারী পেয়ে বিবাহ হয়। বিবাহের পরদিন যুবকের বাড়ীতে আসার পথে উক্ত সুন্দরী নারী মারাত্মক অসুখে মৃত্যু মুখে পতিত হয় । উক্ত যুবক শোকে মর্মাহত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়। শোকাহত যুবককে ভগবান বুদ্ধ সংসারের বহু দোষ, দুঃখ দেখায়ে ধর্মদেশনা প্রদান করেন। সে দেশনাই উক্ত যুবক নিজে নিজেই বুঝতে পারলেন যে অবিদ্যা তৃষ্ণা থাকলে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়। অবশেষে অবিদ্যা তৃষ্ণা মুক্ত হয়ে ষড়াভিজ্ঞা অর্হত্ব ফল লাভ করেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-সিদ্ধার্থ যখন বোধিতরু মূলে ধ্যানমগ্ন তখন মার রাজা তার কন্যা তৃষ্ণা, আরতি ও রাগকে পাঠিয়ে দিল, যেন সিদ্ধার্থের ধ্যান ভংগ করে দেয়। সিদ্ধার্থ-বললেন যার লোভ, হিংসা ও অজ্ঞানতা নেই নিষ্কলংক বুদ্ধকে প্রলোভনে ফেলতে এসেছ? এখান থেকে চলে যাও তোমরা কখনো সফল হবে না। তার বকুনি খেয়ে তারা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

যেখানে সম্যক সম্বুদ্ধকে মার কন্যা ও মনুষ্য কন্যারা প্রলোভনে ফেলতে চেয়েছে, সেখানে বর্তমানের কাঁচা ভিক্ষুদের কথাই বা কি?

তিনি সমবেত উপাসক উপাসিকাদের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেন-আচ্ছা তোমরা বল, বর্তমানে কতিপয় ভিক্ষুরা নারী কেলেংকারীতে জড়িত হয় কেন? না নারী দোষী? না ভিক্ষু দোষী? উপাসকদের মধ্যে বিভিন্ন মন্তব্য শোনা গেল। অতপর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বললেন-ধর, কয়েকজন লোক নৌকাযোগে যাচ্ছে। একজন মাঝি হয়ে হাল ধরছে এবং অন্যেরা দাঁড় টানছে। এখানে কথা হচ্ছে যে মাঝি হবে তার দক্ষতা থাকতে হবে। না হয় নৌকা গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারবে না। ঠিক সেরকম এখানে মাঝি হল ভিক্ষু অন্যেরা হল যুবতী নারী। মাঝি (ভিক্ষু) যদি ঠিক থাকে কোন গন্ডগোল হতে পারে না।

সম্রাট অশোকের সেনাপতি ইন্দ্র গুপ্তের সাথে জনৈক যুবতীর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইন্দ্রগুপ্ত জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংস্পর্শে এসে বিয়ের পরিবর্তে ভিক্ষু হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অতপর উক্ত যুবতী তাকে বলল-তুমি আমাকে কবে বিয়ে করবে? ইন্দ্রগুপ্ত উত্তরে বলল-বর্তমানে আমি ভিক্ষু হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যুবতী বলল-যদি তুমি ভিক্ষু হও আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ভিক্ষু না হলে আমাকে বিয়ে করতেই হবে। অতপর ইন্দ্রগুপ্ত প্রব্যজ্যা গ্রহণ করে এক সপ্তাহের মধ্যে অর্হত্বফল লাভ করেন। ইন্দ্রগুপ্তের অর্হত্ব প্রাপ্তির পর উক্ত যুবতী ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে এক সপ্তাহের মধ্যে অর্হত্বফল লাভ করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে পুরুষ যে গুলি পারে নারী ও সেগুলি পারে। পুরুষ ও নারী উভয়েই অবিদ্যা তৃষ্ণা, স্কন্ধ, উপাদান, আয়তন ও ধাতুক্ষয় করতে পারে। তবে কাঁচা ভাবে থাকলে পারবে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পূর্বে যে উদাহরণ দিয়েছিলেন আবার ও সে উদাহরণ দিয়ে বলেন-যদি কোন জায়গায় কয়েকজন ছেলে ভাংগাটিন বাজিয়ে খেলা করে বা হৈচৈ করে, সেখানে যদি কেউ ধর্ম কথা বলতে থাকে তার ধর্মকথা কেউ শুনতে পাবেনা। সেখানে ধর্ম কথা বলাও উচিত নহে। বর্তমানে দেশে নানা প্রকার রাজনৈতিক সংগঠনের গন্ডগোলের মধ্যে ধর্মকথা বলা ঠিক হবে না। এখানে ভাংগাটিন বাজানোর মত অবস্থা হয়েছে।

তিনি বলেন-বর্তমানের বৃদ্ধ নারীরা পুর্বের কুসংস্কার ছাড়তে পারছে না। ফলে তারা ভবিষ্যত বংশধরদেরকে পূণ্য কাজে অগ্রসর করাতে পারছে না। অধিকন্তু না জানার কারণেও বৌদ্ধ নীতি শিক্ষা দিতে পারছে না। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যুবক যুবতীদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলেন-তোমরা শীল পালন কর এবং নানাবিধ পূণ্য কাজ কর। যাতে তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল হয়, তাতে পরবর্তী জন্মে হলেও নির্বাণ যেতে পারবে। যে নারী (পুরুষের) পাপের প্রতি লজ্জা না থাকবে তারা ভবিষ্যতে নানাবিধ দুঃখ পাবে এবং ইজ্জত যাবে। যে পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয় করবে সে নির্বাণ ও যেতে পারবে। সমাজের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী পুরুষে প্রেম ভালোবাসা করে এবং তাতে সুখ দেখে কিন্তু যারা প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা করবে তারা স্কন্ধ ব্যাধি গ্রস্থ হবে। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধ স্বাভাবিক থাকে না এবং থাকবেও না। সুতরাং প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা হতে বিরত থাকা প্রত্যেকের প্রয়োজন। এমন কি নারী পুরুষে সংসার করলে ও নানাবিধ দুঃখ পায়, পাপ হয় ও নরকে পতিত হওয়ার আশংকা থাকে।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন-পাকা আম তিন প্রকার থাকে। টক আম, পোকায় ধরা আম ও মিষ্টি আম। যারা সংসার করে তারা টক আম ও পোকায় ধরা আম খায়। আর যারা সংসার করে না বা নির্বাণ যাত্রীরা পাকা মিষ্টি আম খায়। যারা মিষ্টি আম খায় তারা জানে যে আম কেমন মিষ্টি। অন্য কেউ জানতে পারবে না। এখানে মিষ্টি আম অর্থ নির্বাণের স্বাদ প্রত্যক্ষ করা। সুতরাং তোমরা সকলেই মিষ্টি আম বা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্যে সচেষ্ট হও এবং হওয়া উচিত।

বিরল ঘটনা

১। বন্দুক ভাংগা মৌজার কুকি উদান্যা (কামিনী কার্বারী পাড়া) নিবাসী জনৈক পুষ্প কান্ত চাক্‌মা (গোপাল্যা) শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি বীত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতো না। প্রায় সময় বনভন্তের বিরুদ্ধে কুৎসা কথা বলতো এবং নানারূপ সমালোচনাও করতো। কিন্তু তার বাড়ীর অন্যান্য ব্যক্তিরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং প্রায় সময় বনবিহারে দানাদি করতো। পুষ্প কান্ত (৭৫) শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে শ্রদ্ধা ও দান করা দূরের কথা

কেউ তার সামনে বনভন্তের নাম বললেও রাগ করতো। ১৯৯১ সালে একদিন পুষ্প কান্ত চাক্মা মদ খেয়ে ভীষণ নেশা গ্রস্থ হয় এবং আবোল তাবোল বলে মাতলামী করতে করতে বাড়ীতে টাংগানো শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ছবি নিয়ে যায় এবং সুপারী গাছের নীচে ছবিটা ধরে বলতে থাকে-প্রায় লোকেরা বলে থাকে বনভন্তে অর্হত। সত্যিই যদি অর্হত হয়ে থাকে, ছবিটা অবশ্যই গাছ থেকে সুপারী পেরে দিতে পারবে। এভাবে যে দুই তিনবার উপরে ছবিটি ছুঁড়ে মারতে থাকে। সে আরো বলল সুপারী পেরে দিতে পারেনি কি রকম আর্হত? অতঃপর সে উক্ত ছবিটি ঘাটে নিয়ে বলল দেখি পানিতে ডুবালে বুঝা যায় কিনা কি রকম অর্হত? পরিশেষে ঢেকিতে ছবিটি পিষতে থাকে। তখন বাড়ীর সকলেই তাকে অনেক বাঁধা দেয়। কিন্তু সকলের বাঁধা উপেক্ষা করে পা দিয়ে চাপা দিতে থাকে। তবে পায়ে চাপা দেয়ার সাথে সাথেই অনেক দৃষ্ট ধর্মের বেদনীয় কর্মস্বরূপ তার পা ব্যথা করতে আরম্ভ হয়। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় সংগে সংগেই পা ফুলে যায় ও অবশ হয়ে যায়। এমন কি নাড়াচাড়া করার শক্তিটুকুও লোপ পায়।

অতঃপর পুষ্প কান্ত গ্রামে নানা ধরণের চিকিৎসা করতে থাকে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। উপায়ান্ত না দেখে অবশেষে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা মিলে (পুষ্প কান্ত চাক্মার আরোগ্য মানসে) শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং সংঘদান করে দেয়। আর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বল্ল শ্রদ্ধেয় বনভন্তে, সে মদ পান করে মাতাল হয়ে এ অঘটন ঘটিয়েছে। অনুগ্রহ পূর্বক তাকে ক্ষমা করে দিন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বললেন- সে আমাকে কিছু করেনি শুধু ছবিটা ভেংগে পায়ে চাপা দিয়েছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মদেশনা প্রদান করেন। কিছুদিন পর পুষ্প কান্ত একটু আরোগ্য হয়। কিন্তু বর্তমানে পংগু অবস্থায় বাড়ীতে আছে। যে পায়ে বনভন্তের ছবি চাপা দিয়েছিল সে পাটি ছোট ও প্রায় অবশ অবস্থায় লাঠির সাহায্যে একটু একটু হাঁটতে পারে। এ ঘটনাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন বন্দুক ভাংগা মৌজার ভার বুয়াচাপ বনবিহারের শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাপাল ভিক্ষু।

২। ভারবুয়াচাপ এলাকা নিবাসী জনৈক চন্দ্র হরি চাক্মা (দাত্তুয়া) এক ঘোর মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন লোক। সে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বিশ্বাস করতো না। বলা যায় কোন ধর্মকেও বিশ্বাস করতো না। বনভন্তেকে নানারূপ সমালোচনা করতো। কুৎসা রচনা করতো। ১৯৯৫ ইং সনে এক খরা দুপুরে

মদ খেয়ে ঘোর মাতাল অবস্থায় ভারবুয়াচাপ বনবিহারে এসে শ্রদ্ধেয় ভন্তে এবং তার শিষ্যদিগকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে থাকে ও বিহারে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে বলে উম্মত্তভাবে বলতে বলতে দেশনা ঘরের ছাউনিতে আগুন ধরিয়ে দিতে যায়। তখন বিহার অধ্যক্ষ (বর্তমানে পরলোকগত) কৌন্ডন্য ভিক্ষু দেশনা ঘরে বসেছিলেন। তিনি ব্যাপারটি লক্ষ্য করে বললেন 'না জানি তার কি দশা হয়'। পরে উক্ত চন্দ্র হরি যেই বিহারের দেশনা ঘরের চাউনিতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার জন্যে মেচের কাটি যখন ঘষা দেয় তখন হঠাৎ পিছন দিকে ছিটকে পড়ে যায় এবং মাথা ফেটে রক্তের বন্যা বইতে থাকে। মরনাপন্ন অবস্থায় তাকে তার আপন চাচা ইউপি মেম্বার (জুরেশ চন্দ্র চাক্‌মা` চন্দ্র হরির (বাবু রমেশ চন্দ্র চাক্‌মার ছেলে) মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে তার হোস হয় এবং পরে বাড়ীতে নিয়ে যায়। অনেক চিকিৎসার পর আরোগ্য লাভ করে। এ তথ্যটি সরবরাহ করেছেন কুমুরা পাড়ার নির্বাসী বাবু জানক চন্দ্র চাক্‌মা ও বাবু জুরেশ চন্দ্র চাক্‌মা (প্রাক্তন মেম্বার) তারা উভয়ে ভারবুয়াচাপ বনবিহারের দায়ক।

৩। ত্রিপিটকে বর্ণিত আছে ভগবান বুদ্ধের দেহ হতে ছয় প্রকার রশ্মি বিচ্ছুরিত হতো। যেমন নীল, হলদে, লাল, সাদা, কমলা ও প্রভাস্বর। এগুলির বর্ণনা বনভন্তের দেশনা ১ম খন্ড দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা উক্ত ছয় রশ্মিকে বৌদ্ধ পতাকা চিহ্নিত করে বৌদ্ধ ধর্মীয় পতাকা হিসেবে সমগ্র বিশ্বে ব্যবহার করছেন।

ইদানিং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেহ হতে বিভিন্নজনে বিভিন্ন জ্যোতি দেখতে পাচ্ছেন। তৎমধ্যে বনভন্তের দেশনা ২য় খন্ড ১৫৬ পৃষ্ঠায়। 'বনভন্তের দিকে তাকাতে পারি না' 'নিবন্ধে মোহাম্মদ মুছা মিঞা (ফকির) শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেহ হতে উজ্জ্বল ও চোখ ঝলসানো লাল রং এর জ্যোতি প্রত্যক্ষ করেছেন, মর্মে আমাকে পরে জানিয়েছেন। সে সময়ে তিনি আমার পাশে বসা অবস্থায় দেশনা শুনছিলেন।

শিবু প্রসাদ চক্রবর্তীর মা উজ্জ্বল জ্যোতি দেখতে পেয়েছেন। ফটিকছড়ি থানার জনৈক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একবার রাঙ্গামাটি আসলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে দর্শনের জন্য বনবিহারে যান। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সাথে

আলাপকালে তিনি স্বয়ং বুদ্ধকে দেখবার ইচ্ছা ভন্তের নিকট ব্যক্ত করেন। চেয়ারম্যান সাহেবের পূন্যের প্রভাবে বনভন্তে অলৌকিকভাবে বুদ্ধের ছয়টি রশ্মি তাঁর সামনে উপস্থাপন করে তাঁর উদগ্র বাসনা পরিপূর্ণ করে দেন। ইহাতে উক্ত ভদ্রলোক অত্যন্ত চিত্ত প্রশান্তি লাভ করেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্য শ্রীমৎ জ্ঞান প্রিয় ভিক্ষু বহু বৎসর যাবত রাজ বনবিহারে শ্রমন ও ভিক্ষু অবস্থায় আছেন। বর্তমানে ভিক্ষুত্বের বয়স পাঁচ বৎসর। বনবিহারের রীতি অনুযায়ী প্রত্যহ সকাল ও বিকাল বুদ্ধ বন্দনা করার পর ভিক্ষু শ্রমনেরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বন্দনা করেন। বিগত ২৯শে জুন ৯৬ ইং, ১৫ই আষাঢ় ১৪০৩ বাংলা রোজ শনিবার বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় বুদ্ধ বন্দনা করার পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বন্দনা করার জন্যে তাঁর ধ্যান কুঠিরে যান। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কক্ষে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তাঁর দৃষ্টি বনভন্তের উপর নিবদ্ধ হয় এবং এক অপরূপ জ্যোতি দর্শন করে তিনি বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি দেখতে পান বনভন্তের পার্থিব দেহ হতে এক আধ্যাত্মিক শক্তিরূপ এক হলদে রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। জ্যোতিটি কিন্তু চোখ ঝলসানো নয়। তাঁর চীবর ও হলদে আভায় আয়নার মত প্রতিফলিত হচ্ছে। তাঁকে বন্দনা করার পর অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছেন। যত দেখেন আরো দেখার ইচ্ছা থেকে যায়। এভাবে দেখতে দেখতে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের চিত্তটি এক অতীন্দ্রিয় ভরপুর হয়ে উঠে। এ সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্য ভিক্ষু শ্রমনদেরকে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। ঠিক আধ ঘন্টা ধর্মদেশনার পর উক্ত হলদে রং এর জ্যোতি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। এ তথ্যটি তিনি পরিবেশন করেছেন ২৫শে ডিসেম্বর /৯৬ ইং সকাল ৯.০০ টায় শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষুর কামড়ায়।,

উৎকৃষ্ট কর্মে ও ধর্মে মুক্ত হয়

আজ ১৩ই অক্টোবর/১৯৯৬ ইংরেজী রবিবার। জুরাছড়ি সাধনা কুঠিরে ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্ম দেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি প্রথমেই বলেন-ধর্মচার প্রকার। কোন কোন ধর্ম ইহকালে সুখ ও পরকালে

দুঃখ। কোন কোন ধর্ম ইহকালে দুঃখ ও পরকালে সুখ। কোন কোন ধর্ম ইহকালে দুঃখ ও পরকালে দুঃখ। আবার কোন কোন ধর্ম ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ। প্রথম তিন প্রকার লৌকিক, চতুর্থটি হল লোকোত্তর। চারি আর্যসত্য জ্ঞানের দ্বারা জানলে, বুঝলে, পরিচয় হলে ও স্বাদ ফেলে (উৎকৃষ্ট ধর্মে) মুক্ত হয় ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করে।

তিনি বলেন-কর্ম চার প্রকার। কৃষ্ণ কর্ম, শুক্ল কর্ম, মিশ্রকর্ম ও লোকোত্তর কর্ম। কৃষ্ণ কর্ম মানুষ শুধু পাপ করতে থাকে। শুক্ল কর্মে মানুষ শুধু পূন্য করতে থাকে। মিশ্র কর্মে মানুষ একদিকে পূণ্য করে, আবার অন্যদিকে পাপ করে। লোকোত্তর কর্মে মানুষ জন্ম মৃত্যু নিরোধ করে এবং অবিদ্যা তৃষ্ণা ধ্বংস করে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-ভিক্ষুরা যদি দুঃশীল হয় তবে সংগেসংগে তাদের গৃহীরাও অবশ্যই দুঃশীল হয়, তারা সবাই নরকে পড়বে। এ দুঃশীল ভিক্ষু ও গৃহীরা সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত। এগুলিকে কে ভাল করে দিতে পারবে ? সাধারণত সাংঘাতিক রোগ হলে মানুষ মরে যায়। আবার দেখা যায় আমেরিকার বড় বড় চিকিৎসকরা এসব রোগ ভাল করতে পারে। বনভন্তে ও আমেরিকার বড় চিকিৎসকের মত। এরোগ গুলি হল স্কন্ধ রোগ ক্লেশরোগ। রোগীর অবস্থা ভাল করে জেনে ঔষধ প্রয়োগ করলে অনেক সময় নিরাময় হয়। নিরাময়ের উৎকৃষ্ট কর্ম ও ধর্ম হল জন্ম-মৃত্যু নিরোধ করা ও অবিদ্যা-তৃষ্ণা ধ্বংস করা একমাত্র উপায়।

তিনি বলেন-জাতিবাদ গোত্রবাদ, মানবাদ ও আবাহ-বিবাহ ত্যাগ করলে মানুষ মুক্ত হতে পারে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন-

অমুকের প্রতি অমুকের প্রতি
পৃথিবীর সমচিত্ত ভিক্ষুগন-
তব এই মতি।
হত্যাকারী দেবদত্ত, ধনপাল, অংগুলীমাল
রাহুলের প্রতি।
ইতর বিশেষ নাই সর্বত্র সমান দয়া-
মুনিন্দ্রের এই মতি।।

যাদের জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মানবাদ ও আবাহ বিবাহ থাকবে তাদের অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতু বিদ্যমান থাকবে। আর যাদের ঐ চারি প্রকার বাদ থাকবে না তাদের অবিদ্যা-তৃষ্ণাদি কিছুই থাকবে না। এগুলি না থাকলে সুখ হয়। একমাত্র অর্হত্বের এ সবাদি কিছুই থাকে না।

তিনি বলেন ভিক্ষুর কাজ হল-জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মানবাদ ও আবাহ-বিবাহ ধ্বংস করা বা উচ্ছেদ করা। এসব ব্যতীত অন্য কাজ করা অনর্থক। যেমন ধর একজন কানুন গো, তার কাজ জমি সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশের কাজ করা। উক্ত ব্যক্তি যদি তার কাজ ফেলে অন্য কাজ করে থাকে তা উচিত হবে না। ঠিক তেমন কিছু সংখ্যক ভিক্ষুও তাদের আসল কাজ ফেলে আশ্রম ও নানানবিধ কাজে নিয়োজিত আছে। সেগুলি ভগবান বুদ্ধ কোনদিন করতে বলেননি।

মানব জনম সার- মহা যে সুযোগ তার
ভোগে মোহে ভুল নারে মন।
কর্মের সাধনে জয় - যত্ন কভু বৃথা নয়।
কর তবে মুক্তির অন্বেষণ।।
কর না সুখের আশ - পড় না দুঃখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়।
ভ্রমের অরন্য মাঝে –ভ্রমিওনা বৃথা কাজে
যথা মোহ হিংস্র জন্তু ভয়।।
ধনজন সুখ যত কালের করালগত।
সবি দুঃখ সনাতন অস্থির।
সকল ফুরায়ে যায় এ মনাব দেখে না তায়
প্রাণ যেন পদ্ম পত্র নীর।।
স্বীয় কর্মে হও রত-সাধিতে আপন ব্রত
কর তবে সত্যের সন্ধান।
সার্থক জীবন হবে দুঃখ মুক্তি হবে যবে
সাধনার এই কর্ম স্থান।।

মহাজ্ঞানী আর্যগণ যে পথে করেছে গমন
লভিয়াছে সম্যক দর্শন।
সেই পথ লক্ষ্য করে আচরিবে ধৈর্য ধরে
সার্থক কর এই জীবন।।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপসংহারে বলেন- সকলের মনচিত্ত অবিদ্যা-তৃষ্ণার দ্বারা ভরে গেছে। মনচিত্ত ক্লেশ, স্কন্ধ রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। মনচিত্তের চিকিৎসা করতে হবে। চিকিৎসক হলেন ভগবান বুদ্ধ ও দক্ষ ভিক্ষুরা। ঔষধ হল ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম। রোগী হল ভিক্ষু সংঘ ও উপাসক উপাসিকারা।

ভারবুয়াচাপ বন বিহার কঠিন চীবর দানে বনভন্তের দেশনা

রাংগামাটি শহরের উত্তর পাশে অর্থাৎ কিছুদূর জলপথ অতিক্রম করার পর বন্ধুকভাংগা ইউনিয়ন অবস্থিত। উক্ত ইউনিয়নের অন্তর্গত ভারবুয়াচাপ বন বিহার স্থাপিত হয়। এ পাহাড়গুলি পানির সহিত সংলগ্ন এবং উপরিভাগ প্রায় সমান। পরিবেশ সুন্দর ও নির্জন বনভূমি, ভারবুয়াচাপ বন বিহার ১৯৯১ ইংরেজীতে প্রতিষ্ঠা হয়।

আজ ১৪ই অক্টোবর / ১৯৯৬ ইংরেজী সোমবার বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু রমেশ চন্দ্র চাক্মা। পঞ্চশীল প্রদান ও উৎসর্গ পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ভদ্দজী স্থবির। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রথমে পূর্বে রেকর্ডকৃত পঞ্চশীলের মাহাত্মা উপাসক-উপাসিকাদেরকে শ্রবন করান। পরে ৪টা ৫ মিনিট হতে ৪টা ১৫ মিনিট তিনি ধর্মদেশনা করেন। তিনি বলেন- সত্যপথ মাত্র একটা মিথ্যাপথ অনেক প্রকার আছে। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সত্যপথ বলা চলে। আর অন্য গুলি মিথ্যাপথ। যার চিত্ত সত্যপথে ধাবিত হয় তাকে কেউ ক্ষতি করতে পারে না। এমন কি নির্দয় রাজা, প্রবল শত্রু ও হিংস্র জন্তুরাও ক্ষতি করতে পারে ন। আর যার চিত্ত

মিথ্যা পথে ধাবিত হয় তাকে যে কেউ ক্ষতি করতে পারে। সত্যপথে চললে মংগল ও ভাগ্যবান বলে মনে করবে। মিথ্যা পথে চললে ইহকাল ও দুঃখ এবং পরকালেও দুঃখ ভোগ করতে হবে। সত্য পথে চললে সত্য ধর্ম হয় এবং সত্যজ্ঞান উৎপত্তি হয়। সত্যজ্ঞান হল দুঃখে জ্ঞান, দুঃখের কারণে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান এবং দুঃখ সত্যজ্ঞান উৎপত্তি হয়। সত্যজ্ঞান হল দুঃখে জ্ঞান, দুঃখের কারণ জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান এবং দুঃখ নিরোধ প্রতিপদার বা আর্য অষ্টাংগিক মার্গে জ্ঞান লাভ। মিথ্যা পথে চললে শুধু শুধু দুঃখ ভোগ করতে হবে এবং অজ্ঞানের মধ্যে হাবুডুবু খেতে হবে। যেমন ঘোর অন্ধকার রাতে পথ খুঁজে পায় না। তোমরা অজ্ঞানের সাথে থেকো না। জ্ঞানের বা সত্যের আশ্রয়ে থাক, অনেকে দেশ ত্যাগ করে বিদেশে বসবাস করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদেশেও কোন সুখ নেই, শান্তি নেই, বিদেশ সুখ, শান্তির স্থান নহে।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন লৌহাকে ধ্বংস করে একমাত্র আপন মরিচায়। ঠিক তেমনি নিজের পাপে নিজকে ধ্বংস করে। লৌহাকে সব সময় পরিস্কার ও ধার রাখলে ভাল থাকে। ঠিক তেমনি মানুষ নিজকে সব সময় পাপমুক্ত রাখতে পারলে বিপদ মুক্ত থাকে, পাপে বিপদে পড়ে। শীল পালনে চিত্ত পরিস্কার থাকে। তোমাদের বাড়ীতে দা, কুড়াল ও ছুরি যেভাবে পরিস্কার ও ধার রাখ ঠিক তেমনি তোমাদের চিত্তকে ও পাপ থেকে মুক্ত রাখ। না হয় যে কোন সময় বিপদে পড়তে হবে। নারী পুরুষ উভয়ে উত্তম রূপে শীল পালন কর। শীল পালন করলে মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারবে। নানাবিধ দুঃখ হতে পরিত্রান পাবে। শীল পালন না করলে শুধু নরকে নয় পশুপক্ষী কুলে পর্যন্ত পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

নারী পুরুষে সংসার করলে কেউ কেউ একজন অপরকে কষ্ট দেয়। তা উচিত নয়। তাহলে তোমরা সত্য পথে এবং শীল পালন করে মরণের পর স্বর্গ লাভ কর। এবলে আমার দেশনা এখানে শেষ করলাম।

অনুষ্ঠানের পর ভারবুয়াচাপ বিহারের অধ্যক্ষ (পরলোকগত) শ্রীমৎ কোণ্ডন্য ভিক্ষুর সৎগতির জন্যে এক মিনিট দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা হয়। সর্বশেষে উক্ত বিহারের সভাপতি বাবু রমেশ চন্দ্র চাক্মা বিদায় ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের ইতি টানলেন।

নির্বানে দুঃখ, ক্ষুধা ও দুর্বলতা নেই

আজ ১৫ই অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী মঙ্গলবার। ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ভারবুয়াচাপ বনবিহারে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্ম দেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি দেশনার প্রারম্ভেই বলেন-কোথা হতে দুঃখ উৎপত্তি হয় ? সংক্ষেপে অবিদ্যা-তৃষ্ণা হতে যাবতীয় দুঃখ উৎপত্তি হয়। অবিদ্যা-তৃষ্ণার কারণে সংসারে যত গন্ডগোল হচ্ছে। ভালভাবে দেখলে দেখতে পাবে, যারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসার করছে তাদের মধ্যে অনেকেই খুব দুঃখে আছে। বিভিন্ন গণ্ডগোলের কারণে তাদের ছাড়াছাড়ি (বিচ্ছেদ) পর্যন্ত হচ্ছে।

যুবতীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন-যারা অন্য জাতি অথবা ভিক্ষু শ্রমণদের সাথে পালিয়ে যায় তারা সাংঘাতিক পাপ ও দুঃখের কারণ সঞ্চয় করে থাকে। যুবতীরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট প্রশ্ন করল- "ভন্তে' দুঃখ মুক্তি কিভাবে হবে? তিনি বলেন- নির্বাণ সুখেই সুখ হয় মুক্ত হয়। বিয়ে করলে ছেলে মেয়ে হবে, তারা যদি মারা যায় তাদের জন্যে বহু শোক করতে হবে। স্বামী ও মারা যেতে পারে। কিন্তু নির্বানে কোন দুঃখ, ক্ষুধা, দুর্বলতা এবং কোন প্রকার শোক তাপও নেই। সংসার করলে একজন অন্যজনকে ফেলে (পরলোকে) চলে যাওয়ার আশংকা থাকে। কিন্তু নির্বাণ কাউকে ফেলে যায় না। জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মানবাদ ও আবাহ বিবাহ ধ্বংস বা উচ্ছেদ কর। মনচিত্তে মানুষ থাকলে জানবে দুঃখ বিদ্যমান আছে তা না থাকলে সুখ হয়। দেহ শুধু ব্যবহারিকসত্য মাত্র, প্রকৃতপক্ষে দেহ দুঃখপুঞ্জ ছাড়া কিছুই নয়। হীন তৃষ্ণা, হীন মানুষ, হীন সংস্কার অথবা স্ত্রী পুরুষ থাকলে নির্বাণ যেতে পারবে না। নির্বাণ সর্বপ্রকার তৃষ্ণা, সংস্কার, মানুষ, স্ত্রী পুরুষ এর অতীত।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তার শিষ্যদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন-তোমরা সব সময় ভোগে বীতশ্রদ্ধার কথা মনে রেখো। এবং উপাসক-উপাসিকাদের থেকে খাদ্য, চীবরাদি ও লাভ সৎকার লাভের কথা যেন চিত্তে স্থান না পায় তার জন্য সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখবে। যদি তোমাদের পূণ্য পারমী থাকে তারা আপনা আপনি সব কিছু দেবে। ভোগ বিলাসাদি এসব চিত্ত যদি উৎপন্ন হয় মার বিভিন্নভাবে (নারী অথবা অন্যরূপ ধরে) তোমাদের ক্ষতি করতে পারে।

কাঁটাছড়ি বনবিহারে বনভন্তের দেশনা

রাঙ্গামাটি শহরের উত্তর পাশে কাঁটাছড়ি বনবিহার অবস্থিত। রাজ বনবিহার হতে জলপথে যেতে হয়। ইঞ্জিন বোটে সময় লাগে মাত্র ২০ মিনিট। বিহারটি উত্তর দিকে লম্বা। প্রত্যেক এক এক ধাপে ধাপে সাধনা-কুঠির, চংক্রমন ঘর, ভোজন শালা, দেশনা ঘর ও বিহার নির্মাণ করা হয়েছে। নিরিবিলি স্থান ও সুন্দর দৃশ্যাবলী চোখে পড়ে এখান থেকে।

আজ ১৬ই অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী বুধবার। দুপুর ৩.০০ টায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু সমর বিজয় চাক্‌মা। কঠিন চীবর ও কল্পতরু উৎসর্গ পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ভদ্দজী থের। পূর্বে রেকর্ডকৃত পঞ্চশীলের মাহাত্ম্য শ্রোতাদেরকে শুনান হয়। উদ্বোধনী সংগীত গেয়েছে পান্না চাক্‌মা ও তার সংগীরা। শ্রদ্ধাঞ্জলী পাঠ করেছে সাধনা চাক্‌মা। বিশেষ প্রার্থনা পাঠ করেছে রুবী দেওয়ান।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ভাষণে বলেন-বিদ্যা কি ? অবিদ্যা কি? যার বিদ্যা নেই সে অবিদ্যা। লন্ডন পাশ ডিগ্রী পেলে বিদ্যা বলে না। সে বিদ্যায় মার খেতে পারে, অপদস্ত হতে পারে, দুঃখ পায় ও নানাবিধ অন্তরায় থাকে। বুদ্ধ জ্ঞানে যে জ্ঞান উৎপত্তি হয় সে জ্ঞানের নাম বিদ্যা। যে দুঃখগুলি ভালরূপে জ্ঞাত হতে পারে তার দুঃখে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে দুঃখের কারন ভালরূপে জ্ঞাত হতে পারে তার দুঃখ সমুদয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে দুঃখ নিরোধকে ভালরূপে প্রত্যক্ষ করে জ্ঞাত হতে পারে তার দুঃখ নিরোধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে দুঃখ নিরোধ-প্রতিপদা বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভালরূপে পঠন করে জ্ঞান উৎপন্ন করে তার দুঃখ নিরোধ প্রতিপদায় জ্ঞান হয়। এ চারি আর্য-সত্যে যার জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে বলে বিদ্যা অর্থাৎ বুদ্ধ জ্ঞান। এ বুদ্ধজ্ঞান আবার ১৪ প্রকার। অবিদ্যায় ভালমন্দ বুঝতে পারে না। বিদ্যায় ভালমন্দ বুঝতে পারে। যেমন ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলে ভালভাবে জানে ও বুঝে। সে বিদ্যায় ধন দেয়। সে ধন হল নির্বাণ ধন। ভগবান বুদ্ধ একজন শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। তাঁর প্রচারিত ধর্ম হল ঔষধ। সংঘ ও উপাসক-উপাসিকারা হল রোগী। বর্তমানে যারা দক্ষ ভিক্ষু আছেন তারা চিকিৎসক হিসেবে উপাসক-উপাসিকাদের চিকিৎসা করেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন- বর্তমানে জ্ঞানের অভাবে সবকিছু দুঃখ আনয়ন করছে। আমার কথায় যদি কেউ কর্ণপাত না করে বা নির্দেশ মেনে না চলে ভবিষ্যতে তার ভয়ানক দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তোমরা অপেক্ষা করে চেয়ে থাক কি অবস্থা হয়। যদি আমার কথা বিশ্বাস কর ও মেনে চল তোমরা নিশ্চয়ই সুখে ও শান্তিতে থাকতে পারবে। তোমরা কাউকে হিংসা করনা, সবাইকে দয়া কর। তোমরা সকলে মিলেমিশে চল ও দয়া কর এবং শীল পালন করলে তোমাদের গরীব অবস্থা আর থাকবে না।

নারীদের প্রতি তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেন- তোমরা ভালভাবে শীল পালন কর। যা বিপদ আসুক না কেন মরণের পর স্বর্গে যেতে পারবে। যে নারী সকাল বেলায় ঈর্ষান্বিত থাকে তার মহা অমঙ্গল। যে নারী দুপুর বেলায় মাৎসর্য পরায়ন হয় তার মহা অমঙ্গল। যে নারী রাত্রি বেলায় কামভাব উৎপন্ন করে সে নারীর মহা অমঙ্গল হয়। তাঁরা মরনের পর নরকে পড়বে। এমন কি পশুপক্ষী কুলেও যেতে পারে। পুরুষদের প্রতি সতর্কতা দিয়ে তিনি বলেন- তোমরা কাহারো ক্ষতি কর না। উপকার করতে চেষ্টা কর। ভবিষ্যতে সাবধান না হলে ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে। তোমাদেরকে পূর্ব হতে সতর্ক বাণী দিচ্ছি। সবাই অজ্ঞানী হলে বিপদ আপনা আপনি চলে আসে। ভুলপথে চললে মরবে। তোমাদের সর্বদিকে উন্নতি হোক ও মঙ্গল হোক এটাই আমার একমাত্র আশীর্বাদ। বুদ্ধের নীতি যে পালন করে তার কোন অসুবিধা হয় না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা চারি আর্যসত্য মেনে চল ও বিশ্বাস কর। মেনে চললেও বিশ্বাস করলে তোমাদেরকে সবাই ভালবাসবে। এমনকি স্বর্গের দেবতারাও সাহায্য করবে। ধর্মচারীকে ধর্মে রক্ষা করে।

পরিশেষে তিনি উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি জোর দিয়ে বলেন- দেখা যায় কেউ কেউ আমার নিকট আসে, কি জন্যে জান ? মারাত্মক অসুখ হলে কেউ আসে। কেউ বুড়া হলে আসে। কেউ মহা বিপদে পড়লে আসে। একটু আশীর্বাদ প্রার্থনা করার জন্যে আসে। অন্য সময় বা ভাল অবস্থায় আসে না। তোমরা বিপদে না পড়ার জন্যে বুদ্ধের, ধর্মের ও সংঘের শরণ গ্রহণ কর। পঞ্চশীল উত্তমরূপে পালন কর। না হয় আমার কথার উল্টা দিকে চললে তোমাদের যে সম্পদ গুলি আছে সেগুলিও হারাতে হবে। সব সময় বিপদমুক্ত হওয়ার একমাত্র রক্ষা কবচ হল ত্রিশরন ও পঞ্চশীল পালন করা।

কুশলে সুখ ও নির্বাণ সম্পত্তি উৎপত্তি হয়

আজ ১৭ই অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী বৃহস্পতিবার। ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন- লোকোত্তর না হওয়া পর্যন্ত দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত থাকতে হবে। এমন কি লোকোত্তরে উন্নীত না হলে ভিক্ষু ও দুঃখজনক। সম্যক সমুদ্ধ জগতে আবির্ভাব হলে মনুষ্যগণের মনুষ্য সম্পত্তি, দেবগনের দেব সম্পত্তি এবং নির্বাণ সম্পত্তি উৎপত্তি হয়। চক্রবর্তী রাজার আবির্ভাব হলে শুধু মনুষ্য সম্পত্তি উৎপত্তি হয়। নির্বাণ সম্পত্তি হয় না। তৃষ্ণাদির মূল বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারলে কুশল ও সুখ হয়। সর্বজ্ঞাতা কি ? যাবতীয় সকল বিষয় পৃথক পৃথকভাবে সম্যকরূপে জানাই সর্বজ্ঞতা। চারি আর্য সত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদই নীতি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানের মধ্যে নিহিত সর্বজ্ঞতা। কুশল কি ? চারি আর্য সত্য অগ্রত্বে ও শ্রেষ্ঠত্বে করায় বলে কুশল। শেল ব্রাহ্মন ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- সর্বজ্ঞতা কি ? বুদ্ধ বললেন- যা কিছু ভাবিবার ধর্ম আছে তা ভাবিয়াছি, যা কিছু জানার ধর্ম আছে তা জেনেছি এবং যা কিছু ত্যাগ করার ধর্ম আছে তা ত্যাগ করেছি, আমিই (সর্বজ্ঞ) বুদ্ধ।

তিনি বলেন- ভিক্ষুদের জন্যে খাওয়া দাওয়া ও সুযোগ সুবিধা না হলে তারা সহজে অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। ভিক্ষুদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি না হলে ধর্মের উন্নতি হয় না। ভগবান বুদ্ধ ভবিষ্যত বাণী করেছেন- ভবিষ্যতে ভিক্ষুদের মধ্যে ক্রোধী, অতিক্রোধী, চিরক্রোধী, অভিমানী অতি অভিমানী ও পরগুন ধ্বংসী হবে। ৫২ প্রকার চিত্ত চৈতসিকের দ্বারা দলে দলে ভাগ হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- অনেকে বলে থাকে, বনভন্তের একটি দল (সৃষ্টি হবে)। উত্তরে তিনি বলেন- এটা দল নয় এখানে বুদ্ধ জীবিত কালিন সময় ভিক্ষুসংঘ যেরূপ ছিল সেরূপ আচরণ করতে চেষ্টা করা হয় মাত্র। এক গুরুর শিষ্যের মধ্যে দুইদলে বিভক্ত হয়। নির্বাণ না যাওয়া পর্যন্ত কোন ভিক্ষু শ্রামনকেও অনেক সময় বিশ্বাস নেই। আমি শুধু বুদ্ধকে বিশ্বাস করি। এম,এ পাশ করলেও বুদ্ধের দৃষ্টিতে তাতে কোন মূল্যও নেই, কোন সারও নেই। নির্বাণই প্রকৃত সার যেখানে একমাত্র সার থাকে মূল্যও থাকে।

আবার সার ৬ প্রকার। যেমন- শীল সার, সমাধি সার, প্রজ্ঞা সার, বিমুক্তি সার, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সার ও পরমার্থ নির্বাণ সার।

তিনি বলেন- ঢাকা হতে আগত জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন- আপনার নিকট অলৌকিক শক্তি ও পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান আছে কি? আমি বললাম- আছে সেটা বলা যাবে না। নেই সেটাও বলা যাবে না। কারণ, যদি আছে বলি, অনেকে দেখানোর জন্য প্রার্থনা করবে, আবার নাই বললে বিশেষ দরকার বশতঃ যদি পরে দেখাতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া তাতে ঝামেলার সম্ভাবনা বেশী। যেমন- গরু চুরি হলে তালাশ করে দেয়ার জন্যে বলবে, সত্য ধর্ম নিয়ে থাকলে সত্যে রক্ষা করে। অনেকে ধর্ম প্রচার করতে বিরোধিতা করে তা মহা অপরাধ (পাপ)। তাদেরকে দেবতারাও মেরে ফেলতে পারে, যেহেতু তারা জীবিত থাকলে সধর্ম প্রসার, প্রচারে ব্যাঘাত ঘটে। বর্তমানে অনেকে মরতেছে। তারা মারা গেলে ধর্ম প্রচার করতে সহজ ও সোজা হয়। বুদ্ধের সময়ে রাজার ছেলে ও ধনীর ছেলেরা প্রব্রজ্যা নিয়ে ধর্ম প্রচার করেছেন। বর্তমানে প্রায় ভিক্ষু গরীবের ছেলে। তারা কতটুকু উন্নতি করতে পারবে? কেউ কেউ সংসার ছেড়ে প্রব্রজ্যা নেয়। কিছুদিন পর রংবস্ত্র ফেলে আবার গৃহী হয়। তারা যথাযথ ত্যাগ করতে পারে না। থুথু মুখ থেকে ফেলে আবার মুখে নেয়ার মত তাদের কার্য্যকলাপের অবস্থা। যাত্রীবাহী গাড়ীতে ভিক্ষুরা যাতায়াত করতে পারে না, তা হীন দেখায়। অনেক বড়ুয়া, চাক্‌মা, ভিক্ষুরা গরীবের ছেলে বলে এসব হীনকাজে লজ্জাবোধ করে না। বিনা আহ্বানে পরগৃহে গমন, বিনা জিজ্ঞাসায় বহুভাষণ ও আপন প্রশংসার কথা যেখানে সেখানে বর্ণন এগুলো হীন ব্যক্তির লক্ষণ।

প্রচারক বাহিনী সক্রিয় হলে ধর্ম নিষ্ক্রিয় হতে পারে না

আজ ১৮ই অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী শুক্রবার। ভোর বেলায় তাঁর সাধনা কুঠিরে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। দেশনার আরম্ভেই বলেন- রংবস্ত্র নিয়ে লেখা পড়া করলে পাপ হয়। কেউ কেউ চাকুরী করে। কেউ তাঁতকল স্থাপন

করে। কেউ অনাথ আশ্রম গড়ে তোলে। সেগুলি হীনতা দেখায়। প্রচারক বাহিনী সক্রিয় হলে ধর্ম নিষ্ক্রিয় হতে পারে না। নারীরা একদিকে ধর্মকে উজ্জ্বল করতে চায়। অন্যদিকে বিরোধিতাও করে থাকে। যেমন ভগবান বুদ্ধকে জনৈক নারী মাগন্দিয় স্বামী রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। বুদ্ধ তাকে ভর্ৎসনা করে বিতাড়িত করেছিলেন। বুদ্ধ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে শেষ পর্যন্ত উদয়ন রাজাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিল। উদয়ন রাজার প্রধান রানী শ্যামাবতী বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। বুদ্ধের ভর্ৎসনায় মাগন্দিয় নিজেকে অপমানিত মনে করে বুদ্ধের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে শ্যামাবতীকেও হিংসায় পুড়ে মেরে ফেলার চেষ্টা চালায়। কিন্তু মৈত্রী ভাবনায় গুনে শ্যামাবতীর জয় হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- কতগুলো নারী আছে, তারা বিড়ালের মত। তারা কি করে জান? তারা ধনের লোভ করে, আহার লোভ করে, বস্ত্রের লোভ করে, অলংকারের লোভ করে, পর পুরুষের লোভ করে এবং সৌন্দর্যের লোভ করে। নারীদের মনে কি আছে? তা বুদ্ধজ্ঞানে তাদের চিত্তের অনুকূলে ধর্মদেশনা করতে পারলে ফল হয় এবং লোভ তৃষ্ণাগুলি তিরোহিত হতে পারে।

তিনি বলেন- যেমন পরিস্কার ফুলে পোকা হলে ফুল নষ্ট করে ঠিক তেমনি ভিক্ষুরাও দুঃশীল হয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা নিষ্ক্রিয় করে। সম্রাট অশোকের আমলে ৬০ হাজার দুঃশীল ভিক্ষুকে শাস্তি দিয়েছিলেন। শুনেছি বার্মাতে নাকি ৬ হাজার ভিক্ষুকে জেল দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশেও সেরকম দুঃশীল ভিক্ষুকে শাস্তি দিলে ধর্মের অনেক উন্নতি হতো। প্রবাদ বাক্যে বলেন-

কাজ শত্রু করলে ফুরায়।
মানুষ শত্রু মারলে ফুরায়।

কেউ কেউ রাজ ভয়ে প্রব্রজ্যা নেয়। কেউ কর্জের ভয়ে প্রব্রজ্যা নেয়। মূর্খদের বিভিন্ন ভয় উৎপন্ন হয়। ভয় থাকলে নির্বাণ যেতে পারে না। যারা কাপুরুষ ও নিরোৎসাহী ব্যক্তি তারা নির্বাণ যেতে পারে না। বুদ্ধের সময়ে জনৈক রাজা ৬ হাজার দুঃশীল ভিক্ষুকে আহার দিতেন। একজন অর্হৎ ভিক্ষু এসে কৌশলে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেছেন। সে রকম বাংলাদেশেও পরিশুদ্ধ

করতে পারলে দেশের ও বৌদ্ধদের মংগল হতো। বুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষমতা ও জ্ঞানের আইন সবাই জানে কিন্তু জ্ঞান দান করা বড় কথা, জ্ঞান দান, ধর্ম দান ও অভয়দান দিতে পারলে পূণ্য হয় ও সুখ হয়। বুদ্ধজ্ঞানে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করতে পারলে নীচে পড়বে না। জ্ঞানে ও কুশলের দ্বারা উচ্চতা লাভ করা যায়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বর্তমানে জড় বিজ্ঞানে বা চার মহাভূতের সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে সব কিছু জানা যায়। মনোবিজ্ঞানে বা বুদ্ধজ্ঞানে অপরের মনের মধ্যে কি আছে কি নেই তা জানা যায়। দুই মাইল মাটির নীচে স্বর্ণ থাকলে যেমন দেখা যায় না- তেমন অবিদ্যার অন্তরালে ও বুদ্ধজ্ঞান লুকায়িত থাকে। বিজ্ঞানের জ্ঞান হল লৌকিক। বুদ্ধ জ্ঞান হল লোকোত্তর।

মহাপন্থক ও চুল পন্থক নামে দুই ভাই ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন। বড় ভাই মহাপন্থক অর্হত্ত্বফল লাভ করেছেন কিন্তু ছোট ভাই চুলপন্থক কিছু করতে পারেননি। তাতে বড় ভাই ছোট ভাইকে বিহার থেকে বের করে দিয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধ চুল পন্থককে অনুকম্পা করে একখানা সাদা কাপড় ঘষতে দিয়েছিলেন। তাতেই তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। চুলপন্থক বিহারে একাকি বসে আছেন তখন ভগবান বুদ্ধ একজনকে বললেন- চুল পন্থককে ডেকে নিয়ে এস। বার্তাবাহক দেখতে পেলেন উক্ত বিহারে এক হাজার জন ভিক্ষু। তারা সকলে এক বাক্যে চুলপন্থক বলে সাড়া দেয়ায় চুল পন্থককে পেলেন না। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ আবার বললেন- যে কোন একজনকে আমি ডেকেছি বল। একজনকে সম্বোধন করায় শুধু একজন চুলপন্থক সাড়া দিলেন। এখানে কথা হচ্ছে যে চুল পন্থকের জ্ঞান পূর্বে কোথায় লুকিয়েছিল? অবিদ্যার অন্তরালে লুকিয়েছিল। ভগবান বুদ্ধ সে জ্ঞান অবিদ্যার তলদেশ থেকে বের করে দিয়েছেন।

উপসংহারে তিনি বলেন- তোমরা শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক হলে চারি লোক পাল দেবতারা দেবরাজা ইন্দ্র ও ধনী দেবতারা সাহায্য করবে। তোমরা উত্তম হও, উত্তম ধর্ম আচরণ কর, শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারবে। তোমরা যদি প্রচারক বাহিনী হতে পার, ধর্ম কোনদিন নিষ্ক্রিয় হতে পারে না।

কুতুকছড়ি বনবিহারে কঠিন চীবন দানে বনভন্তের দেশনা

মহালছড়ি সড়কের অর্ধমাইল পশ্চিমে কুতুকছড়ি বনবিহার অবস্থিত। এ বিহার স্থাপন করা হয় ১৯৯৫ ইংরেজীতে। এলাকাটি চারটা পাহাড় সমন্বিত ৩০ একর বনভূমিতে স্থাপিত হয়েছে। সর্বোচ্চ পাহাড়টিতে বুদ্ধ মন্দির, দেশনাঘর, শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সাধনা কুঠির ও চংক্রমন ঘর প্রতিষ্ঠা হয়। মন্দিরের উত্তর পূর্ব পাহাড়ে বেইনঘর নির্মিত হয়। মন্দিরের দক্ষিণ পাহাড়ে ভোজনশালা ও ভিক্ষুদের আবাসগৃহ নির্মিত হয়। সর্বশেষ দক্ষিণ পাহাড়ে শ্রামনদের থাকার কুঠির। কুতুকছড়ি বনবিহারটি দেখতে বেশ সুন্দর, দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাবলী ও গভীর জংগলে গঠিত। তবে জল সরবরাহ খুব কষ্টকর। অনেকদূর থেকে জল সংগ্রহ করতে হয়। যারা বন বিহারের জন্যে পাহাড় দান করেছেন তারা হচ্ছেন পূর্ণ চন্দ্র হেডম্যান, বিচ্ছুগুলা কার্বারী, নিশি কুমার কার্বারী ও লক্ষ্মীচরণ কার্বারী।

আজ ১৯শে অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী শনিবার। দুপুর বেলায় কুতুকছড়ি বনবিহারে কঠিন চীবর দান আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী সংগীত গেয়েছে হীরা ও তার সংগীরা। পঞ্চশীল প্রদান ও উৎসর্গ কার্য পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বশিষ্ট ভিক্ষু। পূর্বে রেকর্ডকৃত পঞ্চশীলের মাহাত্ম্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপাসিকাদেরকে শুনান।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ২টা ২০ মিনিট হতে ২টা ৪০ মিনিট ধর্মদেশনা করেন। তিনি বলেন-ধর্ম জ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ কাকে বলে ? যে জ্ঞানের দ্বারা চারি আর্যসত্যের উদয় হয় তা দ্বারা পাপ কার্য সম্পাদন করে না তাকে বলে ধর্ম জ্ঞান। চারি আর্যসত্যের উপস্থিতিতে জ্ঞানের দ্বারা তার চিত্তে কি সুখ হয়েছে তা দেখতে পায় সে ধর্ম চক্ষু লাভ করছে বা তাই ধর্মচক্ষু। চারি আর্য সত্যের জ্ঞান চক্ষু দ্বারা যে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন তিনিই ধর্মবোধ লাভ করেন। ধর্মবোধে জানতে পারে যে মার ভূবনে দুঃখ, মানুষ দুঃখ এবং সে সব যে হীন তাও ভালরূপে জানে। নারী পুরুষে সংসার করলে নানাবিধ অসহ্য দুঃখ পায়। সংসারে যা সুখ বলে মনে হয় তা প্রকৃত সুখ হয়। মনে মনে অহংকার না করলে নির্বাণ সুখ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কেউ কেউ মনে

করে সারা জীবন তার ধন, টাকা পয়সা ও যৌবনের শক্তি থাকবে। জ্ঞান না থাকলে দুঃখে পড়তে হয়। যারা জ্ঞানী তারা মানুষটিকে দুঃখ বলে জানেন এবং তাতে অনাসক্ত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানযোগে দেখলে দেখা যায় নারী পুরুষ বলে কিছু নেই। সবাই চারি ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত।

তিনি বলেন- ভিক্ষুরা চারি প্রত্যয় ভালভাবে পেলে নির্বাণ যেতে পারে। মহা উপাসিকা বিশাখা ভিক্ষুদের জন্যে চারি প্রত্যয় প্রদান করতেন এবং নয়কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে ভগবান বুদ্ধকে পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করে দিয়েছেন। তোমারাও শীল পালন করে স্বর্গে চলে যাও। এ কুতুকছড়িতে জন্ম গ্রহণ কর না। আমার সবকিছু হয়েছে। শুধু তোমাদের জন্যে বলছি। সংসারে কোন সুখ নেই। পূণ্য কর, পাপ করলে বিভিন্ন পশুপক্ষী কুলে জন্মধারণ হতে পারে। প্রাণী হত্যা করলে অল্প বয়সে মৃত্যু হয় এবং স্ত্রী পুত্র মরে। এমন কি বর্তমানে নিজেও হঠাৎ মরে যেতে পার। চুরি করলে জন্মে জন্মে গরীব হয়ে আসবে। নারী পুরুষে ব্যভিচার করলে নরকে পড়বে। মিথ্যা কথা না বললে পরকালে সুন্দর কন্ঠস্বর ও সুন্দর চেহারা হবে। মদ পান করলে পরজন্মে পাগল হয়ে আসবে। প্রত্যেক প্রাণীকে দয়া করলে সুখ হয়। অনেক ক্ষেত্রে ধনী হলেও সুখ নেই।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- আজ তোমরা কঠিন চীবর দান করেছ। এদানের প্রভাবে তোমাদের সুখ হোক, উন্নতি হোক এ সংকল্প কর। তোমরা আজে বাজে বা শিব পূজা না করে সন্ধ্যার সময় আকাশ প্রদীপ পূজা করতে পার। এতে তুষিত স্বর্গে বুদ্ধের যে চুল ধাতু আছে সেগুলির পুজা হয়। এ পূজায় পূণ্য হয়। নারীদের মধ্যে কেউ কেউ সকাল বেলায় ঈর্ষাপরায়ন থাকে, দুপুরে মাৎসর্য পরায়ন ও রাত্রে কামরাগী পরায়ন থাকে। তারা মৃত্যুর পর নরকে পড়ে। মনুষ্যকুলে আসলে চন্ডাল ও মেথর বংশে জন্ম গ্রহণ করে।

আত্মা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অহংকার না থাকলে নির্বাণ হয়

আজ ২০শে অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী রবিবার। খাগড়াছড়ি আর্য বন বিহারের সাধনা কুঠির। ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্ম

দেশনা দিচ্ছিলেন। প্রথমেই তিনি বলেন যে আত্মা বিশ্বাস না করে, মিথ্যা দৃষ্টি না করে এবং অহংকার না করে সে নিশ্চয়ই অর্হৎ হতে পারবে। আত্মা মুক্তির অন্তরায়। মিথ্যাদৃষ্টি মুক্তির অন্তরায় এবং অহংকার মুক্তির অন্তরায়। যার কাছে অজ্ঞানতা থাকে সে আত্মা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অহংকার তা কি বুঝে না।

ভিক্ষু সংঘকে খাওয়া দাওয়া, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা করে দিতে না পারলে অর্থাৎ চারি প্রত্যয় ভালভাবে দিতে না পারলে ধর্ম প্রচার করতে পারা যায় না। প্রত্যেকে আহার করে। চার প্রকার আহারের মধ্যে স্থুল আহার, মনুষ্যদের আহার। এ আহারকে যে নিরোধ করতে পারবে সে নির্বাণ দর্শন করতে পারবে। বুদ্ধের আমলে উপাসক-উপাসিকারা ভিক্ষু সংঘকে উত্তম খাদ্য ও সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেয়ায় নির্বাণ যেতে সহজ হয়েছিল।

তিনি বলেন- নারী-পুরুষে সংসার করলে পাপ হয়, নানা প্রকার দুঃখ পায় এবং ইজ্জত যায়। নারীর সাথে ব্যভিচার করলে শরীর থেকে মস্তক ছিন্ন হলে অথবা বিদ্যুতের তার লাগলে আর জীবন ফিরে পায় না তার অবস্থাও সেরকম। কেউ সে মস্তক জোরা লাগাতে পারবে না। এ ব্যাপারে যারা সুখ বলে মনে করে তারা মরনের পর নরকে পড়বে অথবা চারি অপায়ে পতিত হবে।

তিনি আরো বলেন, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ অথবা বনভন্তেকে না মানলে এবং বিশ্বাস না করল ভবিষ্যতে বিপদ আছে। তোমরা মৃত্যুকে জয়কর। মানুষ সবাই সমান নয়। জ্ঞান ভেদে তারতম্য আছে। যার চিত্তে জ্ঞান থাকে সে বুঝে। নির্বাণের চিত্ত ও নির্বাণের মন হলে সুখ হয়। জ্ঞানে চিত্তের মধ্যে সংসারের যাবতীয় বিষয় চিন্তা উঠে না। অজ্ঞানে উঠে ও চিত্তে কষ্ট পায়। এখানে প্রায় লোকই গরীব। তোমরা শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক হলে ধনী দেবতারা সাহায্য করবে। শুধু বুদ্ধের উপদেশ ও দেশনা শুনলে সুখ শান্তি পাবে। অবিদ্যা তৃষ্ণা ক্ষয় করে নির্বাণ লাভ কর। যারা দুঃশীল ভিক্ষু আছে তারা গৃহী হতে বেশী দুঃখ ভোগ করছে এবং পরকালেও দুঃখ পাবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- ট্রেক্টর যেমন গাছপালা সহ পাহাড় সমান করে সেরূপ ৫০ জন উপযুক্ত ভিক্ষু পেলে আমিও উপাসক-উপাসিকাদের অবিদ্যা, তৃষ্ণাকে ধ্বংস করে দিতে পারব। সুতরাং ধর্ম প্রচার করতে সুবিধা হবে।

কিন্তু নানাবিধ আন্দোলন, দল, মিছিল করলে পাপ হয়, দুঃখ পায় এবং অরাজকতার সৃষ্টি হয়। বনভন্তেরটি দল নয়। দুঃখ মুক্তি ও নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্যে। ভিক্ষুদের বিভিন্ন কার্য কলাপে হেয়তা ও নীচতা দেখায়। সুতরাং যারা জ্ঞানী তারা সংসারের যাবতীয় স্বল্প সুখ ত্যাগ করে বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখে নির্বাণ লাভ করে থাকেন।

স্বল্প সুখ হল একশ ভাগের এক ভাগ। আর বিপুল সুখ হল একশ ভাগের নিরানব্বই ভাগ। যারা জ্ঞানী তারা একভাগ গ্রহণ করেন নিরানব্বই ভাগ ত্যাগ করেন। নিষ্পাপ ব্রহ্মচর্যঃ পালন করলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচর্য শিথিল হলে কৃতকার্য হতে পারবে না। নারী কেলেংকারীতে জড়িত হলে অন্যজাতিরাও তোমাদেরকে নিন্দা করবে ও হেয় প্রতিপন্ন করবে।

তিনি বলেন- বিনা আহ্বানে নানাদেশ ও নানা জনপদ ভ্রমণ করলে মুক্তি পায় না। খাওয়া দাওয়া সুযোগ সুবিধা পেলে আজীবন এক জায়গায় থাকতে পারবে। যেখানে সেখানে চলাফেরা বা যাত্রীবাহী গাড়ী ও বোটে যাতায়াত করলে হীনতা দেখায়। বার্মা ও থাইল্যান্ডে ভিক্ষুদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে নেই। সুতরাং চলাফেরা না করাই উত্তম।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- যারা বুদ্ধের নীতি অথবা বনভন্তের নীতিতে চলবে তারা পূণ্য সঞ্চয় করবে। আর যারা বুদ্ধের নীতি বা বনভন্তের নীতিতে চলবে না তারা পাপ সঞ্চয় করবে। পূণ্য করলে পুরস্কার পাবে এবং পাপ করলে শাস্তি পাবে। পাপ পূণ্য যাচাই করে চলতে পারলে পরম সুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

খাগড়াছড়ি আর্য বনবিহারে বনভন্তের দেশনা

খাগড়াছড়ি শহরের ৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে পেরাছড়া গ্রাম অবস্থিত। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পেরাছড়া গ্রামকে ধর্মপুর নাম দিয়েছেন। ধর্মপুর লোকালয় হতে একটু পূর্বে যে দুটি পাহাড় আছে সেখানে 'আর্য বনবিহার' স্থাপিত হয়। এ বিহারটি ১১ একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত (হয়)। বিহারের

জন্যে যাঁরা ভূমিদান করেছেন তাঁরা হচ্ছেন বাবু খুলারাম চাক্‌মা ৪ একর, বাবু লালন বিহারী চাক্‌মা ৪ একর ও বাবু শ্রী চন্দ্র চাক্‌মা ২$\frac{১}{২}$ একর। পানছড়ি সড়ক হতে বিহার পর্যন্ত যাঁরা রাস্তার জন্যে ভূমিদান করেছেন তাঁরা হচ্ছেন বাবু পূর্ণ চন্দ্র চাক্‌মা, বাবু রেবতী মোহন চাক্‌মা, বাবু রমনী মোহন চাক্‌মা, বাবু সুবোধ চন্দ্র খীসা, বাবু প্রিয় কুমার চাক্‌মা, মিসেস্ ইনুপতি চাক্‌মা ও বাবু যোগেশ চন্দ্র চাক্‌মা।

আর্য বন বিহার জায়গাটি অত্র এলাকার সধর্মপ্রাণ জনগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রায় সমান করেছেন। প্রথম পাহাড়টি এক বিরাট মাঠে পরিণত হয়। মাঠের উত্তর পাশে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্যে এক সুরম্য ধ্যান কুঠির নির্মাণ করেছেন। মাঠের পশ্চিম পাশে ভিক্ষু সংঘের জন্যে এক লম্বা পাকা কুঠির ও পূর্ব পাশে ভোজনশালা গড়ে তোলেন। মাঠের সর্ব দক্ষিণে আর্য বন বিহার ও দেশনা ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পাহাড়ে অর্থাৎ পূর্বদিকে কঠিন চীবর তৈরী করার জন্যে বেইন ঘর ও বনের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট ধ্যান কুঠির স্থাপন করা হয়। এ কুঠির গুলি নির্জন ও ধ্যান উপযোগী হয়েছে। পানীয় জল নলকূপ হতে সরবরাহ করা হয়। পূর্বে ডায়নেমা দ্বারা বাতি জ্বালানো হতো। ২১শে অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী সোমবার সন্ধ্যায় পানছড়ি সড়ক হতে বিদ্যুত সংযোগ হয়। খাগড়াছড়ি আর্য বনবিহার ১৯৯৪ ইংরেজীতে বনভন্তে উদ্বোধন করেন।

আজ ২২শে অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী মঙ্গলবার। খাগড়াছড়ি আর্য বন বিহারে ২য় বারের মত দানোত্তম কঠিন চীবন দান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল বেলায় বুদ্ধ পূজা, অষ্ট পরিষ্কার দান ও সংঘদান করা হয়। বিকাল বেলায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে কঠিন চীবর তৈরী করা হয়েছে তা উৎসর্গ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ৩টা ১০ মিনিট হতে ৪টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন- ত্রিরত্ন কাকে বলে ? বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন বলে। বুদ্ধ অর্থ জ্ঞান, ধর্ম অর্থ সত্য ও সংঘ অর্থ যাঁরা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে চলে বা মুক্তি পথের পথিক। ব্রহ্মচর্য কাকে বলে ? মস্তক মন্ডন ও রংবস্ত্র পরিধান করলে ব্রহ্মচর্য হয় না। যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে চলে বা আচরণ করে তিনিই ব্রহ্মচর্য পালন করেন। ব্রহ্মচর্য শুধু ভিক্ষু শ্রমণদের জন্যে নয়। শ্বেত বস্ত্রধারীরাও ব্রহ্মচারী হতে পারে। যাঁরা মস্তক

মুন্ডন ও রংবস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষু শ্রমণ হয়ে হঠাৎ চলে যায় চারি আর্য সত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ তাদেরকে বাহিরে ছুড়ে ফেলে দেয়।

ভিক্ষু সংঘের মধ্যে দক্ষ ভিক্ষু খুবই কম দেখা যায়। অদক্ষ ভিক্ষুর সংখ্যাই বেশী। তারা নিজেরও উন্নতি করতে পারে না এবং অন্যদের জন্যে কিছু করতে পারে না। সুতরাং তারা সারাক্ষণ অনর্থক কাজে ব্যস্ত থাকে। সাধারণতঃ ভিক্ষুর ৩টি স্থান হলে সুখ হয়। প্রব্রজ্যা স্থান, আসবক্ষয় ও চিত্ত বিমুক্তি প্রজ্ঞা বিমুক্তি। এ তিনটি স্থান পূরণ হলে দেব মনুষ্যের সুখ হয় ও মঙ্গল সাধিত হয়। যারা অদক্ষ ভিক্ষু তারা মার ভূবন ও অমার ভূবন চিনে না। যাঁরা দক্ষ ভিক্ষু- তাঁরা মার ভুবন ও অমার ভূবন ভালভাবে চিনেন। মার ভূবন কাকে বলে? সংক্ষেপে ৩১ লোক ভূমিকে মার ভুবন বলে। অমার ভূবন কাকে বলে? শ্রোতাপত্তি মার্গ, শ্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামী মার্গ, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী মার্গ, অনাগামী ফল, অর্হৎ মার্গ, অর্হত্ত্বফল ও নির্বাণকে অমার ভূবন বলে। আবার ইহাকে নবলোকোত্তর ধর্মও বলে। মার ভুবনকে মৃত্যুরাজ্য বলে। অমারভূবনকে অমৃত্যুরাজ রাজ্য বলে। মৃত্যু রাজ্যে জন্ম-মৃত্যু আছে আর অমৃত্যু রাজ্যে জন্ম মৃত্যু নেই। যাঁরা দক্ষ ভিক্ষু তারা মৃত্যু রাজ্য পার হয়ে অমৃত্যু রাজ্যে চলে যান এবং অপরকেও মৃত্যু রাজ্যের সীমান্ত পার করিয়ে দেন। সেখানে গেলে জন্ম-মৃত্যু নেই, পরম সুখ, ইহকাল ও সুখ ও পরকাল ও সুখ। অমৃত্যু রাজ্যে গেলে স্বাধীন, নিরাপত্তা, দুঃখহীন, সম্পূর্ণ মুক্ত এবং মৃত্যু রাজ্যের নাগালের বাহিরে। যেমন, একজন লোক খাগড়াছড়ি থেকে ভারতে চলে গেলে তাকে এখানের কেউ নাগাল পাবে না। ঠিক সেরকম মৃত্যুরাজ্য থেকে অমৃত্যু রাজ্যে চলে গেলে তাকে মৃত্যুরাজ ও দুঃখে নাগাল পাবে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-আচ্ছা, এখানে একটা প্রশ্ন করা যায়। মৃত্যু রাজ্য যে পার হয়েছে তা কিভাবে চেনা যাবে? যেমন ধর, দুইজন গৃহী দুই জায়গায় স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসার করছে। তাদের মধ্যে ছেলে মেয়ে সমান, জায়গা জমিও সমান এবং বয়সেও সমান। একজন মার্গফল লাভী ও অন্যজন সাধারণ ব্যক্তি। কিভাবে চেনা যাবে ? এগুলি প্রমাণ পাওয়া যায় শুধু তাদের চিত্তের মাধ্যমে। মার্গফল লাভীর চিত্তে দুঃখ ক্লেশ থাকে না, সর্বদা স্থির। কিন্তু সাধারণের চিত্তে দুঃখরাশি থাকে ও চিত্ত সর্বদা চঞ্চল থাকবে। বুদ্ধের আমলে ৫৭ হাজার শ্বেত বস্ত্র ধারী মার্গফল লাভী ছিল। পূর্ব রক্ষিত

পারমী, ইহ জন্মের দৃঢ় প্রচেষ্ঠা ও সৎগুরুর উপদেশে মার্গফল লাভ হয়। ইহ জন্মে দৃঢ় প্রচেষ্টা করে যদি মার্গফল লাভ না হয় তারা মরণের পর স্বর্গে উৎপন্ন হয়। অথবা মনুষ্য লোকের মধ্যে রাজকুলে বা ধনাঢ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করে। যারা শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করে তারা সর্বোচ্চ ৭ জন্মের পর নির্বাণ যান। শাস্ত্রে দেখা যায় অনেক অর্হৎ ভিক্ষু চারি প্রত্যয় ভালভাবে না পেয়ে মরে গেছেন। তাদের পূর্ব জন্মের দানের পূণ্য পারমী ছিল না।

তিনি বলেন- আমি যখন ধন পাতায় ধ্যান করছিলাম তখন অনেকে বলেছিল- বন শ্রামণ মারা যাবেন। কারণ আমি কোন টাকা পয়সা স্পর্শ করতাম না। কোন কিছু জমাও করতাম না। যেমন অন্যান্য ভিক্ষুরা যেভাবে করে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বন শ্রামণের দৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে লোকোত্তর জ্ঞানে (বনভন্তে) উন্নীত হন।

চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিতে দুঃখ ধ্বংস করে ও পরম সুখ বিস্তার করে। নির্বাণ যে পরম সুখ কিভাবে জানে ও কিভাবে বুঝে? যেমন ধর, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর গরমের দিন। যদি কেউ এয়ারকন্ডিশন ঘরে প্রবেশ করলে কেমন জানবে ও বুঝবে? সে অনুভব করবে বা জানবে ও বুঝবে যে, গরম দূরে কোথাও চলে গেছে। নির্বাণ ও ঠিক সেরকম আগে যে দুঃখগুলি ছিল বর্তমানে তার চিত্তে অনুভব করে জানবে ও বুঝবে যে দুঃখগুলি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। যতক্ষণ প্রমাণ পাওয়া না যায় ততক্ষণ এয়ারকন্ডিশন বা নির্বাণের বিশ্বাস জন্মানো সহজ ব্যাপার নয়। স্বয়ং জেনে ও বুঝে প্রমাণ করতে সহজ হয়।

সমবেত উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি তিনি জোর দিয়ে বলেন- ভগবান বুদ্ধের ধর্মের আয়ু ৫ হাজার বৎসর। এখনও সময় আছে, চেষ্টা করলে কৃতকার্য হতে পারবে। সাধারণত দেখা যায়, নারী একাকী থাকতে পারে না, পুরুষ ও একাকী থাকতে পারে না। সুতরাং তারা উভয়ে মিলে সংসার গঠন করে। তাতে তাদের অজানাতে অনেক পাপ জমা হচ্ছে। না জানাই হচ্ছে অবিদ্যা। সুতরাং তোমরা পুরাতন পাপ ধ্বংস কর ও নূতন পাপ উৎপন্ন বন্ধ কর। নিত্য নূতন পূণ্য সঞ্চয় কর এবং সে পূণ্য বৃদিধ করে নির্বাণ সাক্ষাৎ কর। নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারলে চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে অতি সহজ-সরলভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এসত্য দ্বারা অপায়দ্বার বন্ধ হয়। প্রতীত্য

সমুৎপাদ নীতি জানলে ও বুঝলে সর্ব দুঃখ মুক্তি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

অনেক সময় ভিক্ষুরা বলে থাকে- আমি ধর্ম কথা কি বলবো? যদি ধর্ম কথা বলতে হয় চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে প্রকাশ কর, ঘোষণা কর, দেশনা কর ও প্রতিষ্ঠা কর। তা কি রকম? দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধ প্রতিপাদায় বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে প্রকাশ কর, ঘোষণা কর, দেশনা কর ও প্রতিষ্ঠা কর। যেমন কোন একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে আগে থেকে বিজ্ঞাপনে অথবা মাইকে ঘোষণা করতে হয়। ঠিক সেরকম চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি প্রচার করতে হয়।

তিনি বলেন- যার শীল থাকে সে ধনী। শীল পালন করে তোমরা আজ মরে যাও অথবা কাল মরে যাও কোন দুঃখ পাবে না। (শুধু) শীল পালন [illegible] মৃত্যুর পর স্বর্গে যাও। কিন্তু দুঃশীল অবস্থায় থেকোনা। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- দুঃশীল অবস্থায় একশত বৎসর বেঁচে থাকার চেয়ে এক ঘন্টা শীল পালন করে মরে যাওয়াও অনেক ভাল। পার্থিব জায়গায় বেঁচে থাকার জন্যে ভগবান বুদ্ধ কোন সময় উপদেশ দেননি। গৃহীরা শীল পালন করে বহু শিল্পজ্ঞান থাকলে গৃহী জীবন সুখী সমৃদ্ধি লাভ হয়। যাদের শিল্প থাকে তারা ধনী হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- মানুষ মাত্রই হিংসা করে। হিংসা করা মনুষের স্বভাব। হিংসা করলে মানুষ দিন দিন গরীব হয় এবং যে সম্পদ আছে সেগুলিও হারানোর সম্ভাবনা থাকে। জীব হিংসা করলে মানুষ নীচে পড়ে বা অপায়ে গমন করে। জীব হিংসা কে করে জান? অজ্ঞানে জীব হিংসা করে। সেজন্য মানুষের মনে সদায় দুঃখ থাকে। বাংলাদেশে ১১ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় লোকের মধ্যে দুঃখ আছে। প্রত্যেক লোক এক একটি দুঃখপুঞ্জ বা দুঃখের দলা।

মানুষের কোন অবস্থায় সুখ থাকে? বসা অবস্থায়, শয়নে, দাঁড়ালে না গমনে? কোন অবস্থাতে সুখ নেই। যদি কেউ সুখ থাকে মনে করে তার অজ্ঞানতা মাত্র। যার চিত্তে সব সময় পাপের প্রতি লজ্জা থাকে ও ভয় থাকে তার চিত্তে সুখ থাকে। সে যে অবস্থায় থাকুক না কেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- যে নারী পুরুষ অবৈধ কামভাব পোষণ করে তারা জ্বলন্ত আগুনের মত দুঃখকে আলিঙ্গন করে। যেমন ৮ হাজার ভোল্ট এর বিদ্যুৎ স্পর্শ করার মত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বৃক্ষজিত ভিক্ষু জ্বলন্ত আগুন রূপ রমিতাকে স্পর্শ করে ধ্বংস হয়েছে। সর্পে দংশন করলে মন্ত্রদ্বারা নিরাময় করা যায়। কিন্তু নারী সর্পে দংশন করলে জীবন বাঁচানো সম্ভব নয়। সুতরাং প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা থেকে দুরে থাকা উচিত। এগুলি থেকে ক্লেশ, স্কন্ধ, ধাতু আয়তন, উপাদান উৎপত্তি হয়। পরিনামে দুঃখের সীমা থাকে না। তোমরা সকলে সর্বদা পূণ্যকাজ কর। পূণ্যে পাপকে পরাভূত করে। প্রত্যেক প্রাণীকে দয়া কর, হিংসা করনা ও সর্বদা অক্ষুন্ন মনে থাক। অহংকার করনা। অহংকার করলে নীচু কুলে জন্ম হয় ও অপায়ে যায়। অহংকার না করলে উচ্চকুলে জন্ম হয়, সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

উপসংহারে উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি বলেন- তোমরা উত্তমরূপে পঞ্চশীল পালন কর। প্রাণী হত্যা করলে নরকে যায় ও জন্মে জন্মে অল্প আয়ু হয়। চুরি করলে জন্মে জন্মে গরীব হয়। বিহারের জিনিষপত্র চুরি করলে পরজন্মে ভিক্ষা করলেও ভিক্ষা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। অবৈধ কাম সেবন করলে নরকে পড়েও পরজন্মে নপুংশক হয়। মিথ্যা বললে জন্মে জন্মে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় ও বিশ্রী চেহারা হয়। নেশা দ্রব্য সেবন করলে পশু পক্ষী হয়ে জন্ম হয়। মনুষ্যকুলে আসলে পাগল হয়ে ঘুরাফেরা করে। সুতরাং তোমরা পঞ্চশীল বিশুদ্ধভাবে পালন কর। যাতে নীচে না পড়ে উপরে বা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়ে পরম সুখ নির্বাণ লাভ করতে পার। এ বলে আমার দেশনা এখানে শেষ করলাম।

ব্রহ্মচারীর রাজার মত গম্ভীর থাকতে হয়

আজ ২৪শে অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী বৃহস্পতিবার। ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন- তোমাদের প্রধান কাজ হল শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন করা। উপাসক-উপাসিকাদের প্রধান কাজ হল ভিক্ষু শ্রমনদেরকে চারি প্রত্যয় দিয়ে সুযোগ

সুবিধা প্রদান করা। তোমরা যত বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করবে তত তোমাদের মংগল ও উন্নতি হবে। উপাসক-উপাসিকাদেরও ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হবে। তাতে দেবতারাও বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে। মহা উপাসিকা বিশাখা একা নিজেই ২৫০০ ভিক্ষু শ্রমনকে চারি প্রত্যয় দান করতেন। ব্রক্ষচারীরাও রাজার মত গম্ভীর থাকতে হয়। রাজা যেমন যেখানে সেখানে চলাফেরা করে না, তেমন ব্রক্ষচারীরাও যেখানে সেখানে চলাফেরা করে না। ব্রক্ষচারীরা অল্প আহারী হন। অধিক আহারে আসক্তি বাড়ে।

তিনি বলেন- মানুষ মাত্রেই হিংসুক প্রকৃতির হয়। হিংসার কারণে দুঃখ বাড়ে। যারা সাধারণ ব্যক্তি তারা হীন সংস্কার, হীন মানুষ ও হীন তৃষ্ণায় জড়িত হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করে। ভগবান বুদ্ধ প্রথমেই হীন সংস্কার, হীন মানুষ ও হীন তৃষ্ণা দূর করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের সময় ভিক্ষু শ্রমনেরা অসুস্থ্ হলে কম চিকিৎসা করত। ২১টি নিষিদ্ধ কর্ম করলে কুল দুষক কর্ম হয়। কুলদূষক কর্মা মৃত্যুর পর অপায়ে পতিত হয়। ভিক্ষুদেরকে সম্পূর্ণ পরদত্ত দানেচলতে হয়। যারা কাঁচা তাদের নারী দেখলে আসক্তি বাড়ে। যাদের কায় বিবেক থাকে তারা মানুষকে দুঃখ হিসেবে দেখে, যাবতীয় সংস্কারকে দুঃখ হিসেবে দেখে এবং তৃষ্ণাকে দুঃখ হিসেবে দেখে।

তোমরা উত্তমরূপে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষা কর, অভ্যাস কর, আচরণ কর, ধারণ কর ও পূরণ কর। বৌদ্ধ ধর্মে তিন প্রকার যজ্ঞ আছে। দান যজ্ঞ, শীল যজ্ঞ ও ত্রিশরণ যজ্ঞ। এ তিন প্রকার যজ্ঞ মহৎ ফল দেবে। অন্যান্য যজ্ঞে মহা পাপ হয়। যারা খারাপ কাজ করে তারা মরনের পর নরকে পতিত হয়। অনেক ভিক্ষু শ্রমনেরা টাকা পয়সা জমা করে। রংবস্ত্র নিয়ে লেখাপড়া করে ও চাকুরী করে। তারা হীন ও সাধারণ ব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং কাম ত্যাগ, রূপ ত্যাগ ও বেদনা ত্যাগ করতে পারলে পরম সুখ পাওয়া যায়। জংগলে ধ্যান করতে করতে যদি বাঘে খেয়ে ফেলে তবুও ভাল। জংগলের বাঘে খেলে রক্ত মাংস খাবে মাত্র। নারী বাঘে খেলে তোমাদের জ্ঞান-পূণ্য চুষে খেয়ে ফেলবে। বিশেষ করে শিক্ষিত ভিক্ষু শ্রমনেরা না জেনে নারী বাঘের হাতে ধরা পড়ে। অধিকাংশ সময় দেখা যায় নারী বাঘ থেকে ভিক্ষু শ্রমনদের দোষ বেশী। যে নারীর স্রোতাপত্তি ফল লাভ হয় তাদেরকে বিশ্বাস করা যায়। তারা চারি আর্য সত্যজ্ঞান ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়

নারীরা, ভিক্ষু শ্রমনেরা অন্যায় করলে সংশোধন করে দেয়। ভগবান বুদ্ধকে মার রাজার কন্যারা প্রলোভনে ফেলতে চেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন- ওহে মার কন্যাগণ, যার কাছে হিংসা নেই, লোভ নেই ও মোহ নেই নিষ্কলংক বুদ্ধকে প্রলোভনে ফেলতে পারবেনা। মার রাজার মেয়েরা বর্তমানে মেয়েদের চিত্তে প্রবেশ করে ভিক্ষু শ্রামনদেরকে প্রলোভনে ফেলতে চাচ্ছে। বর্তমানে কিছু সংখ্যক ভিক্ষু বানরের মত হয়েছে আর নারীরা হয়েছে মিষ্টি কুমড়ার মত। তারা উভয়ে উপযুক্ত হয়েছে। এগুলি জ্ঞানের দুর্বলতা মাত্র। সুতরাং তোমরা এরূপ প্রার্থনা কর-

'দাও প্রভু জ্ঞান বল শক্তি অমরতা।
ত্যাগের বিমল বুদ্ধি দৃষ্টি অসারতা'।।

তাহলে তোমাদের কি করতে হবে ? তোমাদের রেডিওর এরিয়েল, তার ও অন্যান্য যন্ত্রগুলি খুলে ফেলতে হবে। এরিয়েল, তার ও অন্যান্য যন্ত্র কি জান? অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ, স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতু। এগুলি প্রহীন করলে পরম সুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদানে দুঃখগুলি সংগ্রহ করেও ধারন করে। চারি আর্য সত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি প্রত্যক্ষ করলে তোমাদের প্রব্রজ্যার স্থান রাজার অভিষেকের মত প্রতীয়মান হবে। আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করতে পারলে ভিক্ষুর সুখ হবে এবং চিত্ত বিমুক্তি প্রজ্ঞা বিমুক্ত লাভ করতে পারলে দেব-মনুষ্যের সুখ স্থাপন হবে। লোভ, তৃষ্ণা, মোহ ও সৌন্দর্য স্পৃহা করলে কর্দমে যেভাবে পতিত হয় সাধকেরাও সেভাবে নরকে পতিত হয়।

সুতরাং ভগবান বুদ্ধের মনোবিজ্ঞান আছে বলে সকল কিছু বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। তাতে দেব-মুনষ্যের সুখ হয় ও শান্তি স্থাপন করা যায়।

যৌবন ত্যাগ করা মহা কঠিন

আজ ২৫শে অক্টোবর/১৯৯৬ ইংরেজী শুক্রবার। আজ ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্ম দেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন-ধর্ম দেশনা করতে হলে প্রথমে নরকের বর্ণনা ও কুফল সম্বন্ধে দেশনা করতে

হয়। দ্বিতীয় স্বর্গের বর্ণনা ও সুফল সম্বন্ধে দেশনা করতে হয়। তৃতীয় ভাল মন্দ অবগত করায়ে নির্বাণ সম্বন্ধে দেশনা করতে হয়। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- দুষ্টের শাস্তি ও শিষ্টের পুরস্কার প্রাপ্য এবং তাই তারা পেয়ে থাকে। সম্রাট অশোকের আমলে ৬০ হাজার দুষ্ট ভিক্ষুকে শাস্তি দিয়েছিলেন। যাঁরা ভালভাবে ছিলেন তাঁদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। সেরকম আমার নিকট যদি ৮ হাজার ভিক্ষু শ্রমন প্রব্রজ্যা ও উপসম্পাদা নিয়ে থাকে আমিও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করব। শুধু মস্তক মুন্ডন করে প্রব্রজ্যা, উপসম্পাদা ও রংবস্ত্র পরিধান করলে ভিক্ষু শ্রমন নয়। যারা ভিক্ষু তাদেরকে অসাধারণ হতে হবে। সাধারণ লোক বহু দুঃখ পায়। বিভিন্ন বাঁধা অতিক্রম করতে পারে না। যারা অসাধারণ তারা সব সময় অক্ষুন্ন মনে থাকে ও সকল বাঁধার পর বাঁধা অতিক্রম করতে সাহসী হয়। হীনত্বে অগ্রত্ব হয় না। অগ্রত্বে অর্হত্ব লাভ হয়। সব সময় উজ্জ্বল ও উচ্চভাবে চলতে পারলে তোমরা অবিষ্যত লক্ষ্যে পৌছিতে পারবে। তাতেই তোমাদের নির্বাণ প্রত্যক্ষ ও উচ্চতর জ্ঞান লাভ করতে সহজ হবে। তিনি একটি উপমা দিয়ে বলেন-

আমার ফলে এমনি মজা,
না খেলে যায় না বুঝা
ক্ষুধা তৃষ্ণা সেরে যাবে,
পরানেতে উঠবে বল।

তিনি বলেন-পূর্ব রক্ষিত পূন্য না থাকলে বর্তমানে সুখ-স্বাচ্ছন্দে চলতে পারবে না। যারা ধনীর ছেলে তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দের সহিত দীর্ঘদিন থাকতে পারবে। মার্গ, ফল ও নির্বানে কোন অসুবিধা নেই। দুঃখ নেই, অভাব নেই। সর্বদা বিমলানন্দ মুখ অনুভব হয়।

তিনি বলেন-সংসারে ভিক্ষু সংঘ ছাড়া আরো অনেক সংঘ আছে। তারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকতে পারে। ভিক্ষু সংঘকে কিন্তু এসবের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী হিসাবে থাকতে হয়। যৌবন ত্যাগ করা মহা কঠিন ব্যাপার। যৌবন কাল ধ্যান-সমাধিতে অতিক্রম করতে পারলে কৃতকার্য হতে পারবে। বৃদ্ধকালে নারীরা গ্রহণ করবে না। প্রত্যেকটি নারী এক একটি ভিসি আর। আচ্ছা বলতো যুবক ভিক্ষুরা ভিসি আর দেখে কেন? আবার যারা ভাল (যুবক) ভিক্ষু তারা ভিসি আর দেখে না। কে বেশী দোষী? নারী না ভিক্ষু।

ভিক্ষু বেশী খারাপ! বৃদ্ধ ভিক্ষু নারীর জন্যে কি জান? লৌহার টুকরা আর লৌহার টুকরা খেতে পারে না। যুবক ভিক্ষু মূলার মত। অনেক যুবক ভিক্ষু বানরের মত। যুবতী নারী হল বাঘের মত। বাঘ বানরকে ভয় দেখিয়ে হতভম্ব করে গাছ থেকে ঝাপ মারতে বাধ্য করে এবং মাটিতে পড়লে খেয়ে ফেলে। অনেক বৃদ্ধ অজ্ঞানী ভিক্ষু আছে তারা শিয়ালের মত। শিয়ালে কি করে জান? মহিষ দেখলে চেয়ে থাকে কিন্তু ধরে খেতে পারে না। মহিষ হল যুবতী নারী। শিয়ালের মত চেয়ে থাকা হল আসক্তি। চিত্তের দুর্বলতা মাত্র। চিত্তের দুর্বলতাই মানুষকে ধ্বংস করে। তা হলে উপায় কি? স্ত্রী লোক দেখলে জ্ঞানযোগে দেখতে হবে। স্ত্রী নয় নামরূপ মাত্র। এখানে আগুন, পানি, মাটি ও বায়ুর সমষ্টি মাত্র। তোমাদের বিদ্যা উৎপত্তি করতে হবে। সত্য মিথ্যা যাচাই করে অবিদ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। অবিদ্যাকে দুরে ফেলে দিয়ে বিদ্যা উৎপত্তি কর। চারি আর্যসত্য জানলে, বুঝলে চারি অপায় দ্বার বন্ধ হবে। প্রতীত্য সমুৎপাদ জানলে, বুঝলে সর্ব দুঃখ মুক্তি নির্বাণ লাভ হবে। বিদ্যা কি? দুঃখে জ্ঞান, দুঃখের কারণে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধে প্রতিপদায় জ্ঞান। অবিদ্যা কি? দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখের কারণে অজ্ঞান, দুঃখ নিরোধে অজ্ঞান ও দুঃখ নিরোধ প্রতিপদায় অজ্ঞান। তাহলে তোমরা বৌদ্ধ ধর্ম- গবেষনা কর ও নির্বাণ গবেষণা কর। না হয় ভবিষ্যতে ৫ প্রকার মহাচোর ভিক্ষুতে পরিণত হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- মহা কশ্যাপ তাঁর স্ত্রী কপিলানী ভদ্রানীকে ফেলে ভিক্ষু হয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর ৬টি মহাগুন ছিল। শীলবতী, শ্রদ্ধাবতী, দয়াবতী, রূপবর্তী, গুণবতী ও ধনবতী। তিনি কোনদিন তাকে সত্য সুখ বলে বিশ্বাস করেননি। বুদ্ধও কোনদিন নারীর নিকট আত্ম সমর্পণ করেননি। তোমরা যদি নির্বাণ যেতে না পার নারীর নিকট আত্ম সমর্পন করে চলে যেতে বাধ্য হবে। তোমরা হীনভাবে থেকো না। অপরের আশ্রয়ে থেকো না। সব সময় মার কি বনভন্তের কর্মকান্ডকে ক্ষতি করতে চায়? মেয়েদের মন চিত্তে মার প্রবেশ করে এখানে আস্‌ছে। হুসিয়ার থাক। কামসুখ মারের প্রধান সেনাপতি। আলস্য, লোভ, দ্বেষ, মোহ ক্ষয় করতে বহুদিন সময় লাগে। লোভ, আসক্তি ও অজ্ঞানতা সব সময় বিপথে ধাবিত করতে চায়।

তোমরা শীল পালনে ধনী হও। বিশ্বাসেই ধর্ম। যতক্ষন আসবক্ষয় না হবে ততক্ষণ নিজে নিজেই বুঝতে পারবে না। এটাও তোমরা মনে রেখো আমার বিরুদ্ধে বা নীতির বিপরীতে চললে বিপদ ডেকে আনবে। এ উপদেশ সব সময় স্মরণ রেখো।

রাজ বনবিহারে কঠিন চীবর দানে বনভন্তের দেশনা

আজ ২৫শে অক্টোবর/১৯৯৬ ইংরেজী রোজ শুক্রবার সকালবেলা সংঘদান ও অষ্টপরিস্কার দান অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল বেলায় বোধিতরু মূলে প্রতি বৎসরের ন্যায় বিপুল আড়ম্বরের সহিত কঠিন চীবর দান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু ইন্দ্র নাথ চাক্মা। পঞ্চ শীল প্রদান ও উৎসর্গ পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ নন্দপাল মহাথের। স্বাগত ভাষণ দেন বাবু ইন্দ্র নাথ চাক্মা। প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মৌলানা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম। ধর্মীয় সংগীত গেয়ে শোনান বাবু রনজিৎ দেওয়ান ও তার সংগীগন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর দেশনার আরম্ভেই বলেন-একজন পুত্র তার মা বাবার নিকট শত সেবা-যত্ন, ভরণ-পোষণ এবং যাবতীয় করণীয় কাজ করুন না কেন মা বাবার ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। মা বাবার ঋণ অপুরনীয় ও অসমাপ্ত থেকে যায়। তবে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন যদি সে পুত্র অর্হত্ব ফল লাভ করে তাঁর মা-বাবাকে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন করিয়ে দিতে পারেন তাহলে মা বাবার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হয়। ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র তাঁর সাত ভাই বোন সবাই বুদ্ধের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মা সারী-ব্রাহ্মণী মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন, (কৃপন ও ধনাঢ্য নারী) ছিলেন। এদিকে সারীপুত্র মহাথেরো সারা জীবনে অনেককে বহু উপকার তথা মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরিনির্বাণের সময় হলে তিনি চিন্তা করলেন, দেহ ত্যাগের পূর্বে তাঁর মাকে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন করে দিতে পারলে মায়ের ঋণ পরিশোধ হয়। এ উদ্দেশ্যে ভগবান বুদ্ধ হতে অনুমতি

পূর্বক বিদায় নিয়ে তাঁর গ্রামে (নালক) পাঁচ শত ভিক্ষু সহ ভিক্ষাচরণে যান। ভিক্ষাচরণ করতে দেখে তাঁর মা চিন্তা করলেন আমার ছেলে বাল্যকালে গৃহ ত্যাগ করেছে, বোধ হয় এবার রংবস্ত্র ছেড়ে বাড়ীতে চলে আসবে এ মনে করে ছেলেকে বাড়ীতে আহ্বান করে আনলেন। সারিপুত্র বললেন- আমি যেখানে জন্ম হয়েছি সেখানে বসবো। সারি ব্রাহ্মনী তাঁর পুত্রসহ ভিক্ষুসংঘকে উত্তমরূপে আহার্য দান করলেন। সেদিন রাত্রে ছিল সারি পুত্রের পরিনির্বাণের সময়। আহারের কিছুক্ষণ পর আমাশয়ের দরুন সারিপুত্রের এমনভাবে পায়খানা হতেছিল যে শরীর যেন কাতর হচ্ছে। এ অবস্থায় স্বর্গের চারি লোকপাল দেবতারা তাঁর দর্শনে আসেন। তাঁদেরকে দেখে সারী ব্রাহ্মনী জিজ্ঞাসা করলেন- তাঁরা কারা এসেছেন? সারিপুত্র বললেন- তাঁরা চারি লোকপাল দেবতা. আমার সেবা যত্ন করতে এসেছেন। তাঁদের পর স্বর্গের ইন্দ্র রাজা এসে সেবা করলেন। পরিশেষে মহাব্রহ্মা এসে বন্দনা জানালেন। তাঁদের পরিচয় জেনে সারিব্রাহ্মনী বললেন-পুত্র তুমি তাহলে আমার গুরুদের গুরু। সারীপুত্র তখন তার মায়ের চিত্তের অবস্থা বুঝে চিত্তের অনুকুলে এমন যে উপদেশ দিয়ে ছিলেন, সে উপদেশে ব্রাহ্মনীর কৃপনতা ও মিথ্যা দৃষ্টি দূরীভূত হয়ে সংগে সংগে মার্গফল লাভী হন। এখানে তাঁর মায়ের ঋণ পরিশোধিত হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-যারা কৃপন, ক্রোধী ও মিথ্যাবাদী তারা স্বর্গে যেতে পারবে না। সুতরাং তোমরা কৃপনতা ত্যাগ কর। ক্রোধ ত্যাগ কর ও মিথ্যা কথা ত্যাগ কর। মোদ্গলায়ন মহাথের মুহূর্তের মধ্যে স্বর্গ, নরক পরিভ্রমন করে কর্মের বিপাক সম্বন্ধে স্রোতাদেরকে প্রকাশ করতে পারতেন। একবার স্বর্গের এক দেব কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-তুমি কোন কর্ম ফলে স্বর্গে এসেছ ? দেব কন্যা বললেন আমি শুধু রাগ ত্যাগ করে স্বর্গে এসেছি।

তিনি বলেন-চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান হলে জ্ঞানের আইন ও জ্ঞানের ক্ষমতা হয়। জ্ঞানের আইন ও জ্ঞানের ক্ষমতায় সবকিছু জয় করতে পারে। বর্তমানে দেশে অজ্ঞানের আইন ও অজ্ঞানের ক্ষমতা হওয়ায় বেশী পাপ হচ্ছে। সে পাপের কারণে মানুষ অশেষ দুঃখ পাচ্ছে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন যে সত্য পথে থাকে সে সত্য নিয়ে থাকে ও সত্য বিতরণ করে। যারা জ্ঞানী তারা সত্য মিথ্যা যাচাই করে। এমন কি বনভন্তের বক্তব্যগুলিও যাচাই করে যদি সত্য হয় গ্রহণ কর এবং মিথ্যা হলে

ত্যাগ কর। ভগবান বুদ্ধের সময়ে দুই ভিক্ষুর মধ্যে তর্ক হয়েছে। একজনে বলেন-বেদনা ৩টি ও অপর জনে বলেন বেদনা ৬টি। এখানে বলা হচ্ছে চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করে ঔষধ প্রয়োগ করেন। ঠিক ভগবান বুদ্ধ হলেন চিকিৎসক। তাঁর প্রচারিত ধর্ম হল ঔষধ এবং ভিক্ষু সংঘ, উপাসক-উপাসিকারা হলেন রোগী।

তিনি জোর দিয়ে বলেন-তোমরা অজর অমর ঔষধ সেবন কর। সে ঔষধ সেবনে নরকে পড়বে না, পশু পক্ষী কুলে যাবে না। মনুষ্য কুলে আসলেও দুঃখ ভোগ করতে হবে না। যে ভগবান বুদ্ধের কথায় কর্ণপাত করবে না বা বিশ্বাস করবে না সে কোন দিন মুক্তি পাবে না। ভগবান বুদ্ধের সময় সবাই তৃষ্ণাক্ষয় করে সংসার দুঃখ উত্তীর্ণ হয়েছেন। কঠোর আইনও ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর পাঁচ শত বৎসর পর হতে খারাপ হতে চলছে। বর্তমানে বনভন্তের কাজগুলিও সাংঘাতিক! যারা না জানে ও না বুঝে তাদের জন্যে সাংঘাতিক লাগবে বৈকি। যারা না জানবে, না বুঝবে তাদের ইহকালে ও পরকালে দুঃখ অবশ্যাম্ভাবী, তাদের অপায়ে পতিত হয়ে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অনেকে বলে থাকে পঞ্চশীল পালন করা কঠিন। বৌদ্ধ ধর্ম মহা কঠিন। আবার দেখা যায়, কেউ কেউ নিষ্টুর ধর্ম বলেও আখ্যায়িত করেছে। গোপা রাহুলকে বলেছিল- এ বড় নিষ্টুর আমার স্বামীকে হরণ করেছে, আবার তোমাকে নিয়ে যাবে। এ তোমার পিতা, তোমাকে ফেলে চলে গিয়েছে। দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্ম একদিকে ত্যাগে সুখ অন্যদিকে দয়ায় সুখ। চিত্তে জ্ঞান বল হলে বৌদ্ধ ধর্ম পালন করতে পারে ও সোজা হয়। পাপাত্মা মার অনেক সময় মুক্তির পথে বাঁধা দেয়। বৌদ্ধ মতে সত্ত্বগণকে মারে বলে মার। ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মে শয়তান বলে, হিন্দু ধর্মে শনি বলে।

তিনি বলেন-আজ তোমরা যে অনুষ্ঠান করছ তাহল দানযজ্ঞ। দানযজ্ঞে মহৎ ফল দেয়। যজ্ঞ তিন প্রকার-দানযজ্ঞ, ত্রিশরন যজ্ঞ, পঞ্চশীল যজ্ঞ। দান, ত্রিশরন ও পঞ্চশীল যজ্ঞে পাপ থেকে মুক্ত হয় ও নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারে। অন্যান্য ধর্মের পশুবলি যজ্ঞ কর না। বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের আইন মেনে চললে বা বিশ্বাস করলে সর্ব দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে। সর্বজীবের দয়ায় অনবদ্য সুখ হয়। অর্থাৎ কোন দোষ নেই বা দোষ বিহীন সুখ। দুঃশীল মানুষ শত বৎসর বেঁচে থাকলেও নরকে পড়ে। সুতরাং তোমরা অপ্রমাদের সহিত শীল পালন কর। যেন মরণের সময় নরকে যেতে না হয়। সর্বদা মনের

উন্নতি ও উচ্চ আকাংখা করে নির্বাণ সাক্ষাৎ কর। তোমাদের দান, শীল ভাবনার দ্বারা অধোমুখ না হয়ে উর্দ্ধমুখী হও এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ কর। এ বলে আমার দেশনা এখানে শেষ করলাম।

তৃষ্ণা সমুদ্রে চারি আর্যসত্য জাহাজ সদৃশ

আজ ২৬শে অক্টোবর ১৯৯৬ ইংরেজী রোজ শনিবার ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে দেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন-যে চারি আর্যসত্য বুঝবে সে যাবতীয় দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবে। আর যে চারি আর্যসত্য বুঝবে না সে কখনো যাবতীয় দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবে না। নারী চিন্তা নিয়ে থাকলে পাপ, দুঃখ, মুক্ত নেই, নরকে পড়বে, ইজ্জত যায় ও লজ্জা পায়। যারা জ্ঞানী তারা বুঝেও জ্ঞানের দ্বারা উপরে উঠে। অজ্ঞানে লোভ, আসক্তি, তৃষ্ণা ও সৌন্দর্য্য স্পৃহা বাড়ায়। জ্ঞান চক্ষু থাকলে সেগুলি বাড়তে দেয় না। মার চক্ষু থাকলে খারাপগুলি সংগ্রহ করবে। বিদ্যা উৎপন্ন হলে নারী পুরুষ দেখে না। শুধু আগুন, পানি, মাটি ও বায়ুরূপে দেখে। অবিদ্যায় স্ত্রীকে (পুরুষকে) ভাল, সুন্দর ও মনে মনে সুখময় বলে গ্রহণ করে। জ্ঞান কিন্তু সেরূপে গ্রহণ করবে না। যাদের পূর্বতৃষ্ণা বা পূর্ব রোগ উৎপন্ন হয় তাদের ভালভাবে চিকিৎসা করাতে হবে। ভালভাবে চিকিৎসা করালে যেমন রোগ সরে যায়, তেমন ক্লেশ রোগগুলিও বুদ্ধের আবিস্কৃত ধর্মরূপ ঔষধ সেবনে ভাল হয়।

তিনি বলেন-নির্বাণ গেলে ভাত খেতে পারবে না। কিছু ভোগ করতে পারবে না। অনেকে মনে করে স্ত্রী থাকলে সব কিছু হয়। যারা অজ্ঞানী তারা এরকম বলে থাকে। চিত্তে পুরুষ দেখলে পুরুষ চিত্ত, নারী দেখলে নারী চিত্ত। অজ্ঞানে এসবকিছু উঠে। অনেকে বলে থাকে বৌদ্ধ ধর্ম এক প্রকার নির্দয়। অন্তর দৃষ্টি ভাব যতদিন ফুটে না উঠবে ততদিন পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারবে না। অন্তর দৃষ্টি ভাব অর্থ নিজকে জানবার, বুঝবার ক্ষমতা, আমি কি দুঃখ পাচ্ছি সে সম্বন্ধে জ্ঞান। তোমরা এ বল- দুঃখ গুলির সাথে আর থাকব না। অন্তর দৃষ্টিতে ক্লেশ, স্কন্ধ, আয়তন, তৃষ্ণা, উপদান ও ধাতুগুলি ভালরূপে

দেখে বলে আর সে গুলির সাথে থাকে না। ক্লেশ এমন এক রোগস্বরূপ যা সব সময় দুঃখ দিতে থাকে। অকুল সমুদ্রে তিনতালা বিশিষ্ট জাহাজ থাকলে সমুদ্রের হাংগর-কুমিরে নাগাল পায় না। ঠিক সেরকম তৃষ্ণা সমুদ্রে চারি আর্যসত্য জাহাজ সদৃশ। ক্লেশ গুলি হল হাংগর-কুমির সদৃশ। সুতরাং তোমরা যদি বাঁচতে চাও অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করতে চাও বা নিরাপদে থাকতে চাও চারি আর্য সত্যের আশ্রয়ে যাও।

বিনা যুদ্ধে নির্বাণ যেতে পারবে না

আজ ২৭শে অক্টোবর/১৯৯৬ ইংরেজী রবিবার, ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্ম দেশনা দিচ্ছিলেন, প্রথমেই তিনি বলেন-বিনা যুদ্ধে নির্বাণ যেতে পারবে না। তাহলে তোমরা কার সাথে যুদ্ধ করবে? প্রথমে যুদ্ধ করতে হবে নারীর সাথে। নারী গ্রহণ করনা ও নারীর সাথে থাক না। দ্বিতীয় যুদ্ধ করতে হবে মারের সাথে। মারের সাথে সহযোগিতা করনা ও থাক না। তৃতীয় যুদ্ধ কর আত্মার সাথে। আত্মায় বড় হতে চায় ও নেতা হতে চায়। তাতে দুঃখ বাড়ে।

তিনি বলেন-তোমরা ধুতাংগ শীলে প্রতিষ্ঠিত হও। ধুতাংগ কি জান? ধুনে বলে ধুতাংগ। কি ধুনে? মার ও আত্মাকে ধুনে বলে ধুতাংগ। যেমন গাছকে দা দিয়ে টুকরা টুকরা করে ধুনা হয় তেমন মার ও আত্মাকে জ্ঞান অস্ত্র দিয়ে ধুনে ধুনে বিলীন করে বলে ধুতাংগ। মার ও আত্মাকে ভয় করলে তা করতে পারবে না, এটা বড় কঠিন কাজ। যদি তোমরা ধুতাংগ ভালরূপে শিক্ষা অভ্যাস, ধারণ, গ্রহণ ও পূরণ করতে পার তবে দেবলোক, ব্রহ্মলোক, যমরাজ ও মৃত্যুরাজকে পরাস্ত করতে পারবে। মৃত্যুকে সবাই ভয় করে। এ ভয়কে অতিক্রম করতে হবে, তবেই দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। কি কি দক্ষতা? মার ভূবন দক্ষতা, অমার ভুবন দক্ষতা, মৃত্যুরাজ দক্ষতা, অমৃত্যুরাজ দক্ষতা, ইহলোক দক্ষতা, পরলোক দক্ষতা, চিত্ত সংযম দক্ষতা ও শমথ-বিদর্শন সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। নিজ অভিজ্ঞায় চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করতে পারবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-সাইক্লোন আসার পূর্বে যেমন বিপদ সংকেত দেয়া হয়, তেমন তোমাদেরকে নানাবিধ দুঃখ আসার পূর্বে সতর্কতা

জানাচ্ছি। যেমন সে দুঃখ গুলি কি কি? জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, আহার অন্বেষণে দুঃখ ও অতীত পাপের কারণে দুঃখ। এ অষ্টবিধ দুঃখ গুলি সম্বন্ধে সংবেগ উৎপন্ন করতে না পারলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারবে না। মানুষ জন্ম হলে সংগে সংগে বিভিন্ন দুঃখ উৎপত্তি হয়। সাথে সাথে বিভিন্ন শত্রুও উৎপন্ন হয়। ৩১ লোক ভূমির মধ্যে কাম, রূপ, অরূপলোককে মার ভূবন বলে। এগুলি থেকে মুক্ত হতে পারলে পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়।

তিনি বলেন-কায়গতানু স্মৃতি ভাবনা করলে চিত্ত আয়নার মত পরিষ্কার হয়। মার্গ ভাবনার দ্বারা পাপ থেকে মুক্ত ও নির্বাণ লাভ করা যায়। নিত্য স্মৃতিতে থাকলে আপত্তি দেশনার প্রয়োজন হয় না। নতুন মার্গফল লাভ করলে প্রকাশ করা যায় না। একবার জনৈক রাজা এক নতুন অর্হতকে বন্দনা করার জন্যে গিয়েছিলেন। উক্ত অর্হৎ ভিক্ষু চিন্তা করলেন অর্হৎ হিসেবে পরিচয় পেলে লাভ-সৎকার বেশী করবে। তাতে ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এ মনে করে তিনি মাটিতে কঠি দিয়ে দাগ কাঁটতে আরম্ভ করলেন। রাজা চিন্তা করলেন যারা মাটিতে দাগ কাটে তারা সাধারণ ব্যক্তি। সুতরাং তিনি অর্হৎ হবেন না। তিনি ফিরে চলে গেলেন।

তিনি বলেন- জ্ঞানের দুর্বলতা থাকলে অন্য জনের আশ্রয়ে থাকে। আশ্রয়ে থাকা ও দুঃখ জনক। ভোগ বিলাস এমন জিনিষ তার কোন সীমা থাকে না। ভোগ বিলাসের মাত্রা বাড়ালে স্বদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয়ে অন্য ধর্মে চলে যেতে বাধ্য হয়। ত্রিলোকে ধর্ম কর্ম করলে অধীন থাকতে হয়। অধীন থাকা মহা দুঃখজনক। সকল কিছু ত্যাগ কর, তা ক্ষয় ব্যয় শীল।

নারী পুরুষকে ও পুরুষ নারীকে লোভ করলে প্রেত কুল জন্ম হয়। গরীব লোকের ছেলে প্রব্রজ্যা নিলে বিহারের বিভিন্ন ধরণের কাজ করাতে হয়। বড় লোকের ছেলেদের ভাবনা দেয়া উচিত। তোমরা সবাই পন্ডিত হও। পন্ডিত হতে হলে সহনশীলতা দরকার, ক্ষমাশীল, মৈত্রী পরায়ন, পূন্য কর্মে নির্ভীক, অক্ষুন্নমনা বা নিন্দা প্রশংসায় অটল থাকতে হবে। অনেকে বেশী কথা বললে নিন্দা করে। কম কথা বললেও নিন্দা করে। সাধারণ লোকের নিন্দা-প্রশংসায় কোন মুল্য নেই। যারা আত্মদমন, চিত্ত দমন ও ইন্দ্রীয় দমন করতে পারবে তাদেরকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা শিক্ষা এগুলির

ট্রেনিং নিতে হবে। ক্ষুদ্র পাপে ক্ষুদ্র শীল পালন করতে হয়। মধ্যম পাপে মধ্যম শীল পালন করতে হয়। মহা পাপে মহা শীল পালন করতে হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, শুধু পালি, ত্রিপিটক শাস্ত্র, লংকা বার্মার শিক্ষায় ভিক্ষুত্ব জীবন (কোন দিন) রক্ষা করতে পারবে না। নির্বানে একমাত্র রক্ষা করতে পারবে। শাক্য বংশ ধ্বংস হয়েছে কিভাবে জান? তারা অহংকার করেছিল এবং পূর্বজন্মে মহাপাপ করেছিল। এ দুই এর কারণে তারা ধ্বংস হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধও তাদেরকে রক্ষা করতে পারেননি। সেরূপে পার্বত্যবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তোমরা ভালভাবে শীল পালন কর। নতুবা তোমাদের বিপদ আসতে পারে। সে বিপদকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। শীল পালন করে মরনের পর স্বর্গে গমন কর অথবা উন্নত বৌদ্ধ দেশে জন্ম গ্রহণ কর।

অবশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-একখানা বিল্ডিং করতে হলে লৌহা, ইট, বালি ও সিমেন্টের প্রয়োজন। এবং সে বিল্ডিং এর কাজ দেখাশুনা করার জন্যে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন থাকে। ঠিক সেরূপ বনভন্তেও চারি আর্য সত্যের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। যদি কাহারো মুক্তি হতে ইচ্ছা থাকে আমার কথামত এগিয়ে এস। অন্যথায় এ ব্যাপারে হাত বাড়ানো উচিত নয়।

নিত্য সংযমী ও আত্মজয়ীকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না

আজ ২৮শে অক্টোবর/১৯৯৬ ইংরেজী সোমবার ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্ম-দেশনা দিচ্ছিলেন। যারা নিত্য সংযমী ও আত্মজয়ী তাদেরকে দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউ পরাস্ত করতে পারে না। সংযম কি? শীল সংযম, ইন্দ্রীয় সংযম, আত্ম সংযম, চিত্ত সংযম ও ভোজনে মাত্রা জ্ঞান। সর্বদা যারা জাগ্রত অবস্থায় থাকে তাদের পরিহানি হয় না। অর্থাৎ সব সময় স্মৃতিতে বলীয়ান থাকা। দারোয়ান যেভাবে পাহাড়া দেয় সেভাবে অকুশলকে (স্মৃতি দ্বারা) পাহাড়া দেয়াকে স্মৃতি বলে। মিথ্যাকে ত্যাগ করতে করতে মিথ্যা আর থাকে না। অজ্ঞানতাকে ত্যাগ করতে

করতে অজ্ঞানতা আর থাকে না। হিংসাকে ত্যাগ করতে করতে হিংসা আর থাকে না। লোভকে ত্যাগ করতে করতে লোভ আর থাকে না। আসক্তিকে ত্যাগ করতে করতে আসক্তি আর থাকে না।

তিনি বলেন-যারা জ্ঞানী তারা (বৃদ্ধকালে) অর্হৎ হতে পারে। যারা অজ্ঞানী তারা মুর্খ ও চামচের মত। যেমন চামচ তরকারী বা মিষ্টান্নে থাক্‌লেও, তরকারী বা মিষ্টান্নের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। তেমন অজ্ঞানী ব্যক্তিও সারা জীবন জ্ঞানী ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকেও জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তি জিহ্বার মত। জিহ্বাতে মিষ্টি পরার সংগে সংগে মিষ্টির আস্বাদ অথবা যে কোন দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সে রকম কোন কথা শুনা মাত্র তার যথার্থ অর্থ গ্রহন করতে সমর্থ হয়। সুতরাং তোমরা চামচের মত না হয়ে জিহ্বার মত হও।

তিনি বলেন-যাদের সৎজ্ঞান থাকে তারা স্ত্রী-পুরুষ অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসার করাকে স্বপ্নের মত দেখে। রাত্রে ঘুমানোর সময় মানুষ কত কিছুই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সকালে তা কিছু থাকে না। সেরকম সংসার করলে শুধু নানাবিধ ঝামেলায় পড়তে হয়। আর যে কোন দিন হঠাৎ স্ত্রী মরতে পারে, পুত্র-কন্যা মরতে পারে অথবা নিজেও মরতে পারে। সংসার কখন কিভাবে ভেংগে যায় তার কোন সঠিক সময় নেই। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তিরা সংসারের বিবিধ দোষ দেখে সংসার জালে আবদ্ধ হয় না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-অবিদ্যাতে বিদ্যা উৎপত্তি করতে পারলে যাবতীয় দুঃখ গুলি ধ্বংস হয়। গাছের শিকড় সমূলে তুলে ফেলতে পারলে যেমন গাছটি ধ্বংস হয়, তেমন অবিদ্যাকে সমূলে তুলে ফেলতে পারলে সর্ব দুঃখ ধ্বংস হয়। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান অর্থাৎ পঞ্চ স্কন্ধ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, অসূচী ও দুর্গন্ধ বললে আর তাদের সাথে থাকতে পারে না বা তাতে আসক্তি উৎপন্ন হয়না। এগুলি ভালভাবে বুঝলে নির্বাণ লাভ করতে সহজ হয়।

তিনি বলেন- আমি অনেক ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিয়েছি। যেমন বৃদ্ধদেরকে দিয়েছি, যুবকদেরকে দিয়েছি, কিশোরকেদিয়েছি। উচ্চ শিক্ষিতদেরকে দিয়েছে, অর্দ্ধ শিক্ষিতদেরকে দিয়েছি এবং অশিক্ষিতদেরকে ও প্রব্রজ্যা দিয়েছি কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রব্রজ্যা ছেড়ে চলে যায়। তাদের

জ্ঞান নেই বলে চলে যেতে বাধ্য হয়। যাদের পূর্ব জন্মের পারমী থাকবে, ইহজর্ন্মের দৃঢ় প্রচেষ্টা থাকবে এবং নিজ জ্ঞান দিয়ে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করবে তারা নিশ্চয়ই নির্বাণ পথের যাত্রী হতে পারে। চারি আর্যসত্য জ্ঞান যত দিন চিত্তে উদয় না হবে ততদিন বুদ্ধজ্ঞান লাভ হবে না। বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করার এখনও সময় আছে। বর্তমানে ২৫৪০ বুদ্ধাব্দ চলছে। ভগবান বুদ্ধের ধর্মের আয়ু পাঁচ হাজার বৎসর। যারা উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত প্রচেষ্টা চালাবে তারা নিশ্চয়ই বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-জনৈক ব্যক্তি এক নগ্ন সন্ন্যাসীকে অর্হত মনে করত। তার দৃঢ় ধারণা ছিল উক্ত নগ্ন সন্ন্যাসী লোভ, দ্বেষ মোহ শূন্য। এ ধারণাটি ভগবান বুদ্ধকে অবহিত করা হলে বুদ্ধ বলেন-এক সপ্তাহ পরে নগ্ন সন্ন্যাসীর মারা যাওয়ার পর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ঠিক এক সপ্তাহ পরে উক্ত সন্ন্যাসী মৃত্যুর পর অসুর হয়েছে বলে জনৈক ব্যক্তিটির নিকট পরিচয় দেয়। অতএব উক্ত ব্যক্তি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবন করে মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা পাপকে লজ্জা করে, ভয় করে এবং ঘৃণা করে তারা অর্হৎ হতে না পারলেও অনাগামী পর্যন্ত লাভ করতে পারে।

তিনি বলেন- নারী পুরুষ সকলে নির্বাণ বা মুক্তি চায়। কিন্তু অর্দ্ধ পথে পথভ্রষ্ট হয়ে পিছন দিকে ছুটে চলে যায়। তোমরা যত তাড়াতাড়ি পার তৃষ্ণাক্ষয় করে নির্বাণ যাও। না হয় ভবিষ্যতে মহা দুঃখ পাবে। ভবিষ্যতে যে সময় আসছে তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করবে। এ সুবর্ণ সুযোগ হেলায় কাটাও না। আমি তোমাদেরকে দেখলে আমার খুব লজ্জা লাগে। চাক্‌মা, বড়ুয়া ও মার্মারা গরীব, যথাযথ শীল পালন করলে গরীব অবস্থা থাকে না। শীল পালনে ধনী হয়। ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়। শীল পালন করে মরণের পর স্বর্গে চলে যাও। তবুও (এসব যাবতীয়) দুঃখ ভোগ কর না। তোমাদেরকে সতর্কতা দিচ্ছি। অনেকে ক্ষমতার লোভ করে, জায়গার লোভ করে এবং কেউ নারীর লোভ করে। আবার কেউ রাজশক্তি ব্যবহার করে, কেউ জনশক্তি ব্যবহার করে এবং কেউ অস্ত্রশক্তি ব্যবহার করে নিরীহ লোককে দাবিয়ে নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। তোমরা সাবধানে থাক ও হুশিয়ারে থাক। সাবধান ও হুশিয়ার অর্থ হল নিত্য সংযমী ও আত্মজয়ী। তাদেরকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না। ধর্মচারীকে ধর্মে রক্ষা করে। এ বলে আমার দেশনা এখানে শেষ করলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভদন্ত সাধনানন্দ মহাথেরো (বনভন্তে)

প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির

পালি সুত্ত পিটকের 'থের গাথা' নামক গ্রন্থের বঙ্গীস থেরো ছিলেন বঙ্গজাত সন্তান। বুদ্ধ সমকালে বুদ্ধের আশিজন মহাশ্রাবক শিষ্যের অন্যতম ছিলেন তিনি। রাজশাহীর মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত মহামতি সম্রাট অশোকের শিলা লিপি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, বুদ্ধের মৌলিক মতবাদের বাহক থেরবাদ বুদ্ধ সমকাল বা তৎপরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এতদঞ্চলে সবিশেষ প্রচার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আমার বয়স যখন চার কি পাঁচ বছর, সেই শৈশব থেকে যৌবনের উষালগ্ন পর্য্যন্ত আমাদের পারিবারিক জীবনে ধর্মীয় পরিবেশের স্মৃতি এখনো খুব ভালোভাবেই মনে আছে। বুদ্ধের ছবির পাশাপাশি লক্ষ্মী, স্বরসতী, গণেশ, দুর্গা, শিব-এসবেরও স্থান ছিল এবং সকলেই সম মর্যাদায় পূজিত হতো। সকাল-সন্ধ্যায় ধূপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে নিত্য কর্তব্য-জ্ঞানে পাঠ করা হতো রামায়ন আর মহাভারত। কেবল ছোট ছাদাং বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, বড় ছাদাং বা প্রবারণা পূর্ণিমা এবং কঠিন চীবর দান এসকল গুটিকয় অনুষ্ঠানই বিহারে। আমার মা-বাবারা এসব অনুষ্ঠানে বিহারে যেতেন কেবল কিছু ধূপ, বাতি জ্বালানো, পঞ্চশীল গ্রহণ এবং কয়েক মিনিট ধর্মদেশনা শ্রবণের জন্যে। বাড়ীর এবং পাড়ার কিছু বৃদ্ধ নর-নারীকে দেখতাম বর্ষাবাস ব্রতের তিনমাসে প্রতি অমাবস্যা, অষ্টমী, পূর্ণিমা তিথিতে বিহারে গিয়ে অষ্টশীল উপোসথ ব্রত পালন এবং অপরাহ্নে বিহারে বসে বুদ্ধ-জাতক অবলম্বনে রচিত কিছু পুঁথি পাঠ শ্রবণ করতো। আমাদের বাড়ীতে প্রতি সপ্তাহে বা পনেরো দিনে ব্রাহ্মণ ও বৈরাগীদের নিয়মিত আগমন হতো। বৈষ্ণব বৈরাগীরা একতারা আর খঞ্জনী বাঁজিয়ে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার গান শুনাতেন। জন্ম-কোষ্ঠী আর পঞ্জিকার পাতা উল্টায়ে ব্রাহ্মণেরা গ্রহদোষের বিধান দিতেন। বাড়ীর বৌ-ঝিরা এই ব্রাহ্মণের নির্দেশিত বিধান মতেই মঙ্গলবারে মঙ্গলঘট, সকাল-সন্ধ্যায় সোনা-রূপা ধোয়া জল ছিটায়ে

এবং গোবর দিয়ে ঘরের দরজা লেপন করে নিয়ত বাড়ীর পবিত্রতা বজায় রাখতেন। বিবাহিত মহিলার কপালে সিঁন্দুর, হাতে শঙ্খ স্বামীর পরমায়ূ বর্ধনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। বড়ো রকমের কোন বিপদ বা গ্রহদোষ দেখা দিলে ব্রাহ্মণের বিধানমত ফারা কাটার জন্যে ছয়গ্রহ শান্তির তাবিজ নেওয়ার প্রথা বাড়ীতে ছিল। শনিপূজার আয়োজন হতো বিশেষ আড়ম্বরে। বাড়ীতে গাভীর বাছুর হলে প্রথমে দুধ দোহন করে নির্দেশ দেয়া হতো গ্রামের বিহারের বোধিগাছের গোড়ায়, সেবা খোলায় (মা মগধেশ্বরীকে) এবং গ্রাম সীমার মিঠাছড়ায় (ছোটখাল) কিছু ঢেলে দিয়ে বাকী সবটুকু নিকটবর্তী হাটহাজারী বাজারের কালিমন্দিরে দিয়ে আসতো। বাংলা বছরের শেষ সপ্তাহে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে জাগ্‌দান (পুরাতন বছরের রোগ-ব্যাধি, অভাব-অনটন, আপদ-বালাই সব দূর হয়ে সমাগত নববর্ষে সর্ব সুখ প্রাপ্তির কামনায় নানা ধরণের বনজ লতা-গুল্ম পোড়ানো) আর খই-লাবন-পাঁচন খাওয়ার উৎসব, পৌষের হাড়কাঁপানো শীতে পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে লেখা-পড়ায় পারদর্শীতা লাভের উদ্দেশ্যে বিদ্যাদেবী স্বরসতী পূজার প্রসাদ খাওয়া, ধনলাভের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীপূজার প্রসাদ খাওয়া, দৈব-দুর্বিপাক খন্ডনে শনিপূজার প্রসাদ খাওয়া, পুত্রলাভ কামনায় কার্ত্তিক পূজার প্রসাদ খাওয়া। মানত্ সিদ্ধিতে সেবা খোলায় পান তেল পূজার প্রসাদ খাওয়াতে শিশু মনের যে প্রবল আকর্ষণ আর উল্লাসের স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশ পেতো। সে সবের পাশাপাশি বিহার ভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলোতে শ্রীলংকা হতে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা প্রাপ্ত আমাদের জোবরা সুগত বিহারের অধ্যক্ষ উপ-সংঘরাজ ভদন্ত গুণালংকার মহাস্থবির মহোদয় উপস্থিত নর-নারীকে যাগু, পিঠা, মিষ্টান্ন, খই, লবণ, আঁখ, নারিকেল, কলা ইত্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা যদি না করতেন, শুধু আমরা ছোটরা কেন, যুবা-প্রবীনদের অনেকেও বিহারে আসার আকর্ষণ বোধ করতেন কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ সে সময় পর্যন্ত এদেশের বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজকে একদিকে টান্‌ছিলেন ভিক্ষুরা, আর অপরদিকে টান্‌ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণেরা। পার্বত্য অঞ্চলের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থাও ছিল বেশ নাজুক। চাক্‌মা সমাজ হতে প্রব্রজ্যার্থীর সংখ্যা নেই বল্‌লেও চলে। মারমা সমাজে ভিক্ষু হওয়ার প্রবণতা থাকলেও প্রতিবেশীদের নিকট তাদের ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। বড়ুয়া সম্প্রদায় হতে তেমন কোন ধর্ম-বিনয়ে সুশিক্ষিত সংস্কারক ভিক্ষুর পদ্‌চারণা চাক্‌মা সমাজে ছিল দুর্লভ। স্বীয়

ধর্মগুরুদের এমন বেহাল অবস্থায় এদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় হৃদয় প্রায় বারো আনা দখল করে রেখেছিলেন হিন্দু ধর্মযাজক ব্রাহ্মণেরা।

উপরোক্ত এই সংক্ষিপ্ত সমাজ চিত্র হতে সহজেই অনুমেয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আরকানের সংঘরাজ সারমেধ এদেশে কোন ধরণের আচার আর ধর্ম-বিশ্বাসে নিমগ্ন বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছিলেন। প্রিয় সদ্ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠাকামী এবং বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মহাবিভ্রান্তি দর্শনে কাতর সারমেধ, তাই সেদিন কৃতসংকল্প হয়েছিলেন এদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ও সমাজের সংস্কার সাধন করতে। তিনি তার কৃত সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সেসব ছিল অত্যন্ত দূরদৃষ্টিপ্রসূত, প্রাজ্ঞ এবং সুপরিকল্পিত। তাই-

১। তিনি দলে দলে আরকান থেকে ভিক্ষুসংঘকে এদেশে আনার পরিবর্তে এমাটির সন্তান যারা অশিক্ষা-কুশিক্ষার কারণে বিপথগামী হয়ে ধর্ম ও সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেই সেই রাউলী বা লুরি সম্প্রদায়কে স্বধর্মের সম্যকমার্গে ফিরায়ে আনার পদক্ষেপ নিলেন।

২। এদেশের নব প্রব্রজ্যার্থী ভিক্ষু শ্রমনদেরকে দীক্ষা ও ধর্ম বিনয়ে শিক্ষাদানের জন্যে নিকটবর্তী অথচ ভিন্ন পরিবেশ আরকানে দলে দলে প্রেরণ না করে চাক্‌মা রাণী কালিন্দীদেবীকে প্রভাবিত করে রাঙ্গুনীয়ার রাজা নগরে ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠা করলেন এবং মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামে ভিক্ষু-শ্রমনদের ধর্ম বিনয় শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেন।

৩। চাক্‌মা রাণী কালিন্দী দেবীসহ এদেশের তৎকালীন প্রভাবশালী ভিক্ষু, গৃহীকে স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করে একই সাথে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বিজয় যাত্রা শুরু করেছিলেন।

৪। আরকানে প্রস্থানের প্রক্কালে জ্ঞানলঙ্কার, পূর্নাচার প্রমুখ এদেশের মৃত্তিকাজাত সুযোগ্য উত্তরসূরীদের হাতেই তিনি সদ্ধর্ম শাসনের দায়িত্বভার হস্তান্তর করে গেলেন।

পরম সৌগত সূর্য সংঘরাজ মারমেধ-এর পরিকল্পিত কর্মপথে আচার্য পূর্ণাচার মহাথেরো প্রমুখ সুযোগ্য দক্ষ উত্তরসুরীগণ স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে এদেশের বৌদ্ধ সমাজকে ধর্মে, বিনয়ে, শিক্ষায়, সভ্যতায় বলতে গেলে নব জীবনের প্রাণ-প্রাচুর্যে যেভাবে ভরে তুলেছিলেন তা অর্ধপথে

এসেই যেন হঠাৎ করে থেমে গেল। সংঘরাজ সারমেধ হতে শুরু করে তৎপরবর্তী দুই প্রজন্ম অর্থাৎ উনাইন পুরার জ্ঞানীশ্বর, কর্ত্তলার বংশদীপ, জোবরার গুনালংকার, রেঙ্গুনের প্রজ্ঞালোক, কলিকাতার কৃপাশরণ ও আচার্য ভগবান চন্দ্র পর্যন্ত এদেশের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার যেরূপ বেগবান ছিল তা পরবর্তীকালে কেবল স্তিমিত হয়ে পড়েনি, এক নিম্নগামী ভিন্নমোড় পরিগ্রহ করে। পরবর্তী ভিক্ষুদের জীবন দৃষ্টি ও দৈনন্দিন জীবনাচার পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহকে এই নিম্নগামীতার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১। যেই মুখ্য উদ্দেশ্য তথা শীল-সমাধি ও প্রজ্ঞা সাধনার জন্যেই ভিক্ষু জীবন গ্রহণতাকে গৌণ করে দায়ক প্রভাবিত বিহার ভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব জীবনে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা।

২। ত্রিপিটক তথা বুদ্ধবচন শিক্ষা ও গবেষণাকে গৌন করে গৃহী জীবিকাসুলভ প্রবৃত্তি বশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন এবং শিক্ষকতারূপ চাকুরী লাভের প্রবণতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করা।

৩। ভিক্ষু ও গৃহীদের বুদ্ধ ধর্মানুকূল জীবন গঠনে বিহারগুলোকে আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে রূপদানের প্রয়াস বাদ দিয়ে খৃষ্টান ধর্মাদর্শের অনুকরণে অনাথাশ্রমী প্রথা চালু করণ প্রবণতা।

৪। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত দ্রুত পট্‌পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মতো ধর্ম-সম্প্রদায় ভিত্তিক দেশে বুদ্ধধর্মাদর্শকে কিভাবে সমাজে সঠিক প্রয়োগ সম্ভব তা নিরীখে গবেষণামূলক উপায় উদ্ভাবনে দারুন মেধাশূন্যতা।

৫। বুদ্ধের নীতি আদর্শ আড়াই হাজার বছরের পুরানো। আজকাল তা পুংখানুপুংখ অনুসরণ, অনুশীলন অসম্ভব। যারা তা করতে চায় তারা মৌলবাদী, গোঁড়া অতীতমুখো, প্রগতি বিরোধী আর প্রতিক্রিয়াশীল। এসকল নানা মুখরোটক বাক্য সর্বস্বতা ভীরুতা ও বিকৃত রুচি প্রবণতাকে অযৌক্তিক ও অহেতুকী প্রশ্রয় দান।

বাংলাদেশে বুদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতির বর্তমান এই প্রেক্ষাপটে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আবির্ভাব এবং তার জীবন দর্শনের উপর আলোচনা

করতে গেলে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন- (১) ধর্মীয়, (২) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক (৩) সামাজিক (৪) অর্থনৈতিক ও (৫) রাষ্ট্রনৈতিক।

দুঃখিত যে, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে ভূরিপ্রাজ্ঞ পরম আর্য পুরুষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সমকালিন ধর্মচিন্তার দিকটা মাত্র এখানে তুলে ধরা হলো। পরবর্তীতে তাঁর জীবন ও সামগ্রিক উপলব্ধিকে এদেশের ধর্ম ও সমাজের দিক নির্দেশনার কল্যাণে প্রকাশের আশা রাখি।

বনভন্তের ধর্মীয় জাগৃতিঃ- স্কুল ছাত্র অবস্থাতেই তার প্রবল আগ্রহ জাগে নানা ধর্ম প্রবক্তা আর কবি, বৈজ্ঞানিকদের জীবনী চরিত্র পাঠ করা। তিনি প্রবল আগ্রহ ভরে এদের অনেকেরই জীবনী, রচনা ও আবিষ্কার কাহিনী পাঠ করেন। তার পিতা বলতেন ধর্মের মধ্যে যদি কিছু থাকে, তবে হিন্দু ধর্মের মধ্যেই আছে। এ ধর্মে অনেক শ্রেষ্ঠ সাধু সন্যাসী আছেই। সেখানে হরি সাধনা করে অনেকেই প্রভূত আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়েছেন। বৌদ্ধধর্মে তো এ'যাবত কাকেও কিছু লাভ করতে দেখলাম না। সত্যি বলতে কি তৎকালীন চাক্‌মা সমাজে হরি সাধনা চলতো এবং অনেক সিদ্ধ হরিসাধকের সন্ধানও মিলতো। তারা কেবল বুদ্ধকে বিশ্বাস করতো কিন্তু তার ধর্ম ও ভিক্ষুদের প্রতি তেমন কোন আস্থা ছিল না। প্রবল অনুসন্ধিৎসু বনভন্তে যখন দেখতে পেলেন অনেক বড়ো বড়ো উচ্চ ডিগ্রীধারী পন্ডিত ব্যক্তিরাও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে অনেক আলোচনা গবেষণামূলক বই লিখছেন, এখন তার বিশ্বাস হলো নিশ্চয় এধর্মে সার-সত্য কিছু আছে। পাহাড়তলী মহামুনি স্কুলের জনৈক বড়ুয়া হেডমাষ্টার কর্তৃক লিখিত 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ নামক কীর্ত্তনের বইটি পড়ে, তার বিষয় বর্ণনার মর্মস্পর্শী ভাবগাম্ভীর্য তার হৃদয়কে দারুণভাবে নাড়া দেয়। সংসার ত্যাগের বৈরাগ্য বীজ তার হৃদয় ভূমিতে উপ্ত হলো সেই থেকেই। প্রব্রজিত হলে মা বাবা থেকে শুরু করে সকল জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠদের প্রণাম গ্রহণ করতে হয়-এই রীতিকে চাক্‌মারা মহাপাপ মনে করতো। এই ভয়েই অনেকের ইচ্ছা থাকলেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতো না। বনভন্তের যখন ভরা যৌবন তখন তিনি রাঙ্গামাটিতে বিরাজ মোহন দেওয়ানের তেলের ডিপোতে কাজ করতেন। ধর্ম প্রসঙ্গ ছাড়া অন্যকোন কথালাপ তারমুখে শোনা যেতনা বিধায় দাদু সম্পর্কের বিরাজ মোহন বাবু তাকে পাগল বলে ডাকতেন। কিন্তু, তার সচ্চরিত্র আর সাধুতার জন্যে রাঙ্গামাটির জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট তিনি শ্রদ্ধা ও

ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। পটিয়া থানার নাইখাইন নিবাসী গজেন্দ্র বড়ুয়া নামে এক ডাক্তার রিজার্ভ বাজারে ঔষধের দোকান করতেন। পূর্বে বার্মায় বসবাসকারী এই ধার্মিক লোকটির সাথে তার খুবই সখ্যতা ছিল। যুবকের জ্ঞান-পিপাসা এবং বৈরাগ্য চেতনা লক্ষ্য করে ডাক্তার বাবু প্রায় তাঁকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন। সংসার জীবনের অসারতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করানোর জন্যে অনেক সময় এই ডাক্তার স্বীয় স্ত্রীর উদ্যত স্বভাব, রুক্ষা ব্যবহার অত্যন্ত নিকট থেকে দেখার সুযোগ দিতেন। পুরুষের প্রতি নারীর ব্যবহার সম্পর্কে বনভন্তে বলেন, গৃহীকালে আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি নারী জাতির আসল সত্য স্বরূপ। আমি অতিকাছে থেকে চাক্‌মা রমনীকে যেমন প্রত্যক্ষ করেছি, তেমন প্রত্যক্ষ করেছি বড়ুয়া আর মুসলিম রমনীকেও। কোন ইতর বিশেষ খুঁজে পাইনি এসকল রমনী চরিত্রে। এসব দেখে শুনেই প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা দিন দিন বাড়তে থাকে তাঁর হৃদয়ে।

ডাক্তার গজেন্দ্র বড়ুয়াসহ পরামর্শক্রমে একদিন উভয়ে রাঙ্গামাটি হতে এলেন চট্টগ্রাম শহরে। উদ্দেশ্য তৎকালীন সময়ের বি.এ. পাশ ভিক্ষু, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ এবং বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের উপর ব্যাপক জ্ঞানার্জন করা। বিহারে যাওয়ার প্রাক্কালে গজেন্দ্র বাবু তাঁকে নিয়ে শহর ঘুরে বেড়াতে বের হলেন। এক পর্যায়ে তিনি এক বিলাস বহুল ভবন দেখিয়ে বল্‌লেন এই বাড়ীটা এক ধনী মাড়োয়ারীর। তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় আছে। তিনি বহুদিন ধরে খোঁজ করছেন একজন সৎ নিষ্ঠাবান পাহাড়ী লোক-রাঙ্গামাটিতে তার ব্যবসায়কে সম্প্রসারিত করতে। প্রয়োজনে তিনি অংশীদারিত্বে ও ব্যবসা করতে ইচ্ছুক। যদি তুমি রাজি থাক্ এক্ষণে তোমাকে নিয়ে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। এই মুহূর্তে গজেন্দ্র বাবুর মুখে এমন একটি খাপ্‌ছাড়া প্রস্তাব অভিনয় মাত্র নহে প্রমাণের পর যুব মন ক্ষণিকের জন্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। একজন ধনশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়ার স্বপ্নে। কিন্তু পরক্ষণেই আপন মনে লাজ্জিত হলেন নিজেকে ধিক্কার দিলেন, যুবরাজ সিদ্ধার্থের বিশাল বিত্ত ভোগৈশ্বর্যকে মিথ্যা, অসার, তুচ্ছবৎ ত্যাগের কথা স্মরণ করে। অবশেষে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের ন্যায় ঊনত্রিশ বছরের ভরা যৌবনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন দুঃখ মুক্তির এক বিলাশ আশা বক্ষে ধারণ করে। নাম হলো সাধনানন্দ।

পূর্ব হতেই তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন প্রব্রজ্যা নিয়ে বুদ্ধ সমকালিন প্রব্রজীতের ন্যায় সর্বত্যাগী জীবনের আস্বাদনই উপভোগ করবেন। তাই তিনি প্রতিদিন মোগলটুলি বড়ুয়া পাড়ায় গিয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে জীবন যাপন করতেন। টাকা-পয়সার স্পর্শ বিরতিসহ প্রব্রজিতের দশশীলকে অতি বিশুদ্ধরূপে প্রতিপালন করতেন। পিন্ডাচারণ করতে যাওয়ার পথে একদিন কলেজগামী যুবতীকে দেখে চিত্তে বিতর্ক উৎপন্ন হলে তিনি বিহারে এসে বুদ্ধ বিম্বের সম্মুখে করজোড়ে সে-কি ক্ষমা প্রার্থনা! মনে মনে লজ্জিত হলেন, ধিক্কার দিলেন নিজেকে। তারপর তিনি বেতাগী বন বিহারে অবস্থানরত আনন্দমিত্র মহাস্থবির সহ অনেক খ্যাতনামা ভিক্ষুর নিকট গেলেন। চিৎ মরমের পরলোকগত বুড়ো ভন্তে শেষ পর্য্যন্ত বললেন, 'ভালা ঠাকুর এখন নাই। আমিও পরিষ্কার নই। তুমি কেঁদে কেঁদে মরলেও এদেশে ভালা ঠাকুর পাবে না'। অতএব, প্রচলিত ভিক্ষু জীবনে কাকেও জীবন চলার পথ প্রদর্শক হিসেবে না পেয়ে একমাত্র বুদ্ধ, সারিপুত্র, মোদ্‌গলায়ন, মহাকশ্যপ, আনন্দ প্রমুখ মহাশ্রাবকগণকে আপন গুরু হিসেবে বরণ করে নিয়ে একদিন কাপ্তাই অঞ্চলের ধনপাতা নামক গহীন অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সাথে নিলেন গুটিকয় ধর্মগ্রন্থ।

একনাগাড়ে বারোটি বছর ধরে চল্‌লো তার সাধনা। বুদ্ধেরই মতো রোদ, বৃষ্টি (ঝড়), শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার প্রকোপ, বিষাক্ত কীট্ আর জোঁক, মশার দংশন, দিনে-রাতে ভয়াল সর্প, বাঘ-ভল্লুক, বন্য হাতির পদচারণ, দেব দানবের কুসংস্কার জাত ভয়-ভীতি। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামচ্ছন্দ, তন্দ্রালস্য, চিত্ত-বিক্ষিপ্ততা প্রভৃতি সবকিছুকে তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা জানতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন। ইহা দুঃখ। সেই দুঃখের কারণ এই। দুঃখটির স্বভাব নিরোধ ধর্মী বা দুঃখটি জানতে পারায় দুঃখটি চিত্ত হতে সরে যাচ্ছে। পুনঃ পুনঃ সেই দুঃখের উদ্ভব বন্ধ করার জন্য আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ রূপী জীবন গঠনই উত্তম উপায়। এভাবেই তিনি বুদ্ধ আবিষ্কৃত চারি আর্য্য সত্য এবং প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিকে আপন প্রতিটি চিত্ত উৎপত্তিতে, দেহ-মনের প্রতিটি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় দর্শনের চেষ্টা করলেন। সদা জাগ্রতভাবে তার এই দর্শন ও উপলব্ধির অবিরাম চেষ্টায় জীবন মরণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন তিনি। দীর্ঘ বারোটি বছরের একটানা সেই প্রয়াস জাত উপলব্ধিসমূহ ক্রমে তাঁর কাছে অভ্যাস ও দৃঢ় বিশ্বাসে রূপ নিল। এই জানা, এই বুঝা, এই বিশ্বাস ও

অভ্যাস তাঁর সামগ্রিক উপলব্ধিকে পরবর্তী কালে কোন ধরণের জীবন দৃষ্টি দান করলো তা নিম্নের কয়েকটি উক্তি থেকে সহজেই অনুমেয় ।-

১। একটি আলমিরা তৈরী করতে যেমন করাত, হাতুড়ি, রন্দা, বাইশ, বাটালী প্রভৃতি বহু প্রকার হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়, ঠিক একইভাবে বুদ্ধ প্রজ্ঞাপিত নির্বাণস্তরে চিত্তকে উন্নীত করতে হলে প্রয়োজন হবে বুদ্ধ নির্দেশিত সকল প্রকার ধ্যান পদ্ধতি। একটি মাত্র হাতিয়ার দিয়ে যেমন আলমিরাটি তৈয়ার করা অসম্ভব, তেমনি বুদ্ধ নির্দেশিত একটি মাত্র ধ্যান পদ্ধতির অভিজ্ঞতা দিয়েও নির্বান লাভ অসম্ভব। আলমিরা তৈরীতে যেমন যখন যেই হাতিয়ার প্রয়োজন সেই হাতিয়ারকে যথাস্থানে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে হয়, ঠিক একই ভাবে বহু অসংখ্য সংস্কার পুঞ্জ এই দেহ মন বা নামরূপকে দর্শন করতে হলে, জানতে হলে, বুঝতে হলে অবিদ্যা, তৃষ্ণা তাড়িত চিত্তবৃত্তি সমূহকে যখন যেই ধ্যান পদ্ধতি প্রয়োগে দমন, মূল উৎপাটন করা সম্ভব তখন সেই ধ্যান পদ্ধতিরূপ হাতিয়ারকে অবশ্যই দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন-চিত্ত যখন কামভাব দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন কায়গতানুস্মৃতি অথবা দশ অশুভ ভাবনা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। চিত্ত যখন দ্বেষভাব দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন দক্ষতার সাথে মৈত্রী ভাবনা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। ঠিক এভাবে ধ্যানীকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং দক্ষতার সাথে প্রয়োগ কৌশল শিক্ষা করতে হবে বুদ্ধ প্রজ্ঞাপিত শমথ বিদর্শন ধ্যান পদ্ধতিরূপ হাতিয়ার সমূহের।

২। তৃষ্ণাক্ষয় করতে পারলে এত বিশাল ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন কি ? বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুরা যে অরহত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন তারা কি এত সূত্র, এত বিনয়, এত অভিধর্মকে আয়ত্ব করেছিলেন? অধর্মবাদী লোভ, দ্বেষ, মোহযুক্ত ভিক্ষুদের জন্যেই-তো সঙ্গায়ন হলো, বুদ্ধকেও বিনয়-পিটকে সংগৃহীত এত খুঁটি-নাটি বিনয় বিধান প্রজ্ঞাপিত করতে হলো।

৩। পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ আর্য্যসত্য জ্ঞাত হও। অবিদ্যা, তৃষ্ণা রূপ সমুদয় আর্যসত্য ত্যাগ কর। নির্বানরূপ নিরোধ আর্যসত্য প্রত্যক্ষ কর। শমথ-বিদর্শন রূপ মার্গসত্য ভাবনা কর। তাতেই নির্বাণ।

৪। পরিস্কার পানিতে তলদেশের মাছ, শামুক, কাঁকড়া প্রভৃতি যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি চিত্ত শমথ-বিদর্শন ভাবনা দ্বারা নীবরণ মুক্ত হয়ে

পরিষ্কার হলে-দুঃখ কি? সেই দুঃখের কারণ কি? ইহার স্বরূপ কি এবং কোন পথে এই দুঃখ চিরতরে নিরুদ্ধ করা সম্ভব তা সম্যক্‌ভাবে জানা যাবে, বুঝা যাবে, সম্যকভাবে আয়ত্ব বা অধিগম করা সম্ভব হবে। ঘোলা জলে যেমন কিছুই দেখা যায় না, তেমনি অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ এসব চিত্তকে সমসময় ঘোলা রাখে বলেই লোকে অধর্মকে ধর্ম, ধর্মকে অধর্ম, অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য, সুখকে দুঃখ, দুঃখকে সুখ এমন সব বিপরীত ধারণা পোষণ করে।

৫। তোমার চিত্ত সত্যপথে যাচ্ছে না মিথ্যা পথে যাচ্ছে, কুশল পথে যাচ্ছে না অকুশল পথে যাচ্ছে তা অবশ্যই জানতে হবে। নির্দয় রাজা, প্রবল শত্রু, বনের বাঘে যত ক্ষতি করতে পারে তদ্‌পেক্ষা বহু বেশী ক্ষতি করে থাকে মিথ্যা পথগামী চিত্ত। মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব যত উপকার করতে পারে, সত্যপথগামী কুশল চিত্ত তদ্‌পেক্ষা বহু বেশী উপকার করতে পারে।

৬। চারি আর্য্যসত্য, প্রতীত্য সমুৎপাদ হল নিজ ধর্ম। মার্গফল, নির্বাণ হল নিজধর্ম। চারি আর্যসত্য জ্ঞান, প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি জ্ঞান, মার্গফল জ্ঞান, নির্বাণজ্ঞান হল নিজ কর্ম। এসবের বাইরে যত ধর্ম-কর্ম সবই হল পরধর্ম, পরকর্ম।-'আমি নিজধর্ম করব, নিজকর্ম করব। পর ধর্ম, পর কর্ম বা কাজ ত্যাগ করব'-এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর। সংগ্রাম ছাড়া নির্বাণ লাভ হয় না। তোমাদের প্রথম যুদ্ধ হবে মেয়ে-পুরুষ পরষ্পরে অর্থাৎ কাম-ভাবের সাথে। দ্বিতীয় যুদ্ধ হবে স্কন্ধ মার, ক্লেশ মার, অভিসংস্কারমার এবং দেবপুত্র মারের সাথে। তৃতীয় যুদ্ধ হবে আত্মা,-আমিত্ব বা অহংকারের সাথে।

৭। অজ্ঞানীর মাংস বাড়ে কিন্তু প্রজ্ঞা বাড়ে না। হালকর্ষণ না করলে যেমন ক্ষেত্র হয় না, তেমনি ভাবে ভাবনা না করলে জ্ঞান হয় না। অজ্ঞানীই সর্বদা এটা আমার, ওটা আমার করে করে মরে।

৮। লোভই মহাব্যাধি, সংস্কার অর্থাৎ অবিদ্যা-তৃষ্ণা জাত নানা অভ্যাস-পরম দুঃখ। ইহা যথার্থ রূপে যারা জানে তারাই পণ্ডিত। আর তারাই নির্বাণ দর্শনে সক্ষম।

৯। অবিদ্যা সর্বদা নানা মত, নানাপথ চিত্তকে প্রদর্শন করে। তাই বুদ্ধ কিছুই অনুসন্ধান করেননি। তিনি শুধু চেয়েছেন দুঃখ-নিরোধ আর সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। চারি আর্যসত্য হলো দুঃখের ক্ষয় বা নিরোধ জ্ঞান এবং প্রতীত্য সমুৎপাদে জ্ঞান হলো সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। বুদ্ধের এই অনুসন্ধানের বাইরে ভিক্ষুদের পক্ষে অন্য যে কোন বিষয় অনুসন্ধান করা বা নানা বিষয় শিক্ষা করা অন্যায় ও অশোভন।

১০। শীল সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান আর সদা জাগ্রত ভাব-ভিক্ষু এই চারি গুণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সে ভিক্ষুর নির্বাণ লাভ অনিবার্য। পাপে লজ্জা, পাপে ভয় থাকলে ব্রহ্মচর্য শীল দৃঢ় হয়। এতে অনাগামী ফল পর্যন্ত লাভ হয়।

১১। ভিক্ষুরা তৃষ্ণা ক্ষয় করলে, লাভ সৎকারের প্রত্যাশী না হলে আমার ন্যায় ভোগ্যবস্তুর অভাব তাদের কখনো হবে না। বর্তমানে ভিক্ষুরা ধর্মানুধর্ম আচরণ করছে না বলেই তাদের উপর দায়কদের বিশ্বাস নেই। তাই বহু দায়ক-দায়িকা আজকাল অশ্রদ্ধাবানে পরিণত হচ্ছে অধর্মচারী ভিক্ষুদের কারণেই। মানুষ কি বেকুপ যে, তুমি শীলবান, চরিত্রবান, ধ্যানী না হয়ে কেবল পালি শ্লোক আওড়ায়ে পণ্ডিতালী দেখালেই তারা তোমাকে বিশ্বাস করবে? বস্তুতঃ ধর্মানুধর্ম জীবন গঠনই ভিক্ষুদের জন্য আসল কর্তব্য। বিপথগামী সমাজ সেবা নহে।

১২। কামাতুর হলে নির্বাণ লাভ অসম্ভব। কাম ত্যাগ, রূপ ত্যাগ, বেদনা ত্যাগই নির্বাণ। পঞ্চস্কন্ধ কি যে দুঃখ তা সাধারণের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। পঞ্চস্কন্ধ নামরূপের প্রতি সর্বক্ষণ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম জ্ঞান জাগ্রত কর।

১৩। কেহ কেহ বলে নির্বাণের চেয়ে বৌ ভালো। কারণ বৌ ভাত রান্না করে দেয়, চা করে দেয়, বিছানা করে দেয়। নির্বাণ-তো কিছুই দেয় না। আসলে কি জান? অন্তর্দৃষ্টিভাব না থাকলে, এভাব উৎপন্ন না হলে নির্বাণ কি তা বুঝা অসম্ভব। স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ক্লেশ, অবিদ্যা, তৃষ্ণা এসকল যে দুঃখ দেয়, তা জানতে হবে, বুঝতে হবে আর তাতেই উদয় হবে অর্ন্তদৃষ্টিভাব।

সবশেষে বলতে হয় ধ্যানই জ্ঞানের উৎস। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পুঁথিগত বিদ্যার ধারে কাছে না গিয়েও ধ্যান যোগে, জ্ঞান চোখে এই বিশ্বচরাচরকে যিনি জানতে পারেন, বুঝতে পারেন, বিশ্লেষণ করতে পারেন, তেমন মানুষটির জ্ঞান-সমুদ্রের গভীরতা, অনুভূতির গভীরতা কত বিশাল, ব্যাপক ও বিস্ময়কর হতে পারে তা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সহজ সরল সান্নিধ্যে না গেলে দূর থেকে ক্ষণিকের দর্শনে, শ্রবণে বুঝা কঠিনই বটে।

আমি অভাজন বহুদেশ ঘুরে, বহুঘাটের জল খেয়ে তিক্ত-মধুর অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ এ বয়সে হয়েছে। অথচ, বিগত ৯৬ ইংরেজীর বর্ষাব্রতের তিনটি মাস পরম পূজ্য বনভন্তের গভীর সান্নিধ্যে থেকে ও তাঁর বিশাল জ্ঞানরাজ্যের সীমানা খুঁজে পাইনি। তাঁর সকাল-সন্ধ্যার অনর্গল দেশনা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। তিনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন তার তল খুঁজে না পেয়ে, তখন তার ভাবলেশ হীন, অনাসক্ত, নিরাভয় সুনীল নেত্রযুগলের দিকেই অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে থাকতাম। আর ভাবতাম এ কোন অচিন রাজ্যের সত্ত্ব তিনি। কেমন করে রাত নেই, দিন নেই শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন অবিরাম গতিতে বইয়ে দিতে পারেন এ অমৃত ধর্ম বারি। কত গম্ভীর, কত বিশাল, কত গভীর তাঁর পরমঙ্গলকামী করুনাদ্র হৃদয়! সেই পরম কারুণিক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে বসে একটু সুযোগ পেয়ে অজস্রের মাঝে যে দু'চারটি বক্তব্য-টুকে রাখতে পেরেছি আমার বর্তমান নিবন্ধ তারই আলোকে গাথা। তাই এতে দাবী করা যাবে না কখনো পূর্ণাঙ্গতার। অপূর্ণ আমি পূর্ণ পুরুষের বিশাল জ্ঞান রাজ্যে হাত দিতে গিয়ে বামুনের চাঁদ ছোয়ার প্রচেষ্ঠা তুল্যই হলো। আমার এই অজ্ঞান জাত অপূর্ণতার জন্যে পরম পূজাই আর্য্য পুরুষের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থী। আমার জীবনের সঞ্চিত সমস্ত পূণ্যরাশি দিয়ে কামনা করি একালের সকল মিথ্যা আর অজ্ঞানতার তমসাচ্ছন্ন মানুষের পথ প্রদর্শক এই মহাপুরুষের নিরোগ দীর্ঘ কল্যাণময় পরমায়ূ।

চিরং তিট্ঠতু বুদ্ধ সাসনম্
চিরং জীবতু বনভন্তে।

সাধারণ দৃষ্টিতে ও সম্যক দৃষ্টিতে মানব জীবনের স্বার্থকথা

শ্রীমৎ ভৃগু স্থবির
বাঘাইছড়ি, বনবিহার।

এ জগতে দুর্ল্লভ মানব জীবনে ত্যাগ ও সত্যধর্ম লাভ করে, এ'ক্ষণিক জীবনকে ধন্য ও স্বার্থক করা সহজ নয়। যেহেতু সাধারণের চিত্ত সচরাচর হীন ও অনার্য্য সেবিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় কাম সুখে মোহিত। এদিকে বুদ্ধ বলেছেন- পঞ্চ ইন্দ্রিয় কাম সুখে মোহিত ও সন্তুষ্ট, প্রমত্তভাবে জীবন যাপনকারী সত্ত্বগণ ও তার মহান আর্য্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত ত্যাগ, অনাসক্তি নিরোধ, নিবৃত্তি নির্বাণ ধর্মে আত্ম নিয়োগ করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ- পদহীন ব্যক্তির যেমন হিমালয় পর্বতে আরোহন করা সম্ভব নয়, তদ্রুপ জ্ঞানহীন মূর্খ, অনার্য্য ও ইন্দ্রিয় কাম সুখে সন্তুষ্ট, প্রমত্তভাবে ভোগ বিলাসে রত ব্যক্তিগণও আর্য্য মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু কবলিত দুঃখময় সংসারকে অতিক্রম করে নির্বাণে পৌছতে পারে না। তাই সংসারে সাধারণের সংখ্যা বেশী, এক পা বাড়ালে হাজার চোখে পড়ে। কিন্তু সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও একজন সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন, আর্য্য পুদগল, ত্যাগী পুণ্য পুরুষ, লোকোত্তর মহামানব দর্শন ও সাক্ষাৎ পাওয়া খুবই দুর্ল্লভ। অর্থাৎ সহজে চোখে পরে না। তাই আজ অজ্ঞান মিথ্যাধর্মে আবদ্ধ হয়ে বড় বড় বিদেশী ডিগ্রি, প্রথম শ্রেণীর চাকুরী, উন্নতমানের ব্যবসা-বাণিজ্য, টালি লাগানো বিল্ডিং, এয়ার কন্ডিশন, রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ, প্রাইভেট গাড়ী, বোট, হেলিকপ্টার ও বিমান, দেব অপ্সরাসম স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, আরো টিভি, রেডিও এবং টেপরেকর্ডারে কোকিল বিনিন্দিত কন্ঠে পাশ্চাত্যের ইংলিশ সংগীত, ভারতের হিন্দিগান এদেশের বাংলা ব্যান্ডের গান, আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের অপূর্ব সুরের মূর্চ্ছনা, স্বর্গ অপ্সরা সম জন নন্দিনী সুন্দরী নর্ত্তকীর ভ্রু ভঙ্গীসহ ডিস্‌কো ডেন্স, হাজার হাজার কোটি কোটি ভোগ বিলাসের বিচিত্র রাজকীয় উপকরণাদি লাভ করতে পারলে সাধারণে মনে করেন এ

জীবন ধন্য ও স্বার্থক। আরো দেখা যায়, যারা হীন কাপুরুষ, হীন ধর্মে আবদ্ধ তারা মনে করেন অপরের মান-সম্মান, সুযশ, সুকীর্তি শ্রদ্ধা পূজা, লাভ-সৎকার প্রভৃতি গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করে অথবা প্রকাশ্যে মিথ্যা দুর্নাম রটনা করে অপরের লাভ সৎকারাদি বিনষ্ট করে দিয়ে যদি ঐ মান-সম্মান, লাভ-সৎকারাদি সে লাভ করতে পারে সেটাই জীবন ধন্য ও স্বার্থক। আরো বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিশ্বের একচ্ছত্র পদাধিকার অথবা রাজ্য লাভের জন্য লাখো লাখো কোটি কোটি দোষহীন, নিরীহ (শিশু, নারী) মানুষের জীবন হনন করতে ও দ্বিধাবোধ করে না। দলের লোকে যে বেশী হত্যা করতে পারে সে প্রশংসাপত্র পায়, এবং সে নিজেকে গর্ব বোধ করে। তাই বর্তমান উন্নত বিশ্বে আত্মরক্ষার নামে দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের মরণাস্ত্রের সমারোহ ও সমাহার। যেমন-রকেট, মর্টার, ট্যাঙ্ক, কামান, আরো উন্নত রসায়নিক অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র যা স্বল্পপাল্লা, মাঝারী পাল্লা ও দুরপাল্লা ক্ষেপন অস্ত্রের ওভার হেডে লাগানো, আরো বোমারু জঙ্গী ফাইটার, রাডারকে ফাঁকি দিতে পারে অত্যাধুনিক জঙ্গী বোমারু বিমান, সেই সাথে পারমানবিক অস্ত্রে সজ্জিত সাবমেরিন অর্থাৎ ডুবো জাহাজ। আর তৃতীয় বিশ্বে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তা হলো এটম বোমা। যা মূহুর্তের মধ্যে কোটি কোটি অসংখ্য মানুষের জীবন শেষ করতে পারে। আজ প্রায় মানুষের যা অজানা নয়। জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকির ধ্বংসলীলা থেকে সহজে অনুমান করতে পারে, এটোম বোমের কতটুকু ভয়ঙ্কর কার্য্যকরী, ধ্বংসাত্মক শক্তি। যা আমেরিকা বিমান থেকে নিক্ষেপের সাথে সাথে দুই এক সেকেন্ডের মধ্যে, অর্থাৎ এক কথায় নিমিষের মধ্যে যেই শহরে, ফেলা হয়েছিল সেই গোটা শহরটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যা এখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। আরো কত কিছু যে ধ্বংস্বাত্মক অস্ত্র রয়েছে তা কারোর জানা নেই। কিন্তু তবুও এতটুকু লাভ করার পরেও এই ক্ষনিক জীবনে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার শেষ নেই, সীমা নেই, অন্ত নেই, তৃপ্তি নেই এবং সাগরের মত বিস্তৃর্ণ, আকাশের মত অনন্ত। তাই আধুনিক বর্তমান বিশ্বে অজ্ঞান ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে ঐ মিথ্যাভাবে জীবন সার্থক এবং সাধারণ ইন্দ্রিয় কাম সুখ ভোগ করতে গিয়ে সেই সাধারণ হীন মানুষেরা সীমাহীন, বর্ণনাতীত, অফুরন্ত দুঃখের কবলে পতিত হয়ে বিশ্বজুড়ে আজ নারী পুরুষের করুন আর্তনাদ, শোকে মুহ্যমান, বিলাপ, অশ্রুসিক্ত নয়নে ক্রন্দন আর ক্রন্দন।

তাই বুদ্ধ বলেছেন-

সাধারণে দুঃখ ভোগ করে বহুতর,
চারি যোগ অতিক্রম বড়ই দুস্কর।

সাধারণ ও হীন মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন পাহাড়ে পর্বতে, গ্রামে গঞ্জে, শহরে বন্দরে, মজুর শ্রেণী থেকে শুরু করে উচুমানের সম্মানী ব্যক্তি ও বিদেশী বড় বড় ডিগ্রীধারী শিক্ষিত ব্যক্তিরাসহ একসাথে নেশা পান করে ও জুয়া খেলে, আর কতো কিছু নোংড়ামি দুর্নীতি কাজ করছে তার ইয়ত্তা নেই। যাক-

সম্যক দৃষ্টিতে- ধন, জন, মান, সম্মান, যশঃ স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য প্রভৃতি লাভ করতে পারলেও প্রকৃত মানব জীবন ধন্য ও স্বার্থক হয় না। যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে পাপ ধর্ম ত্যাগ করে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে ক্ষণিক জীবনে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দ্বারে দানশীল ভাবনাদি কুশল ধর্মে আত্ম নিয়োগ করতঃ লোকোত্তর মার্গ ফলাদি লাভ করে যাবতীয় জন্ম জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু অতিক্রম করে মৃত্যু হীন রাজ্যে পৌঁছতে পারে অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করতে পারে ইহাই প্রকৃত পক্ষে মানব জীবনের স্বার্থ কথা। পরিশেষে আরও দুটো কথা বলছি। আমার আর্টিক্যাল লেখার কোন আগ্রহ বা ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ত্রিশরনা পন্ন শ্রদ্ধাবান উপাসক ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া বার বার প্রার্থনা করাতে, দু'একটি কথা লিখতে বাধ্য হলাম। সেও কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আর্টিকেলটি লিখে দিলাম। ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া বার বার প্রার্থনা করার কারণ হচ্ছে আমার জ্ঞান পরিধি যাচাইকরা, কিন্তু বুদ্ধের জ্ঞানের কথা বা বাণী কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কল্পকাল লিখেও সমাপ্ত করতে পারবে না। তবুও আমি সামান্য দুটো বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে অর্থাৎ সাধারণের দৃষ্টি ও সম্যক দৃষ্টির মধ্যে কতটুকু পার্থক্য, তুলে ধরতে যথা সাধ্য চেষ্টা করেছি। তবে কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে বা কটাক্ষ করে লেখা হয়নি। কিন্তু মোটামুটি সামগ্রিকভাবে যা বাস্তব, বর্তমানে যা হচ্ছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। সবশেষে হীন দৃষ্টি ও মিথ্যাদৃষ্টি বর্জন করত সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে অষ্ট অক্ষন বিমুক্ত, এ শুভ সময়ে ধর্ম চক্ষু ও প্রজ্ঞা চক্ষু উৎপন্ন করে দেবতার ও দুর্লভ এ মানব জীবনকে ধন্য ও স্বার্থক করুন।

সাধু সাধু সাধু।

কুশলাকুশল ও বিপাক

শ্রীমৎ বুদ্ধশ্রী ভিক্ষু
জুরাছড়ি শাখা বনবিহার

মানুষ যা কিছু অকুশল কর্ম সম্পাদন করে তা লোভ, দ্বেষ ও মোহের কারণেই করে। আর যা কিছু কুশল কর্ম সম্পাদন করে তা অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহের কারণেই করে। অকুশল কর্ম সম্পাদনে যেমন মানবের বহু দুঃখ বিপাক উৎপন্ন হয় আবার কুশল কর্ম সম্পাদনে ততোধিক সুখ বিপাক ও উৎপন্ন হয়। তাই প্রত্যেকের কুশল সম্পাদন করা একান্ত কর্তব্য।

কুশল কি? প্রাণী হত্যা, চুরি ও ব্যভিচার হতে বিরত থাকা কুশল। মিথ্যা, কটু, ভেদ ও বৃথা বাক্য বলা হতে বিরত থাকা কুশল। যাবতীয় নেশা দ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকা কুশল।

অকুশল কি? প্রাণী হত্যা, চুরি ও ব্যভিচার করা অকুশল। মিথ্যা, কটু, ভেদ ও বৃথা বাক্য বলা অকুশল। লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতা, অহংকার ও মিথ্যা দৃষ্টি অকুশল। এভাবে প্রাণীগণকে কুশলের প্রভাবে উর্দ্ধদিকে এবং অকুশলের প্রভাবে নীচের দিকে অর্থাৎ দারুণ দুঃখ পূর্ণ স্থান চারি অপায় তির্যক, প্রেত, অসুর ও নরকের দিকে আকর্ষণ করে। যেমন প্রাণী হত্যা করা হয় দ্বেষ বা হিংসা চিত্ত দ্বারা, চুরি ব্যভিচার ও নেশা পান করা হয় লোভ চিত্ত দ্বারা এবং মিথ্যা কটু, ভেদ ও বৃথা বলা হয় মোহ চিত্ত দ্বারা।

এসব অকুশলের শাখা প্রশাখা তুল্য পাপে নিলর্জ্জতা, নির্ভয়তা, উগ্রতা, অভিমান, ভ্রান্ত ধারণা, ঈর্ষা, কৃপণতা, অনুতাপ, অনুশোচনা ও তন্দ্রালস্যতা প্রভৃতি অকুশল ধর্মের সহায়ক। ইহাতে হৃদয়া-শ্রিত চিত্ত শোনিত কৃষ্ণবর্ণ হয়ে শরীর ও মন দূষিত করে। সুতরাং দূষিত মন যে কোন কর্মই করুক না কেন সে কর্মের বিপাক হবে বড় দুঃখ পূর্ণ। ইহাতেই প্রাণী সমূহ অসুর, পশু পক্ষী, প্রেত ও নরকাদি অপায় ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করে। দীর্ঘদিন অনন্ত দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

অকুশলের মূল ৩টি লোভ, দ্বেষ, মোহ। আর কুশলের মুল ৩টি। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ। উপমাস্ব রূপ বলা যেতে পারে-ইন্ধন (জ্বালানী কাঠ) না পেলে যেমন আগুন আপনা আপনি নিভিয়ে যায় তেমন লোভ দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণাদি ক্ষয় হলে জন্ম জরা মরণাদি দুঃখাগ্নির দাহ ক্রিয়া আপনা আপনি নির্বাপিত হয়ে শীতলতা প্রাপ্ত হয়। লোভ, দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণাদি ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত সুখ লাভ করা যায় না। কাজেই এ ত্রিবিধ মূলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তি শালী মোহ। মোহের স্বভাব বা লক্ষণ হল বিষয়াদির স্বরূপ যথাযথ ভাবে জানতে না দেয়া। আকাশে উৎপন্ন ঘন বিশাল মেঘখন্ড যেমন মহাপ্রভা সম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে ডেকে রাখে তেমন মানুষের অন্তরে মেঘরূপী মোহের প্রাদুর্ভাব হলে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, হীন-উত্তম, সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বুঝতে দেয় না। তাই মানুষ যাবতীয় অকুশল কর্ম সম্পাদন করে। বলতে গেলে মোহের অপর নাম অজ্ঞানতা। এ মোহের (অজ্ঞানতা) কারণেই অনিত্যকে নিত্য রুপে, অসত্যকে সত্যরুপে, দুঃখকে সুখরুপে, আত্মাকে আত্মারুপে, অসারকে সাররুপে, অপ্রিয়কে প্রিয়রুপে, অমধুরকে মধুররূপে এবং অশাশ্বতকে শাশ্বতরুপে মনে হয়। আসলে জাগতিক সর্ববিষয় তা প্রকৃতির রীতিনীতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃত জ্ঞানাভাবে উহা বুঝা বড় কঠিন "মোহো ভিক্খবে অন্ধকরণ ধম্মো" অর্থাৎ মোহের ধর্ম সবদিকে অন্ধকার বিস্তার করা। এতে হিতাহিত জ্ঞান ও বিলুপ্ত হয়। মোহের প্রতিপক্ষ ধর্ম হল ভাবনা। অর্থের বিনিময়ে যেমন জ্ঞান ও ধর্ম ক্রয় করা যায় না তেমন মুক্তির জন্য ধ্যান ভাবনার প্রয়োজন। কর্ষণ ছাড়া যেমন ফসল উৎপন্ন হয় না তেমন ধ্যান ভাবনা ব্যতীত উচ্চতর জ্ঞানার্জন হয় না। ভাবনার অনুশীলন করে প্রজ্ঞা উৎপন্ন করতে হয়। প্রজ্ঞার আলোকে অন্তর জগত যখন উদ্ভাসিত হয় তখন হৃদয়ের সমস্ত মোহ কালিমা পাপ দৃষ্টি অপসারিত হয়। মোহ অপসারিত হলেই যথার্থ সত্যের সন্ধান লাভ হয়। সুতরাং মোহ অপসারণের একমাত্র অস্ত্র হল ভাবনা। মোহান্ধ মানুষের যেমন পাপপুন্য, কুশল-অকুশল ও ভাল-মন্দ বিচার নেই তেমনি ভাবনা ছাড়া মুক্তি লাভের অবকাশ নেই। একজন চক্ষুহীন ব্যক্তির কাছে সারা পৃথিবীটা যেমন অন্ধকার-হয় তেমন ধর্মান্ধ ব্যক্তির কাছে ও তদ্রুপ উঁচুনীচু, ভালমন্দ কিছুই দৃষ্ট হয় না। ধর্মান্ধ ব্যক্তির

মুক্তি কখনো সম্ভব নয়। স্বর্গ-নরক পাতাল-মর্ত্য, ইহকাল পরকাল, সুমার্গ-কুমার্গ, হীন-শ্রেষ্ট, ধর্ম অধর্ম কি? তা সম্পূর্ণ তাদের জ্ঞানের অগোচর।

সেসব বিষয় জানতে হলে অবশ্য কোন অভিজ্ঞ পরম কল্যান মিত্র বা উপদেষ্টার প্রয়োজন। জগতে বুদ্ধ গণ ও সৎপুরুষগণ পরম কল্যানমিত্র। তারা বিশ্ব প্রাণীর হিত-সুখের জন্য মুক্তির পথ প্রদায়ক এবং খাঁটি সত্য ধর্ম প্রচার করেন। তাদের সেই অমৃত ধর্মের ছোঁয়াচ লাভ করে অর্থাৎ দিগভ্রান্ত প্রাণী অন্ধকার জীবনে আলো লাভ করে এবং সত্যপথ নির্ধারণে সমর্থ হয়। তাতেই মুক্তি মার্গের সন্ধান লাভ করে। আজ শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমাদের মাঝে পরম কল্যানমিত্র ও পূজার উত্তম ক্ষেত্র। তিনি আত্মহিত পরহিত সকলের মংগলকামী সব সময় হিতোপদেশ দানে কল্যান কর্মে নিয়োজিত এবং বিপথগামীকে সৎউপদেশ প্রদান করে সুপথে পরিচালিত -করেন।

অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান, ধর্মান্ধকে ধর্মদান ও ভয়ার্তকে অভয়দান করেন। তাতেই অগনিত শ্রোতাভক্তরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অমৃত-ময় উপদেশে আনন্দ-তৃপ্তি লাভ করেন। জগতে তাঁর মত ব্যক্তিই পরম কল্যামিত্র নামে অভিহিত হন। সর্বদা এরকম কল্যানমিত্রের সংগে মেলামেশা, সাক্ষাৎ এবং আলাপ আলোচনা করে তাঁর গুণাবলী স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করে তোলাই মংগলকর। কল্যানমিত্রের কল্যানকর উপদেশে কল্যান জনক কার্য সম্পাদনের সুবুদ্ধি জাগ্রত হয়। ইহাতে দুর্লভ মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হয় এবং পর কালে ও সুগতি লাভের হেতু উৎপন্ন হয়।

পরিশেষে বলতে হয়, ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অভিজ্ঞা পূর্ণ অমৃতময় ধর্মদেশনা সযত্নে সংকলন করে পুস্তক আকারে বৌদ্ধ সমাজে প্রচার করছেন। তা ধর্মপিপাসু মানুষের বহু উপকার সাধিত হচ্ছে। এধরণের মূল্যবান পুস্তক সদ্ধর্ম পিপাসুদের কাছে এক অভূত পূর্ব অবদান থাকবে। এ রকম পূণ্য কাজের উদ্যোগ নেয়া সকলের প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে এ পুস্তক আশা করি অদূর ভবিষ্যতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বাণী প্রচারে অসংখ্য ধর্ম পিপাসুদের ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হউক।

সাধু সাধু সাধু।।

কর্ম ও তাঁর ফল

শ্রীমৎ বশিষ্ট ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাংগামাটি।

প্রাণী জগতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। কর্মকে চয়ন করার, ভাল-মন্দ বিবেচনা করার উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধ দিকে প্রবাহিত করার একমাত্র অজেয় শক্তি রয়েছে এ'মানবের মধ্যে। তাই যারা দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে চান তারা দারুন দুঃখ প্রদানকারী কর্ম সম্পাদন হতে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। মানব জীবন লাভ করেও যদি জেনে শুনে মন্দ (অকুশল) কর্ম সম্পাদন হতে বিরত থাকতে না পারেন তা মানবের পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয় হবে সন্দেহ নেই। কর্ম উৎপত্তি ভেদে তিনভাগে ভাগ করা যায়,-কায়িক, বাচনিচ, ও মানসিক। তবেএটা বলা বাহূল্য যে, কর্ম কোথায় স্থিত থাকে তা নির্দিষ্ট করে চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখা যায়না। বৃক্ষলতা ফলবতী হবার পূর্বে ফল-ফুল বৃক্ষের কোন স্থানে আছে-শিকড়ে? কান্ডে? শাখায়? না প্রশাখায়? তা যেমন নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। সেরূপ কৃতকর্মের স্থিত স্থান কোন স্থানে বা কোনখানে থাকে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায়না। কর্ম ও কর্মফলের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন এবং কর্ম ফল অচিন্তনীয় বিষয়ও বটে। যদিও কৃতকর্মের স্থিত স্থান এখানে ওখানে তথা কোথায় থাকে তা নির্দিষ্ট করে দেখানো সম্ভব নহে, তবে কর্মের উৎপত্তি প্রসংগে বুদ্ধ ধর্মপদে এ'গাথা বলেছিলেন-

"মনোপুব্বংগম ধম্মা মনো সেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা কারোতি বা
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া'বা অনপাযিনী।"

মনই ধর্ম সমূহের পূর্বগামী, ধর্ম সমূহের মধ্যে মনই প্রধান, ধর্ম মন হতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। যদি কেহ প্রসন্ন মনে বা নিষ্পাপ চিত্তে কোন কথা বলে বা কাজ করে, তাহলে ছায়ার ন্যায় সুখ সততই তাকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ মানুষের সুখ-দুঃখের প্রকৃত কারণ হচ্ছে তার মন। সে যা ভোগ করেছে বা করে তা অধিকাংশই হল তার মনের সৃষ্টি। এককথায় মানুষের মনই তার জীবনকে গড়ে তুলে তাকে সুখী বা দুঃখী করে। কাজেই মন যদি বসে (নিজের আয়ত্বাধীন) থাকে, ঠিক পথে চলে তবে সমস্তই তার হাতের মুঠোয়।

এখন নির্দ্ধিধায় বলা যায়-কুকর্ম ওসুকর্ম জীবগণ নিজেই করে থাকে এবং তদনুযায়ী তার ভাল মন্দ ফল ভোগ করে। কেননা কর্মই জন্মের মূল কারণ। তবে কর্মের কারণ? বুদ্ধ বলেছেন 'অবিজ্জা পচ্চায সংখার' -অবিদ্যা হতে কর্মের উৎপত্তি, তথা অবিদ্যাই কর্মের মূল (আসল) কারণ। এ 'অবিদ্যাজনিত কর্ম ও কর্ম জনিত জন্ম-মৃত্যু। সত্ত্বাগণ অবিদ্যাবা অজ্ঞানতার কারণে নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত থাকে, আর তার ফলস্বরূপ ভোগ করতে গিয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বিরাম হীন ভাবে ঘুরতেছে। তাই শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-অবিদ্যাতে বিদ্যা উৎপন্ন কর। বিদ্যা উৎপন্ন হলে কোন কার্যে নিযুক্ত থাকতে হবে না। তোমরা কর্ম ধ্বংস কর। নানাবিধ কার্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখলে পুনজর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়। বার বার জন্ম গ্রহণ করা দুঃখজনক। খরস্রোতা নদীতে একটুকরো কাঠ পড়লে যেমন তার আর হদিশ মিলেনা, তেমনি নানাকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরও তার বিপাক ভোগ করতে করতে কোথায় উপনিত হতে হয় তার অন্ত নেই। এবং সে কখনও মুক্ত হতে পারবেনা। কর্ম ও ফলের চক্র থেকে তার মুক্তি অসম্ভব। কর্ম ধ্বংশ করা এবং পুর্ণজন্ম না হওয়াই নির্বাণ। নির্বানে কর্মও নেই, পুনর্জন্ম ও নেই। এটাই প্রকৃত সুখ, শান্তি, মুক্ত, স্বাধীন, সমস্ত, দুঃখের পরিসমাপ্তি এবং চরম ওপরম বিমুক্তি।

জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক।

নির্বাণ মার্গের বাঁধাস্বরূপ বর্ণনা

সংগ্রহে- শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

(এ প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু, ব্যাখ্যা ও উদাহরণ, স্থাপনাদি সবই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা প্রসূত; আমি সংগ্রহ করেছি, এটুকু মাত্র। যেহেতু আমি একজন ভিক্ষু, তাই শুধু ভিক্ষুর প্রতিপালনীয় বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব রেখে লেখতে চেষ্টাশীল হয়েছি। আমার শ্রুতি-জ্ঞান ও তেমন সবল নহে তদ্ধেতু রচনায় ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই ভুলত্রুটির জন্য আমি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট পূর্বাহ্নেই ক্ষমাপ্রার্থী।)

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তের) মহোদয় ধর্মোপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেন-ভগবান বুদ্ধের সময় কালিন দেশনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাবর্গের

ধর্মচক্ষু ও ধর্মজ্ঞান উদয় হত বা মার্গফল লাভে প্রতিষ্ঠিত হত। তাতে ধর্মদেশকের দেশনা ও শ্রোতাদের মনোযোগ উভয় সার্থক বা ফলপ্রসু রূপদান করত। কিন্তু বর্তমানে তা পরিলক্ষিত হওয়ার প্রমাণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তার কারণ কি?

ত্রিহেতুক পুদ্‌গলের অভাব। ধর্মচক্ষু ও ধর্মজ্ঞান লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র ত্রিহেতুক পুদ্‌গলেরা মার্গফল বা ধর্মচক্ষু ও ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন করতে সক্ষম। সে ত্রিহেতুক পুদ্‌গল কারা?-যাদের লোভ, দ্বেষ, মোহের হেতু দুর্বল, অধিকন্তু অলোভ হেতু, অদ্বেষ হেতু, অমোহ হেতু-এ ত্রিহেতু যাদের সবল এবং যারা এ'ত্রিহেতুতে বলীয়ান তারাই ত্রিহেতুক পুদ্‌গল। দেবতা, ব্রহ্মা, মনুষ্য, ভূত, প্রেত, যক্ষ-এসব সত্ত্বগণের মধ্যে ত্রিহেতুক পুদ্‌গল বিদ্যমান থাকে। আবার ত্রিহেতুক পুদ্‌গল হয়েও যদি বর্তমানে অসাবধান বশতঃ প্রচেষ্টার অবহেলা করে তাতে মার্গফল লাভ করা অসম্ভব হয়ে যায়। অনেক সময় (তার) ত্রিহেতু লোপ পায় বা লোপ পাওয়ার যথেষ্ঠ সন্দেহ থাকে। যেমন, মগধরাজ অজাতশত্রু, সে ছিল তেমন একজন ত্রিহেতুক পুদ্‌গল যে বুদ্ধকে দর্শনের সাথে সাথেই মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু দেবদত্তের কুচক্রের ফাঁদে পড়ে পিতৃহত্যা করায় তার মার্গফল লাভের পথরুদ্ধ হয় এবং পরিণামে তাকে লৌহকুম্ভী নরকে পতিত হতে হয়। তাই সতত সাবধান হয়ে মার্গফলের জন্য উদ্যোগী, অধ্যবসায়ী হয়ে চেষ্টাশীল হতে হবে। নির্বাণাভিলাষী হয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত বাঁধার পর বাঁধা অতিক্রম করতে হবে। উৎসাহ, অধ্যবসায় আত্মোন্নতির গ্যারান্টি বা পূর্বশর্ত। অতীতের পারমী (ত্রিহেতু), সৎগুরুর উপদেশ ও বর্তমানের প্রচেষ্টা বা চেষ্টাশীলতা এ'তিনটির সমন্বয়ে মার্গফল লাভ করা সম্ভব। তিনটির মধ্যে যে কোন একটির অভাব থাকলে মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। অতীতের পারমী মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়ের মত সাহায্য করে, বর্তমানের প্রচেষ্টা মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতে উদ্যোগী করে এবং সৎ গুরুর উপদেশ মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পথপ্রদর্শকের মত কিভাবে উদ্যোগ নিতে হবে তা নির্দ্দেশ করে দেয়।

আরো এমন সপ্তবিধ পুদ্‌গল আছে যারা নির্বাণ লাভ করতে অপারগ। সেই সপ্তবিধ পুদ্‌গলেরা হচ্ছে, (১) পঞ্চ আন্তরিক কর্মী (মাতৃ হত্যা, পিতৃ হত্যা, অরহত হত্যা, দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধ দেহ হতে রক্তপাত, সঙ্ঘভেদ) (২)

দ্বিহেতুক পুদ্‌গল (ত্রিহেতুর অভাব) (৩) মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ পুদ্‌গল (৪) চারি আর্য্যসত্য সম্বন্ধে (অজ্ঞানতা) অজ্ঞ পুদ্‌গল (৫) শ্রদ্ধাশূণ্য পুদ্‌গল (৬) নির্বাণ অনভিলাষী পুদ্‌গল (৭) ভোগ বিলাসী পুদ্‌গল।

তিনি ভিক্ষু শ্রামণদের উৎসাহিত করে বলেন-মার্গফল লাভেচ্ছুক হয়ে সত্ত্বর দৃঢ় বীর্য্যের সাথে (অতীতের পারমী পরীক্ষার্থে) বর্তমানের প্রচেষ্টা আরম্ভ কর। (আর কোন বিষয়ে সন্দিহান থাকলে-তো আমি আছি) তাতে বাঁধার পর বাঁধা অতিক্রম করার দরকার হলেও ক্ষান্ত হয়ো না। প্রচেষ্টার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হচ্ছে-পাপদৃষ্টি ও হীন দৃষ্টি। তোমাদেরকে এই পাপদৃষ্টি ও হীনদৃষ্টি সর্ব প্রথম এবং সর্বোতভাবে পরিহার করতে হবে। এ'দুটি দৃষ্টি পরিহার না করলে মার্গফল লাভ করা দূরের কথা ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে ও অসমর্থ হবে। এবং নির্মল, পরিশুদ্ধ, অনন্ত সুখের ব্রহ্মচর্য্য জীবন কদর্ম্যযুক্ত ও দুর্বিসহ হয়ে উঠবে, সাথে সাথে অনেক অপুণ্য প্রসব হবে।

সেই পাপদৃষ্টি কি?-বুদ্ধের বর্ণিত-'কামোপভোগ কখনো উৎকৃষ্ঠ নয়, তা হীন, অনার্য্য, অস্পৃশ্য, ইতরজন সেব্য, মহাদুঃখ সৃষ্টিকারী, পাপ উৎপাদক ও অনর্থযুক্ত' ইত্যাদিতে বিপরীত দর্শন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে স্ত্রীলোকের রূপ-লাবণ্যে ও স্পর্শে তথা হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং চেহারার প্রতি ইষ্ট, কান্ত, কমনীয়, মনোজ্ঞ, প্রিয়, সুখ, শুভ, শুচি, নিত্য দর্শন করতঃ তা লাভের জন্য যে পুনঃ পুনঃ অভিনিবেশ তাই পাপদৃষ্টি। ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পুনঃ পুনঃ স্ত্রীলোক অভিনন্দন করাই পাপদৃষ্টির লক্ষণ। স্ত্রীলোকের প্রতি নাকি দীর্ঘা, নাকি হ্রস্বা, নাকি কৃশা, নাকি স্থুলা, নাকি কৃষ্ণা, নাকি শুভ্রা ইত্যাদি রূপে মনোনিবেশ বা এরূপ মনোভাব নিয়ে দর্শন করা ও পাপ।

কামান্ধ ব্যক্তিগণ রিপুর বিক্ষোভে, তৃষ্ণার তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কাম বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে নানা বিপথে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাই দেখা যায়,-কাম সম্ভোগ লালসা থেকেই রাজায়-রাজায় দ্বন্দ্ব লাগে, ক্ষত্রিয়ে-ক্ষত্রিয়ে ঘোর শত্রুতা, ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে তর্ক, গৃহপতি-গৃহপতিতে কলহ-বিগ্রহ, পিতা-পুত্রে মনোমালিন্য, ভ্রাতা-ভগ্নী-বন্ধুর মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তারা পরস্পর মৌখিক কলহ থেকে ক্রমশ হাতাহাতি এমন কি অস্ত্রধারণ করতে ও কুণ্ঠিত হয় না; এতে তারা অনেক সময়ে মৃত্যুমুখেও পতিত হয়ে মৃত্যু তুল্য দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

কামের প্রতি লোভ, কামের প্রতি আসক্তি, কামের প্রতি অজ্ঞানতা হীন মনুষ্যগণকে কুপথে পরিচালিত করে অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করে। ইন্দ্রিয়াসক্তি যাকে একবার অধিকার করে বসে জীবনে তার দুঃখ অনিবার্য্য। সমুদ্রে পতিত পুরুষ যেমন তরঙ্গাঘাতে নানাবিধ দুঃখ পেয়ে ডুবিয়ে মরে যায়, ইন্দ্রিয়াসক্ত চপল, ভিক্ষুও সংসার সমুদ্রে ডুবিয়ে অশেষ দুঃখে পতিত হয়। এ প্রকারে শুধু ইহ জীবনে দুঃখ পায় তা নহে, মৃত্যুর পর মূহুর্তে ও ঘোরতর দুঃখ পূর্ণ স্থানে উৎপন্ন হয়ে পরকালে ভীষণ দুঃখ-যাতনা ভোগ করে থাকে। তাই ঈদৃশ দুঃখময় অবস্থা হতে ত্রাণের জন্য প্রব্রজিতগণ মাত্রেই পাপদৃষ্টি অবশ্য পরিত্যাগ করা কর্তব্য। জীবন কাটাতে পারলে জীবনের স্বার্থকতা- এরূপ মনে করা বা অভিনিবেশ করাই হীন দৃষ্টি। নানাবিধ ভোগ বিলাসে মত্ত থাকা বা মত্ত থাকতে প্রচেষ্টা করা হীন দৃষ্টির লক্ষণ। ভিক্ষুর জীবনযাত্রা কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক; আহার-বিহার, ভোগ-বিলাস তার কাম্য নহে, নিবৃত্তি, দুঃখ মুক্তিই তার পরম লক্ষ্য।

তিনি বলেন-বস্তুতঃ পার্থিব ধন, ঐশ্বর্য্য সুলভ সুখে ও যশঃ সম্মানে কিছুই নেই। ভোগ ঐশ্বর্য্যে যদি সুখ থাকতো তাহলে রাজপুত্র শাক্যসিংহ রাজৈশ্বর্য্যকে ভস্মমুষ্ঠির ন্যায় হেয় জ্ঞানে পরিত্যাগ করে সংসার ত্যাগী হতেন না। আরো অনেক মহৎ ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় তারাও পার্থিব ধন, যশঃ সম্মাণাদিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করে থুথুবৎ ত্যাগ করেছেন।

সমস্ত সংসার স্বভাবত দুঃখের আলয় মাত্র। সংসারে যে সুখ দৃষ্ঠ হয়, তা হেমন্তের প্রভাতে তৃণাগ্রস্থিত শিশির বিন্দুর মত নিতান্তই স্বল্প। কিন্তু দুঃখ জলধিজল সদৃশ হতেও বিপুল। তাই (সংসারে) ভোগ বিলাসে যা সুখ বলে কল্পণা প্রসূত হয় তা শুধু ক্ষণস্থায়ীই নহে, দুঃখের পূর্বাভাষ ও বটে। তজ্জন্য এই দুঃখান্ত ক্ষণিক সুখে কখনো সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

অতএব, ভোগ বিলাসের মোহের বা ইষ্ট বেদনার সাময়িক কল্পণা প্রসূত হীন সুখে মূহ্যমান হয়ো না। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন অগ্নি বৃদ্ধি পায় তেমন কামনা-বাসনা বস্তু অন্বেষণে হীন দৃষ্টি সবল হয়ে উঠে; পরিণামে মুক্তির পথে বাঁধা সৃষ্টি করে।

হীনদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের কাছে, বৌদ্ধধর্মের কথা বলা কিংবা আলোচনা করা কষ্টদায়ক ও নিষ্ফল। কারণ হীনত্বই অগ্রত্ব হয় না, অগ্রত্বই অরহত্ব লাভ হয়। অরহত্ত্বের জন্য প্রয়োজন উচ্চদৃষ্টি, উচ্চত্তর জ্ঞান। উচ্চত্তর ডিগ্রী নয়, ধন-ঐশ্বর্য্য, আধিপত্য নয়। সত্যজ্ঞান বা সত্যদর্শন ও নির্লোভ-অহিংসা-অমোহ এ গুলিই একমাত্র প্রয়োজন। যেহেতু মানুষ হীন, সংস্কার হীন, তৃষ্ণা হীন; তাই জ্ঞান (মার্গফল) লাভের জন্য উচ্চদৃষ্টি ও উচ্চমন আয়ত্ব করতঃ আর্য্যস্তরে অগ্রসরের চেষ্টাশীল হয়ে হীনকে সর্বতোভাবে বর্জন কর।

কি খাব? কোথায় পাব? কে দেবে? আমি কষ্ট পাচ্ছি! আমার শয়নাসন কোথায়? আমি কোথায় শয়ণ করব?-এরূপ হীন চিন্তা করার সাথে সাথে পাপ সৃষ্টি হয়। উক্ত চিন্তাসমূহ চিত্তে স্থান দিবে না এবং হীন বিষয় সেবা করবে না।

তিনি আরো বলেন-নির্বাণ গমনেচ্ছুক ভিক্ষুগণকে সোজা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে পরিচালিত হতে হবে। এবং প্রতিটি পদক্ষেপকে অত্যন্ত সতর্ক অভিনিবেশ সহকারে মেপে মেপে চালাতে হবে। কোন দিকে বাড়াবাড়ি করা চলবে না। তাদেরকে স্বাবলম্বন, নিঃস্বার্থ, অপরের (কর্তৃক) প্রতিপালক না হওয়া, কারো ভৃত্য না হওয়া, গৃহী সংসর্গে না যাওয়া অকারণে অসময়ে ভ্রমণ না করার প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে। সে গুলো কি রকম? নিম্নরূপ-

স্বাবলম্বন- নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ান, অর্থাৎ নিজ প্রয়োজনের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হয়ে দৃঢ় বীর্য্যের সহিত কর্তব্য কাজে অগ্রসর হতে ব্রতী হওয়া ভিক্ষু মাত্রেই অপরের উপর নির্ভরশীলতা বা পরমুখাপেক্ষী ভাব ত্যাগ করতে হবে।

ধর্মপদে বুদ্ধও বলেছেন-'আপনিই আপনার আশ্রয় উহা ভিন্ন অন্য আশ্রয় দাতা আর কেহ নেই'। কাজেই এরূপ উপদেশের দ্বারাও পরমুখাপেক্ষী ভাব বর্জন করে আত্ম নির্ভরশীলতা হওয়ার অনুপ্রেরণা ইঙ্গিত করে। তাই শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির লক্ষ্যে নয় যাবতীয় কর্তব্য কার্য্যেও নিজের উপর নিজে নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্জনীয়। ভিক্ষুকে পরনির্ভরশীল বহুল ভাব ত্যাগ করে আত্ম নির্ভলশীলতা, আত্ম পরীক্ষা, আত্ম

সংযম, আত্ম শুদ্ধ ও আত্মোপলব্ধি পরায়ণ হওয়া উচিত। কারণ, স্বয়ং চেষ্টা না করে পরনির্ভরশীল হলে মার্গফল সাক্ষাৎ লাভ অসম্ভব।

অপরের উপর আশ্রিত হয়ে বা পরনির্ভরশীল থাকা দুঃখময় বন্ধন। জ্ঞানীগণ কারো একান্ত সংস্পর্শে বা আশ্রয়ে থাকে না। প্রব্রজিতগণের এমন কোন কারণ নেই যে, যার জন্য তাদেরকে পরের উপর নির্ভর করতে হবে অথবা বাহ্য সহায়ের মুখাপেক্ষী হতে হবে। প্রব্রজিতগণ মাত্রেই বাতাসের মত মুক্ত।

নিঃস্বার্থ- নিজের স্বার্থ বিষয়ে ভাবা বা ব্যগ্র না হয়ে তৎসম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকাই নিঃস্বার্থ। পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা সিক্ত হয়না। স্বার্থ চিন্তাই মনের ঔদার্যকে হরণ করে ও পবিত্র, উদার অন্তরকে করে কলুষিত এবং সংকীর্ণ। কিন্তু ত্যাগ ধর্মে অভ্যস্ত হলে ত্যাগময় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় (অন্তরে)।

উদার হৃদয়ের মাঝে ত্যাগ তথা সর্বত্যাগীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। তাই ভিক্ষুকে মনের সমস্ত সংকীর্ণতা ভাব পরিহার করে উদারতায় বলীয়ান হতে হবে। লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসায় চিত্তে সাম্যভাব অটুট রেখে ও লাভে উদাসীন হয়ে 'আমার বলে কিছুই নেই' এরূপ চিন্তাপোষণ করে নিঃস্বার্থ পথ অবলম্বন করতে হবে। স্বার্থান্বেষণ দূরকরতঃ অন্তর্মুখী না হয়ে কল্যাণমুখী হওয়া ভিক্ষুর কর্তব্য। লাভের কামনা করে অণ্যের সঙ্গে কথাবার্তায় নিযুক্ত হওয়া-এটা ভিক্ষুর জন্য পাপজনক কর্ম। প্রকৃত ভিক্ষু সর্ব প্রকার লাভের আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

অপরের প্রতিপালক না হওয়া-আমাকে জনসাধারণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ভৈষজ্যাদি দ্বারা পূজা করুক এরূপ ইচ্ছাপোষণ বা এভাবে জনসাধারণ কর্তৃক রক্ষিত ও পোষিত হওয়াকে অপরের প্রতিপালক হওয়া বুঝায়। কিন্তু অপরের নিকট লাভ-সৎকার, সম্মান প্রাপ্তির আশায় থাকা ভিক্ষু জীবনের মূল উর্দ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। ভিক্ষুকে ভোগ-লালসায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভোগ যে দুঃখ তা জ্ঞানযোগে উপলব্ধি করতে হবে। এবং ভোগের পথ এক নির্বাণের পথ যে অন্য তাতে যত্নবান বা চিন্তাশীল হতে হবে।

ভিক্ষুর এ'কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, দেহ থাকতে দুঃখ রাশি গুলোকে ক্ষয় করতে হয় বলে দেহ রক্ষার্থে ভোজন করা। অন্যথায় ভোজনের কোন প্রয়োজন নেই। তাই ভিক্ষুকে ভোজনে অল্প বা বেশী, ভাল বা মন্দ বিচার না

করে দেহ রক্ষার্থে ভোজন করতঃ দুঃখ রাশিকে ক্ষয় সাধন করে আহার নিরোধ করতে হয়। সমস্ত দুঃখরাশি সমূহকে ক্ষয় সাধন করতে সক্ষম হলেই তবে ভিক্ষুর জীবন সার্থক। দুঃখরাশি বিদ্যমান অবস্থায় জন সাধারণের শ্রদ্ধা প্রদত্ত ভোজনাদি (বস্তু) গ্রহণ করা ভিক্ষুর জন্য লজ্জাজনক কার্য ও বটে।

কারো ভৃত্য না হওয়া-রাজাদের, রাজা অমাত্যদের ক্ষত্রিয়, গৃহপতি ও কুমারদের-'এখানে আস, ওখানে যাও, ইহা কর, ইহা নিয়ে যাও, অমুক স্থান হতে অমুক দ্রব্য নিয়ে আস, অমুক সংবাদ অমুক স্থানে প্রকাশ কর' ইত্যাদি বা এরূপ নানাবিধ ছোট বড় দৌতকার্য্যে নিযুক্ত থাকা অপরের (কারো) ভৃত্য হওয়া বুঝায়। ভিক্ষুকে এতৎদৃশ জনসাধরণের অনুগত হীন, অল্পবৎ কাজ হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

জন সাধারণের মন জয় করে লাভ-সৎকার ওপূজা লাভেচ্ছুক হয়ে জন সাধারণের কথামত নিজেকে পরিচালনা করা,-এটা ভিক্ষুর পক্ষে অত্যন্ত হীন, অশোভনীয় ও ঘৃনার কাজ।

একজন প্রকৃত ভিক্ষুর কাজ অনেক অনেক উর্ধ্বে ও বর্ণনাতীত উৎকৃষ্ঠ। তিনি সদ্ধর্ম্মের ধারক, বাহক এবং রক্ষক। তাই সদ্ধর্ম্ম প্রচারে ও প্রসারের মূলে শাসনবাহী ভিক্ষু সঙ্ঘের জীবন সদা সর্বদা উৎসর্গীত। তারা (ভিক্ষুসংঘ) শীলকথা, সমাধি কথা, প্রজ্ঞা কথা, বিমুক্তি কথা, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শণ কথা, পরমার্থ নির্বাণ কথা এবং কুসংস্কার-মিথ্যা-দৃষ্টি বর্জনের কথা তথা অমৃতোপদেশ ধর্মদান করে থাকেন। এগুলো দ্বারা ধর্মের পরিহানী হয় না, শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি, প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পায়, সদ্ধর্ম্মের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। তাই এসবই ভিক্ষুর আসল (যথাযথ) কর্তব্য।

গৃহী সংসর্গ না করা-গৃহীদের সাথে ওতপ্রোতভাবে না থাকাকে গৃহী সংসর্গ না করা বুঝায়। গৃহীদের সাথে (বন্ধন জনিত) নানা কাজে জড়িত না থেকে বা গৃহী সংসর্গ ত্যাগ করতঃ কায় বিবেক সুখে অবস্থান করা ভিক্ষুর অন্যতম একটা আদর্শ। কারণ, গৃহী সংসর্গে ভিক্ষুর চিত্তের একাগ্রতা ভাবটা নষ্ট হয়ে যায় এবং সমাধি দুর্লভ হয়। গৃহী সংসর্গ অভিলাষী ভিক্ষুর নিজের হিতসুখ সাধিত-তো হয় না পক্ষান্তরে দুঃখ বৃদ্ধি পায়। এতে তার কায় ও মন ক্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে, যার ফলে চিত্তে শান্তি, একাগ্রতা লাভ

হয় না। গৃহী কুলে গমনার্থ উৎসুক ভিক্ষু রস তৃষ্ণায় জড়িত হয়, পৌরহিত্য কারণে সে মার্গফল নির্বাণ সুখাবহ শীল-বিশুদ্ধিভূত অর্থ তা পরিত্যাগ করে।

গৃহী-কুলাদিতে যে পূজা-বন্দনা লাভ করা যায় তা পঙ্কতুল্য। নিকৃষ্ঠ বলে বুদ্ধ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলে থাকেন। এতদৃশ লক্ষ্য করে ভিক্ষুগণকে অবশ্যই গৃহী সংসর্গ হতে সর্বদা মুক্ত থাকতে হবে।

অকারণে অসময়ে ভ্রমণ না করা-অপ্রয়োজনে যথাইচ্ছা এদিক ওদিক ভ্রমণ করা ভিক্ষুদের জন্য বিধেয় নহে। যারা জ্ঞানী, মহৎ তারা অকারণে অসময়ে যত্রতত্র বিচরণ করেন না; এতে তাদের গৌরবতা, সম্মান অটুট থাকে। ভিক্ষুগণকেও অকারণে অসময়ে ভ্রমণ করা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। অকারণে অসময়ে ভ্রমণ করলে সাধারণ দেখায়; অধিকন্তু অরক্ষিত হতে হয়, চিত্ত বিকারগ্রস্থ হয় ও বন্ধনে জড়িত হতে হয়।

তিনি বলেন-বিবিধ স্থান তথা নানাদেশ, নানা জনপদ পরিক্রমায় কোন ফল নেই। অপ্রয়োজনে যথা তথা পরিভ্রমণ করে কালাতিক্রম করা লজ্জাজনক কাজ। ভিক্ষুকে বিনা আমন্ত্রণে অহেতু অকারণে বিহার হতে বিহারান্তরে বিচরণ করাও বিধেয় নহে। ভিক্ষু একস্থানে বসে কর্ম্মস্থান ভাবনা বর্দ্ধিত, বহুলীকৃত, বৈপুল্য লাভ করতঃ দুঃখমুক্তি নির্বাণ সাধনে রত থাকবে।

তোমরা আমার কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছ তোমাদের প্রতি আমার শিক্ষা (উপদেশ); তোমরা শরীরের দিকে কৃশ হও কিন্তু জ্ঞানের দিকে বড় বা মোটা হতে হবে। জ্ঞান ও সত্য নিয়ে তোমাদেরকে নতুন জন্ম লাভ করতে হবে। তোমরা নিজেকে নিজে দমন করো, নিজেকে নিজে জয় করো, নিজেকে নিজে উদ্ধার করো। আত্ম দমন, আত্ম জয়, আত্ম উদ্ধারেই পরম সুখ-শান্তি লাভ হয়। নিজের ভেতর থেকে শান্তি আনতে না পারলে পৃথিবীর কোন স্থানেই কেউই শান্তি দিতে পারে না। সদ্ধর্ম্ম লাভ করতে পারলেই তোমরা নিজেকে নিজে দমন, জয়, উদ্ধার করতে পারবে। একমাত্র অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সদ্ধর্ম্ম লাভ করা সম্ভব। অর্ন্তদৃষ্টি অর্থ হলো নিজেকে জানার লক্ষ্যে সম্যক সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আত্মদর্শন। তোমরা যদি আমার কথা শোন এবং পালন করো, আমি বলছি তোমাদের অবশ্যই শান্তি আসবে, সুখ আসবে, মুক্ত হতে পারবে বা নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ হবে।।

সাধু, সাধু, সাধু।

বনভন্তের দৃষ্টিতে সত্যজ্ঞান

সংগ্রহেঃ
শ্রীমৎ জিনপ্রিয় ভিক্ষু
রাজ বন বিহার, রাঙ্গামাটি।

[লেখনীর প্রারম্ভেই পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের পাদপদ্মে (শ্রীচরণে)সকল ভুল-ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মৃদু স্মৃতি শক্তিতে যেটুকু ভেসে উঠেছে এবং সংগৃহীত বনভন্তের দেশনা নিয়ে আমার এ' প্রবন্ধ, তাই এ প্রবন্ধে ও ভুল থাকা নিতান্ত অস্বাভাবিক কিছু নয়।]

বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞান। তাই শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-বুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন না হলে বৌদ্ধ ধর্ম পালন করা (চাক্মা, মারমা, বড়ুয়া) কারোর পক্ষে সম্ভব নয়, অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মতে, বুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন না হলে শুধু বি.এ. পাস, এম.এ পাস, ত্রিপিটক বিশারদ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম পালন করা যাবে না। উপমায় তিনি বলেন-রাজগুরু ভন্তে তাঁকে (বনভন্তেকে) বলেছিলেন বার্মায় ও বহু বি.এ পাস, এম.এ পাস, ত্রিপিটক বিশারদ ভিক্ষু রঙ কাপড় ছেড়ে চলে যায়। তাই শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-বি.এ পাস, এম.এ পাস ত্রিপিটক বিশারদ হলেও বৌদ্ধ ধর্ম পালন করা যাবে না। বুদ্ধ জ্ঞান না হলে হবে না, পারা যাবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি দিল্লীতে "জ্ঞানরত্ন" উপাধি প্রাপ্ত হয়েও পরবর্তীতে ভিক্ষু হতে চ্যুত জনৈক ভিক্ষুর নাম উল্লেখ করেন।

সেই বুদ্ধ জ্ঞান কি? বুদ্ধ জ্ঞান হচ্ছে দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান এবং তৃষ্ণা ক্ষয় জ্ঞান। চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে পাঁচ প্রকার বুদ্ধ জ্ঞান হলেও লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় বা নির্বাণ সাক্ষাৎ করা যায়। উপমায় তিনি বলেন-বাকী নয় প্রকার বুদ্ধ জ্ঞানকে টেলিভিশনের সাথে তুলনা করা চলে। টেলিভিশন যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস নয়। তাহলে এই জ্ঞান উৎপন্ন হলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই পালন করতে পারবে। তাই শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-বুদ্ধ জ্ঞান না হলে বুদ্ধ ধর্ম পালন করা কারোর পক্ষে সম্ভব হবে না। এই বুদ্ধ জ্ঞান কিভাবে হবে? ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- "দেহ ধারণেই যাবতীয় দুঃখ রাশির সৃষ্টি হয় আর এই দেহের কারণেই যত

সব দুঃখ ভোগ করতে হয়।” তাই দুঃখ পূর্ণ এ দেহকে ভালো ভালো খাদ্য-ভোজ্য দিয়ে সযত্নে লালন-পালন করে শত শত দুঃখ রাশি উৎপন্ন করা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য অনেক সময় দেখা যায় দুঃখ পেলে সেই দুঃখ থেকে বুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে স্বামী-সন্তান, পিতা-মাতা-ভাই হারা পটাচারাই তার প্রকৃত প্রমাণ। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-এ'নশ্বর দেহে সুখ বললে সেখানে বুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। তাঁর মতে, মানুষ, খাওয়া-পড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, গাড়ী-বাড়ি সবই দুঃখ। অর্থাৎ সংক্ষেপে তিনি বলেন-“যা উৎপন্ন হয় এবং তৈরী করা হয় তা সবই দুঃখ।” কিন্তু এতে সুখ আছে বললে সে যথার্থ পাগল। তাহলে এখন দেখা গেল বুদ্ধ জ্ঞান বা নির্বাণ ব্যতীত প্রকৃত সুখ নেই। তাই তিনি বলেন-সুখ আছে বললে যেমন পাগল বলা যায় তেমনি সুখ আছে বলে বিশ্বাস করলে ও পাগল বলা যায়। সুখ পাইতেছি বললে পাগল আর সুখ দেখতেছি বললে তাও পাগল। এতে বুঝা যায়, যারা পাগল তারাই এই অনিত্য সংসারে নশ্বর দেহে সুখ পাই এবং সুখ দেখে।

প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে? শ্রদ্ধেয় বনভান্তে তাঁর দেশনায় বলেন-‘ভগবান বুদ্ধের মতে, লোকোত্তর বা নির্বাণকে প্রকৃত সুখ বলা যায়। ইহা ব্যতীত সবই অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এবং অসার। উপমায় তিনি বলেন-মাটির ১/২ মাইল নীচে সোনা-রূপা, হীরা-মানিক থাকলে ও দেখা না যাওয়ায় লোকে নেই বলেই ধারণা করে। এখানে ও ঠিক তদ্রুপ লোকোত্তর বা নির্বাণ সুখ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে গর্তরূপ অজ্ঞান বিতাড়িত চিত্তে। মাটির নীচে সোনা-রূপা, হীরা-মানিক থাকলেও যেমন দেখা যায়না, ঠিক তেমনি গর্তরূপ অজ্ঞানে লোকোত্তর সুখ বা নির্বাণ সুখ, চতুরার্য্য সত্য থাকলে ও দেখা যায় না। মাটির নীচের সোনা-রূপা, হীরা-মানিক খোঁজ না করলে যেমন পাওয়া যায় না ঠিক তেমনি অবিদ্যা বা অজ্ঞান ও একটি গর্তের ন্যায়, তাতে জ্ঞান উৎপন্ন করতে হয়। তাই গর্তরূপ অজ্ঞানকে খনন করতে পারলে বিদ্যা বা জ্ঞান পাওয়া যায়। যা তিনি অপর এক কথায় বলেন-অবিদ্যা বিরতি থাকলে বিদ্যা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বিদ্যা বা জ্ঞান উৎপন্ন হলে লোকোত্তর সুখ বা নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। উপরে বর্ণিত উপমায় এটিও পরিষ্কার হয় যে, শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পাথর খনন করে পানি পান করতেছেন। অর্থাৎ নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করতেছেন।

গর্তরূপ অজ্ঞান পাথর কিভাবে খনন করা যায়? একমাত্র বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারাই গর্তরূপ অজ্ঞানের পাথর খনন করে লোকোত্তর বা নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করা যায়। এটিই হচ্ছে প্রকৃত সুখ আর অন্য সবই মিথ্যা।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-লেখা-পড়া, ত্রিপিটক বিশারদ, পালিশাস্ত্র বিশারদ, স্ত্রী-পুরুষ সবই মিথ্যা। তবে তিনি উপমায় বলেন-লেখাপড়ার জ্ঞান হচ্ছে ম্যাচের একটু একটু আলো সদৃশ। অন্ধকারে তা দিয়ে চলাফেরা করা যায় না। কারণ ম্যাচের আলো বাতাসে নিভে যায়। এখানে বি.এ পাস, এম.এ পাস ও ম্যাচের আগুণের মত। কিন্তু ৪/৫ ব্যাটারী টর্চ দিয়ে গমনে কোন অসুবিধা হয় না, তার চেয়ে বৈদ্যুতিক আলো বা সূর্য্যের আলো বেশী সুবিধা। বুদ্ধ জ্ঞান হচ্ছে বৈদ্যুতিক বা সূর্য্যের আলোর মত যা প্রকৃত সত্যকে চিনতে সাহায্য করে। তাঁর মতে, বুদ্ধ জ্ঞান পেতে হলে লেখাপড়া, চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ বুদ্ধ জ্ঞান থাকলে কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। তবে বুদ্ধ জ্ঞান না থাকলে বি.এ পাস, এম.এ পাস, ধন-সম্পদ, চাকুরী এসবের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। কাজেই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের এখন কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। (বুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত)

সাধু সাধু, সাধু

"ভোগের মাত্রা বাড়ালে সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হতে হয়।" –বনভন্তে।

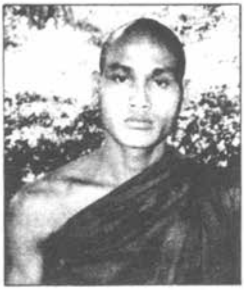

শীল শিক্ষা, সমাধি শিক্ষা, প্রজ্ঞা শিক্ষা

সংগ্রহেঃ
শ্রীমৎ জ্যোতিসার ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-প্রথমে আত্মদমন কর, চিত্তদমন কর, ইন্দ্রিয় কর। তারপর নিজেকে শীল শিক্ষা, সমাধি শিক্ষা, প্রজ্ঞা শিক্ষায় নিয়োজিত রাখো। দমন না হলে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা শিক্ষা করা যায় না। যেমন-অবাধ্য

বা অদমিত বলদ দিয়ে হাল কর্ষণ করা যায় না। পুনশ্চ অলংকার তৈরী করতে হলে প্রথমে স্বর্ণকে আগুনে পুড়ে নরম করতে হয়। তারপর নরম হলে ইচ্ছামত পছন্দ অনুযায়ী গয়না তৈরী করা যায় তার আগে নয়। এখানেও দমিত না হয়ে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা শিক্ষা করতে যাওয়া মানে মূর্খতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। এতে শুধু দুঃখ পেতে হয়, সফলতা কখনো আশা করা যায় না। শীল শিক্ষা হল, -সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব। সমাধি শিক্ষা হল, -সম্যক ব্যায়াম, সম্যক, স্মৃতি, সম্যক সমাধি, প্রজ্ঞা শিক্ষা হল,- সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প।

শীল শিক্ষা দ্বারা ব্যতিক্রম ক্লেশ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেই ব্যতিক্রম ক্লেশ হচ্ছে, প্রাণীহত্যা, চুরি কর্ম, ব্যভিচার, মিথ্যা, কটু, ভেদ, বৃথা বাক্য, আর মিথ্যা জীবিকা। সমাধি শিক্ষা দ্বারা পঞ্চ নীবরণ বা পর্যটন ক্লেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেই পর্যটন ক্লেশ হচ্ছে,-কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্থানমিদ্ধ, ঔদ্ধ্যত-কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা। প্রজ্ঞা শিক্ষা দ্বারা (সপ্ত) অনুশয় ক্লেশ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেই অনুশয় ক্লেশ হচ্ছে,- কাম রাগানুশয়, ভব রাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টি অনুশয়, বিচিকিৎসা অনুশয়, অবিদ্যা অনুশয়।

শীল শিক্ষা, সমাধি শিক্ষা, প্রজ্ঞা শিক্ষা, সর্বোপরি শীল অভ্যাস, সমাধি অভ্যাস, প্রজ্ঞা অভ্যাস, শীল আচরণ, সমাধি আচরণ প্রজ্ঞা আচরণ, শীল ধারণ, সমাধি ধারণ, প্রজ্ঞা ধারণ, শীল পূরণ, সমাধি পূরণ, প্রজ্ঞা পূরণের মধ্যে নির্বাণ নিহিত। নির্বাণ যেতে হলে প্রথম চিত্তের ক্রমিক গতি, ক্রমিক শিক্ষা, ক্রমিক আচরণ অভ্যাস করতে হয়। কারণ চিত্তের ক্রমিক গতি, ক্রমিক শিক্ষা, ক্রমিক আচরণ হতে না হতেই হঠাৎ অরহত্ব ফল লাভ হয় না।

ভিক্ষুদের এরূপ শপথ নিতে হবে 'আমি উত্তম ধর্ম আচরণ করব, শ্রেষ্ঠ ধর্ম আচরণ করব; উত্তম ধর্ম ধারণ করব, শ্রেষ্ঠ ধর্ম ধারণ করব। মিথ্যাপথ ছেড়ে সত্য পথ অনুসন্ধান বা অণুশীলন করব। লৌকিক সুখ ত্যাগ লোকোত্তর ধর্ম গ্রহণ করব। সুখ ভোগ বা ভোগ বিলাস ত্যাগ করব। ত্যাগ, নিরোধ, নিবৃত্তি, অনাসক্তিতে বলীয়ান হবো'। এতে আমার জন্ম-মৃত্যু নিরুদ্ধ হয়ে চির সুখ নির্বাণ সাক্ষাৎ লাভ হবে।

তিনি বলেন-তোমাদের চিত্ত সত্য পথে যাচ্ছে না মিথ্যাপথে যাচ্ছে, কুশল পথে যাচ্ছে না অকুশল পথে যাচ্ছে তা জানতে সচেষ্ট হও। যদি মিথ্যা, অকুশল পথের দিকে ধাবিত হয় তাহলে চিত্তকে সত্য, কুশল পথে ফিরে আনো। লোভ, হিংসা, অজ্ঞান না থাকলে সত্য পথ বা সত্য ধর্ম হয়।

পাপ হতে পৃথক থাকা, অকুশল হতে পৃথক থাকা, মিথ্যা হতে পৃথক থাকা, অজ্ঞান হতে পৃথক থাকা জ্ঞানীর লক্ষণ। মনে রাখবে, কামাতুর ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করতে পারে না। তোমরা কাম ত্যাগ কর রূপ ত্যাগ কর, বেদনা ত্যাগ কর। পঞ্চস্কন্ধের প্রতি যে ইচ্ছারাগ বা ছন্দরাগ থাকে তা দমন কর। যেই ব্যক্তি এ সমস্ত অকুশল, পাপ, অজ্ঞান হতে বিরত হয়েছেন তিনিই মুক্ত, শান্ত, চির সুখী।

নিত্য সংযমী, আত্মজয়ী যেইজন তাকে দেবতা, ব্রহ্মা, মার কেউই পরাজিত করতে পারে না। শীল সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান আর সদা জাগ্রতভাব এ চারি গুণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। এতে ব্রহ্মচর্য দৃঢ়, শ্রীবৃদ্ধি হবে মার্গফল লাভ করা সম্ভব হয়।

"ভোগ আসক্তি সংযোজন ছিন্ন যার হয়,
দুঃখ মুক্ত শান্ত তিনি জানিবে নিশ্চয়।
ধন জন মানে যেবা মোহ যুক্ত হয়,
ভোগাসক্ত দুঃখ তার মুক্ত কভু নয়।"

সাধু, সাধু, সাধু।।

অর্ন্তদৃষ্টি ভাব

সংগ্রহেঃ শ্রীমৎ সুমন ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

সর্দ্ধম্ম বুঝার এবং জানার যার আগ্রহ থাকে তার প্রয়োজন অর্ন্তদৃষ্টিভাব। অর্ন্তদৃষ্টিভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরা সর্দ্ধম্ম বুঝতে পারে। আর অর্ন্তদৃষ্টি ভাবহীন ব্যক্তিদের সর্দ্ধম্ম বুঝা কঠিন। অর্ন্তদৃষ্টি ভাব অর্থ নিজকে বুঝার ক্ষমতা। ভগবান বুদ্ধ বলেন, দেশনা শ্রবণের সময় যার অর্ন্তদৃষ্টিভাব উৎপন্ন

হয় সে ব্যক্তি নিজেকে সহজেই বুঝতে পারে। আর অন্যজনের পক্ষে বুঝা খুবই কঠিন। যেহেতু স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতু এ গুলি সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বুঝা যায়না। বলাবাহুল্য ভগবান বুদ্ধ বলেন, সাধারণ মানুষ আমার ধর্ম অনুধাবন করতে পারবেনা। সাধারণ মানুষ ভুল ভ্রান্তি বশতঃ কত অন্যায়, কত অপরাধ করতে থাকে তার অন্তঃ নেই। তবে যেদিন মানুষ ভুল ভ্রান্তি বুঝতে পারবে সেদিন হতেই অন্যায়, অপরাধ কাজ করতে সাহস পাবেনা। কারণ তারা তখন সম্পূর্ণ ভুল ভ্রান্তির উপরে। ভগবান বুদ্ধ বলেন, সে ভুল ভ্রান্তি কোথায় থাকে, তা বাহির করে যথাযত সুচিকিৎসা কর। মন এবং চিত্তের মধ্যেই ভুল ভ্রান্তি থাকে তা আরোগ্য হলে বিপুল সুখের অধিকারী হওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধ বোধিমূলে জ্ঞান লাভ করে দেখতে পেলেন মানবের মধ্যে কতগুলো শত্রু বিদ্যমান। সে শত্রু গুলো কাম প্রবৃত্তি, হিংসা প্রবৃত্তি এবং রাগ প্রবৃত্তি। এ তিনটা প্রবৃত্তি হচ্ছে মানবের প্রধান শত্রু। কিন্তু অবিদ্যা অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষ এ শত্রু গুলো আহার দিয়ে পোষণ করছে বলে দিবা-রাত্রি শান্তি নেই। বুদ্ধ বলেন, এ শত্রুগুলো দিন-রাত্রি পোষণ না করে জয় কর। তা একমাত্র জ্ঞানের বল, সত্যের বল এবং কুশলের বল থাকলে জয় করা, সম্ভব। যারা অসাধারণ এবং অর্ন্তদৃষ্টি ভাব সম্পন্ন তারাই এ সম্বন্ধে জানতে পারে। আর যারা সাধারণ অর্ন্তদৃষ্টি ভাবহীন তারা ইহা জানেনা এবং বুঝে না বলে অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়ে সীমাহীন দুঃখ সাগরে পতিত হয়। সেজন্য মানুষের বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রয়োজন। পৃথিবীতে সূর্য্যের আলো প্রভাবিত হলে যেমন পৃথিবীর সব জিনিস দেখতে পায় ঠিক তেমনি মানুষের বিদ্যা বা জ্ঞান উৎপন্ন হলেও একে-বিবাদ, অস্ত্র উত্তোলন, দন্ড উত্তোলন এবং দল গঠন ইত্যাদি দোষণীয় কার্য সমূহ বিসর্জ্জনে দেখতে পায় ইহা দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের পথ বা রাস্তা। তাতে আর অসার নিয়া টানাটানি হয় না। ভগবান বুদ্ধ বলেন, জগতে দুঃখ আছে সত্য, এবং দুঃখের উৎপত্তি ও যে আছে এটাও সত্য। আবার দুঃখ নিরোধ আছে এবং দুঃখ নিরোধের পথ বা রাস্তা ও আছে। যেমন উপমা, আগুন যদি থাকে, আগুনের উৎপত্তি ও অবশ্যই থাকবে। আর আগুনকে নিভানোর জলও আছে। তাই অবিদ্যাকে বিদ্যা উৎপাদনের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন করলে বিদ্যা উৎপন্ন হয়, অবিদ্যা উৎপন্ন হতে পারে না। ফলে প্রকৃত সত্যের উজ্জ্বল আলো প্রকাশিত হয়। কিন্তু মানুষ লোভ, হিংসা এবং অজ্ঞানের কারণে মৃত্যু

তুল্য দুঃখ পাচ্ছে এবং মৃত্যুও হচ্ছে। সেজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা স্বল্প সুখ পরিত্যাগে বিপুল সুখ অন্বেষণ করেন। এখানে বিপুল সুখ হচ্ছে লোকোত্তর বা নির্বাণ। ইহা ব্যতীত অন্য সব স্বল্প। সেজন্য বুদ্ধের উপদেশ লোভ, হিংসা এবং অজ্ঞান বিনাশ করা। যেহেতু লোভ পরায়ন মানুষ দান দিতে পারে না. মরণের পর প্রেতলোকে জন্ম নেয়। হিংসা পরায়ন মানুষ শীল পালন করতে পারে না। মরণের পর নরকে জন্ম নেয়। আর অজ্ঞান বা মোহ পরায়ন মানুষ ভাবনা করতে পারেনা, মরণের পর পশু-পক্ষী কুলে জন্ম নেয়। অপরপক্ষে অলোভী দান দিতে পারে, মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। অদ্বেষী শীল পালন করতে পারে, মরণের পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। আর অমোহী ভাবনার দ্বারা মধ্যম পথ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ লাভ করতে পারেন। এ সম্বন্ধে জানেনা বলে মানুষ চারি অপায়ে পতিত হয়। সেজন্য, বৌদ্ধ ধর্মে জীব হিংসা এবং জাতিভেদ নেই। বুদ্ধের উপদেশ জাতিভেদ উচ্ছেদ করা। জাতি জীবিত থাকাকালীন ব্যবহারিক সত্য মাত্র। কিন্তু মৃত্যু হলে এর অস্তিত্ব থাকে না। সেজন্য লোকোত্তরের মতে মিথ্যা। জাতিভেদ হতে স্বার্থপরতা, ঘৃণা, হিংসা এবং মর্যদাহানির জন্ম হয়। বৌদ্ধ ধর্ম জানতে হলে জাতিভেদ উচ্ছেদ করতে হবে। যারা জ্ঞানী অবশ্যই বুঝতে পারবেন।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

বনভন্তের দেশনা (কবিতা ছন্দে)

শ্রীমৎ করুণা বর্দ্ধন ভিক্ষু

ফুরমোন বনবিহার, ভাবনাকেন্দ্র।

(১)
প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারা
সৎপুরুষ দর্শন সদ্ধর্ম আচরণ আর
সদ্ধর্ম শ্রবণ,
মুক্তিকামী দুঃখগ্রস্ত
যত জীবগণ,
এই চারি উপায়ে কর
নির্ব্বাণ দর্শন।

(২)

দয়া, ক্ষমাশীল যেই
মৈত্রী পরায়ন,
পূণ্যকর্মে নির্ভীক আর
অক্ষুন্ন যেজন
পঞ্চগুনে সবে তিনি
পন্ডিত সুজন,
পণ্ডিত নামের অধিকারী
কেহই না হন।

(৩)

চিত্তের নির্মলতা, উচ্চাকাঙ্খা
আর উচ্চমন,
উচ্চ মনের অধিকারী
মুক্তিলাভী গণ
জীবন ও মনুষ্য সুখ
ত্যাগ করিবে সবে,
নিবৃত্তি সুখ লভিয়া
নির্বান গবেষণা করিবে।

(৪)

এম.এ পাশ বা ত্রিপিটকে
পারদর্শী জন,
তারা কভু প্রকৃতরূপে
শিক্ষিত না হন
বুদ্ধজ্ঞান জন্মিয়েছে
যাহার অন্তঃ স্থলে,
প্রকৃত শিক্ষিত তবে
তাহাকেই বলে।

(৫)

কামলোভ, সৌন্দর্য স্পৃহা
ধনলোভ আর,
রাজ্যলোভ, বিদ্যালোভ (আজি)
হেরে সবাকার।
এতে জাগে হিংসা আর
অজ্ঞানতা যত,
অধর্মের পাগল ইহা
জানিবে নিশ্চিত।

(৬)

বহু যন্ত্রাংশের সমন্বয় যথা
রেডিওতে আছে,
অনেক কিছু দেখি তথা
পঞ্চস্কন্ধ মাঝে।
স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে
রেডিওর ধারণা
উপদানে পৃথক পৃথক
করহ তুলনা।
অবিদ্যা হেতু শুনিবেনা
বি.বি.সি খবর,
শুনিলেই দুঃখ পাবে
সারা জীবন ভর।

(৭)

জ্ঞান, বুদ্ধি আর কৌশল নিয়ে
থাকো অনুক্ষণ,
ভন্তের মতে সকল লোকের
বিশেষ প্রয়োজন।
এ অবস্থায় কোন বিঘ্ন
সৃষ্টি নাহি হয়

অপ্রমাদের কাছে 'মার
মানে পরাজয়।

(৮)
এ জগতে জ্ঞান আর
শ্রদ্ধার অভাব,
দেখা যায় নীচতার
হীনত্বের স্বভাব
এমন হইলে দুঃখ
ভোগে সর্বজনে,
শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসেই
ভোগ্য সম্পদ আনে।

(৯)
ভিক্ষুগণ!
নারীর প্রতিটি অঙ্গ
মারনাস্ত্র ভাবিবে
ছুড়ি, পিস্টল, গুলির সাথে
তুলনা করিবে।
বনের বাঘে খেলে কেবল
দেহের মাংস খাবে,
নারী বাঘে খেলে 'জ্ঞান
ধ্বংস হয়ে যাবে।

(১০)
অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ কর
প্রাণনাশ নাহি কর
ত্যাগেই মহান সুখ
আর্য্য মার্গে সোজা চল,
সদা সম্যক বাক্য বল
ভোগেই যে কত দুঃখ।

(১১)
সাধারণ আর হীন যারা
সংসারের কার্যে তারা
লিপ্ত রহে সর্বক্ষণ,
শান্তিকামী জন সেই
একা বিহারী হয় সেই
লোকসমাজ করিয়া
বর্জন।

(১২)
নিরামিষ খেলে কেহ
সাধু নাহি হয়,
শীলেই প্রতিষ্ঠিত যেই
সাধু তারে কয়।

(১৩)
লোকধর্মে বিচলিত
না হয় যেজন,
আপন মনে করে নিজ
কর্তব্য সাধন,
প্রজ্ঞা আর বীর্যে চলে
মুক্তি অন্বেষিতে
মারের জটিল ক্লেশে (সেই)
না পায় ভূঞ্জিতে।

(১৪)
সুখ, দুঃখ, নিন্দা, প্রশংসা
লাভ অলাভ আর,
যশ, অযশ–এই অষ্ট
থাকে অনিবার।
বাতাসে শীলাময় পর্বত

যেন নাহি নড়ে,
অবিচল থাকেন পন্ডিত
লোকে যাহা করে।

(১৫)
জীবনে যৌবন রক্ষা
বড় কষ্টকর,
চিত্তে অবিদ্যা প্রবেশিয়া
করে ধড়-ফড়,
বিদ্যা আর প্রজ্ঞায় 'ক্লেশ
ছেদন করিবে,
অষ্ট মার্গে ব্রহ্মচর্যায়
একাই চলিবে।

(১৬)
চিত্তদমন, আত্মদমন, ইন্দ্রিয়দমন
প্রকৃত দমন ইহা-জান সর্বজন
এই তিনে পন্ডিতগণে
সদা সংযত,
স্মৃতি সাধনে মন্দ সব
করে প্রতিহত।

(১৭)
চতুরার্য্য সত্য আর
প্রতীত্য সমুৎপাদ,
আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ-বিনা
সদ্ধর্মের আস্বাদ-
লোভ, দ্বেষ, মোহ হেতু
কেহ নাহি পায়,
ভবমুক্তি ভ্রান্ত হয়ে
নরকেতে যায়।

(১৮)
লোভ, হিংসা আর অজ্ঞানতায়
"স্বর্গ–নরক আছে বিদ্যমান",
–বিশ্বাস করিতে কেহ নাহি চায়
দেব, ব্রহ্ম কিংবা নির্ব্বাণ।

[শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মুখনিঃসৃত বাণী কবিতা আকারে সংকলিত]

রাজ বনবিহারে শ্রামনদের দৈনন্দিন কর্তব্য

শ্রীমান আর্যনন্দ শ্রামণ
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

আপনারা বোধ হয় জানেন রাজ বনবিহার অন্যান্য বিহার হতে একটু ভিন্ন ধরণের। যেমন ধরুন, অন্যান্য বিহারের শ্রামনেরা স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করতে পারে। প্রয়োজন বোধে বিহারের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাজার হতে ক্রয় করে আনতে পারে। কিন্তু রাজ বনবিহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কতগুলি নিয়ম অনুযায়ী চলতে হয়।

প্রথমেই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নির্দেশ হল, যে যতটুকু গৃহী অবস্থায় লিখা পড়া করুক না কেন অত্র বিহারে এসে বৌদ্ধ ধর্মীয় লিখা পড়া ছাড়া অন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেনা। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী বিনয়, নীতি, শিক্ষা ও অভ্যাস প্রতিপালন করতে হয়। যারা উক্ত নির্দেশ অনুসরণ করতে সমর্থ তারাই রাজ বনবিহারে স্থায়ী শ্রামন হিসেবে থাকতে পারে। রাজ বনবিহারে শ্রামনদের দৈনন্দিন কর্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিবরণ দিচ্ছি।

রাত ৩-০০ টায় ঘুম থেকে উঠে পায়খানা-প্রস্রাব ও হাত-মুখ ধুইতে হয়। সাড়ে ৩-০০ টায় বুদ্ধ বন্দনায় যোগদান ও প্রত্যবেক্ষন মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ভোর ৪-০০ টায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মাইকে সূত্র পাঠের যে ক্যাসেট বাজান হয় তা মনোযোগের সহিত শুনতে হয়। ভোর সাড়ে ৪-০০ টায় বিভিন্ন সময়ে পালাক্রমে ক্যাসেটে ধর্মদেশনা ও বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগীত শুনতে

হয়। ভোর ৫-০০ টায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধ্যান কুঠিরে গমন, বন্দনা ও তাঁর ধর্মদেশনা শ্রবণ। এ ধর্মদেশনা প্রত্যহ ভোর ৬-০০ টা পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ ও লোকোত্তর দিগ নির্দেশনা করে থাকেন। মধ্যে মধ্যে সাড়ে ৬-০০ টা পর্যন্ত ধর্মদেশনায় তিনি রত থাকেন। সকাল সাড়ে ৬-০০ টায় জলযোগ গ্রহণ। সকাল ৭-০০ টা হতে সাড়ে ১০-০০ টা পর্যন্ত নিজ নিজ কুঠিরে বিভিন্ন সূত্রাদি ও নিত্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় পুস্তক অধ্যয়ন করতে হয়। শ্রামনদের মধ্যে কেউ কেউ সকাল সাড়ে ৮-০০ টায় পিন্ডচরণে বের হয়। সকাল সাড়ে ১০-৩০ টায় স্নান ও ১১-০০ টায় ভোজন। দুপুর ১২-০০ টা হতে ৪-০০ টা পর্যন্ত নিজ নিজ কুঠিরে ধ্যান অনুশীলন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, কায়গতাস্মৃতি মৈত্রী ও বিদর্শন ভাবনার অনুশীলন করতে হয়। বিকাল ৪-০০ টায় পানীয় গ্রহণ। বিকাল ৫-০০ টায় বুদ্ধ বন্দনা। বিকাল ৬-০০ টায় দশশীল গ্রহণ ও প্রত্যবেক্ষন মন্ত্র পাঠ। সন্ধ্যা সাড়ে ৬-০০ টায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বন্দনা করে নিজ নিজ কুঠিরে ধ্যান অনুশীলন। রাত ৭-০০ টা হতে ১-০০ টা এবং ১-০০ টা হতে ৪-০০ টা পর্যন্ত পালাক্রমে রাজ বনবিহার পাহাড়া দিতে হয়। যেহেতু অনেক সময় অত্র বিহারে চোরের উপদ্রব দেখা যায়। যাদের পাহাড়া দেয়ার দায়িত্ব থাকে না তারা রাত ১১-০০ টা হতে রাত ৩-০০ টা পর্যন্ত ঘুম যেতে পারে।

রাজ বনবিহারে প্রায় সময় দুই প্রকার শ্রামন থাকেন। যারা অস্থায়ী শ্রামন তারা কিছুদিন দশশীল পালন করে আবার গৃহীজীবনে চলে যান। যারা স্থায়ী শ্রামন,-তারা দশশীল পালন করে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নির্দেশ অনুযায়ী চলে পরবর্তীতে ভিক্ষুত্বে উন্নীত হন। অনেক সময় দেখা যায় যদি কেউ দশশীল ভংগ অথবা অত্র বিহারের নিয়ম লংঘন করে থাকে, সংঘে সংগেই বিভিন্ন শাস্তি ভোগ অথবা গৃহীজীবনে চলে যেতে বাধ্য হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংক্ষেপে উপদেশ হল------যারা প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করবে তারা অবশ্যই দুঃখমুক্তি লাভের জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকতে হবে। যাদের পূর্ব জন্মের পূণ্য পারমী, ইহজন্মের দৃঢ় প্রচেষ্টা এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নির্দেশ অনুযায়ী শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন, অভ্যাস, আচরণ, ধারণ ও পূরণ করবে, তারাই পরম সুখ নির্বান লাভ করতে পারবে।

সকল প্রাণী সুখী হউক।

আমার স্মৃতি পাতা থেকে
শ্রদ্ধেয় বনভন্তে

ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়
চাকমা রাজা

পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে দর্শন করার প্রথম সুযোগ পেলাম কিশোর বয়সে, লংগদু ভ্রমনে গিয়ে। লংগদুস্থ টিনটিলা বনবিহারের বৃক্ষ পরিবেষ্টিত ছায়া ঘেরা শান্ত পরিবেশটি দেখে মুগ্ধ হলাম। অসংখ্য কাঠ-বিড়ালী এগাছ থেকে ওঘাচে নির্ভয়ে লাফালাফি করছে। পাশে নদীর পাড়ে গিয়ে দেখলাম চড়ে অসংখ্য বড় বড় মাছ পাড় ঘেঁষে বিচরণ করছে। বুঝতে কষ্ট হলো না যে, এই কাঠ-বিড়ালী ও মাছগুলো। মানুষের যাতায়াতের মাঝামাঝি বিচরণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে। যেহেতু তারা জানে যে, কেউ তাদেরকে ক্ষতি করবে না। মনে পড়ল তথাগত বুদ্ধের অহিংসার বাণী। যার মর্মার্থ হলো শুধু মানুষের প্রতি মৈত্রী নয় বরং সর্বজীবের প্রতি দয়া।

দ্বিতীয়বার লংগদু গেলাম। সম্ভবতঃ ৭৪ সনে। আমার ঠাকুর মা রাজমাতা বিনীতা রায়-সহ বনভন্তের কাছে শরণাপন্ন হলাম। রাঙ্গামাটিবাসীর পক্ষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে আমন্ত্রন জানাতে, যাতে তিনি স্থায়ীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর রাঙ্গামাটি শহরে বসবাস করেন। আলোচনার মাঝে রাজমাতা ভন্তের কাছ থেকে উপদেশ চাইলেন কিভাবে আচরণ করলে সবার জন্য মঙ্গল হবে। উত্তরে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে একটি নাতিদীর্ঘ দেশনার মাধ্যমে মঙ্গল কর্মের বিবরণ দিলেন এবং একটি কাগজে তাঁর দেশনার সাবমর্ম স্বহস্তেও লিখে দিলেন। সে কাগজ আর আমি দেখিনি, তবে এখনও মনে আছে প্রথম কয়েকটি লাইনে লেখা ছিল "মাতা-পিতাকে সেবা করা, পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা করা .... মঙ্গলজনক"। অনেক পরে বুঝতে পারলাম যে, শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় তাঁর নিজস্ব ধঙে মঙ্গলসূত্রের সারমর্ম সে কাগজে লিখে দিয়েছিলেন।

ভন্তের দেশনা শুনে ও কাগজের লেখা পড়ে যতখানি হৃদয়ঙ্গম হলো ছোটবেলা থেকে বারংবার। পালি ভাষায় মঙ্গলসূত্র উচ্চারণ করে অথবা

স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে সেই সূত্রের ব্যাখ্যা পড়েও ততখানি হৃদয়ঙ্গম হয়নি, উপলদ্ধিতো দূরের কথা। সে যাই হোক, বনভন্তের হাতের লেখায় আশীর্বাদবাণী ও রাঙ্গামাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের আমন্ত্রন গ্রহণের শুভ সংবাদ নিয়ে প্রফুল্ল চিত্তে সবাই রাঙ্গামাটিতে ফিরে আসলাম।

একটি বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে স্বভাবতই ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান যোগদান করার অভ্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া মাঝে মধ্যে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুরা আমাদের বাড়ীতে আমন্ত্রিত হলে ভিক্ষুদের কাছ থেকে দেশনা শুনতাম অথবা ভিক্ষুদের সাথে বয়োজ্যোষ্ঠদের ধর্মালোচনা শুনতাম। কিন্তু শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্যে আসার আগে বৌদ্ধধর্মের লৌকিক ও দৈনন্দিন জীবনে প্রায়োগিক দিকের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম, তবে এখনও যে খুব একটা বুঝে উঠেছি তাও নয়, তবে আগের চাইতে বিন্দুকণা হলেও উপলব্ধি বেড়েছে বৈকি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের চতুরার্য সত্য ও প্রতীত সম্যৎপাদ নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেশনা শুনার আগে পাপ ও পূণ্যের কেবলমাত্র একটি অর্থ আমার জানা ছিল, পাপ করলে নরকে যেতে হবে এবং পূণ্য করলে স্বর্গে যাওয়া যাবে। তাই এই জীবনের অন্তীমে নরকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই ছিল যেন একজন বৌদ্ধ হিসেবে আমার মূল লক্ষ্য।

ইতিহাস স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে যে, সাধারণ ঘরে এবং স্বল্প মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এই সাধকের সান্নিধ্য লাভের জন্য হাজারে হাজারে শিক্ষিত বৌদ্ধ ভিক্ষু, দায়ক ও অন্যান্য জনগণ আসেন। কারণ তাঁর মতো ধর্মগুরু পাওয়া বিরল, যিনি গভীর ধ্যান ও সুষ্ঠু আচরণের দ্বারা লব্ধ গভীর উপলব্ধি নিয়ে দায়ক-দায়িকাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনা করে ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ন্যায় করুণাময়ী কল্যাণমিত্র পেয়ে আমরা যে কত সৌভাগ্যবান তা বোঝা কঠিন। বনভন্তের সান্নিধ্যে এসে হয়তো অসংখ্য নরনারীর নির্বানের হেতু উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া কিছুটা হলেও এগুচ্ছে। তাই আমরা অবশ্যই আশা করব যে, আমরা দীর্ঘদিন ধরে কল্যাণমিত্র শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্য ও আশ্রয় পাব।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরোকে যেমন দেখেছি ও শুনেছি (১৯৪৯ ইং-১৯৬০ইং)

(জীবন বৃত্তান্ত)

সংকলক ও গ্রন্থনায়ঃ
কুমুদ বিকাশ চাক্‌মা

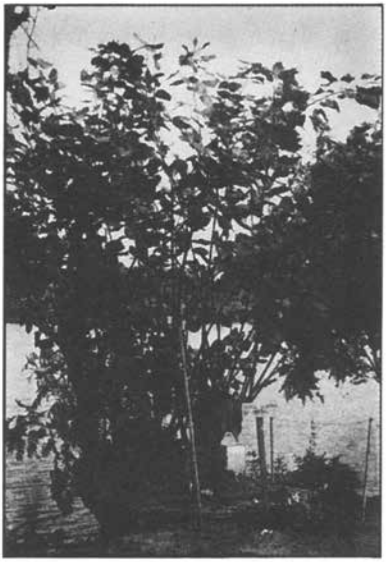

যে বোধি তরু মূলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধ্যান করেছিলেন

স্বচ্ছ সলিলা কর্ণফুলী নদী বিধৌত অঞ্চল রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সদর থানাধীন মগবান মৌজার মোরঘোনা গ্রামে এক মহান দিনে ৮ই জানুয়ারী ১৯২০ ইং সন তারিখে দম্পতি হারুমোহন চাক্‌মা ও বীরপুদি চাক্‌মার কোলে এক শিশু জন্ম গ্রহণ করে। নবজাত শিশুর আগমনে এ দম্পতির জীবনে ও পরিবারে যে আনন্দ ধারা প্রবাহিত হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কে জানত এ মানব শিশু পুত্র একদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের এক মহা মানবরূপে আবির্ভূত হয়ে বৌদ্ধ সমাজ, বৌদ্ধ জাতি ও দেশের জন্যঅনাবিল বিপুল গৌরব বয়ে আনবেন। কে বলতে পারত এ শিশুকালে শ্রদ্ধেয় "বনভন্তে" নামে পরিচিতি লাভ করে" শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো" রূপে মহাসাধন সাধিত করবেন। রাঙ্গামাটির পবিত্র রাজবন বিহারে অসংখ্য দর্শনীয় বৌদ্ধ মন্দির, চৈত্য, সাধনা কুটির, ভাবনাকেন্দ্র, ভিক্ষু পান্থশালা, ভিক্ষু সীমা, চংক্রমনঘর প্রভৃতি স্থাপত্য

ভবনাদি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারকে বাংলার তথা বৌদ্ধ জগতের একটা অন্যতম পবিত্র তীর্থ স্থানে পরিণত করে তুলবেন এবং কে ভবিষ্যৎ বাণী দিতে পারত এ মহামুনিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও পূজা অর্চনার্থে অগণিত ধর্মপ্রাণ পূণ্যার্থীর প্রতিদিন, প্রতি অষ্টমী, প্রতি পূর্ণিমায় আগমন ঘটবে। কেউ কি কখনও ভেবেছে বৌদ্ধ জগতে বছরের শ্রেষ্ঠতম পূত-পবিত্র তিথি ও দিনগুলিতে বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা নববর্ষ প্রভৃতি বার্ষিক দানোৎসব "সার্বজনীন কঠিন চীবর দান" লাভী শ্রেষ্ঠ সীবলী পূজা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন উপলক্ষে হাজার হাজার তীর্থ যাত্রী ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারী পূণ্যার্থী সমাগমনে "ধর্মমেলা" ও "ধর্ম বাজার" বসে রাজবন বিহার প্রাঙ্গন ও আশ-পাশের এলাকা দু'তিন দিন ধরে কোলাহলে মুখরিত ও পরিশোভিত হবে।

পূণ্যবান ও ধর্মপ্রাণ দম্পতির কোলে নবজাত শিশুটি ধীরে ধীরে তিলে তিলে বড় হতে লাগল এবং কালে রথীন্দ্র চাক্‌মা নাম ধারণ করে শৈশব থেকে কৈশরে পা দিলেন। কৈশরে পা দিতেই রথীন্দ্রের বাবা-মা তাঁকে স্থানীয় উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। সেখানে তিনি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে তাঁর শিক্ষা জীবনের ইতি টানলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এরই মধ্যে তাঁকে ভাবুক ভাবুক মনে হতে লাগল। দেখা যেত প্রায় সময় রথীন্দ্র যেন কিসের চিন্তায় মগ্ন। তিনি সংসার ও ভোগ বিলাসের প্রতি ভীষণ উদাসীন ও নির্লিপ্ত ছিলেন। তবু মা-বাবার আশা-ভরসা-রথীন্দ্র একদিন বড় হয়ে তাদের ভরণ-পোষণ লালন পালন করবেন। রথীন্দ্র পিতা-মাতার মনোবাঞ্ছা পূরনার্থে সাংসারিক কাজে তাঁদেরকে সাহায্য করতে ত্রুটি করতেন না বটে, কিন্তু তিনি সংসারী হলেন না কিছুতেই। এক সময় তিনি পিতা-মাতাকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য রেশম বিক্রির ব্যবসা আরম্ভ করেন। বর্তমান ভারতের প্রাদেশিক রাজ্য মিজোরামের দেমাগ্রী শহরে গিয়ে "কুকী রেশম" কিনে এনে রথীন্দ্র স্থানীয়ভাবে গ্রামে গ্রামে ফেরী করে সেগুলো বিক্রি করতেন। এতে তাঁর মানসিকতা ও চিন্তাধারার সাথে গড়মিল দেখা দিল। রেশম বিক্রিতে কামিনী কাঞ্চনের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ বেশী থাকে। এটা তাঁর মানসিকতা ও রুচিবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

তিনি এ রেশম বিক্রির ব্যবসা পরিত্যাগ করে অন্য কোন ব্যবসা বা আয়ের পথ খুঁজতে প্রয়াসী হন। অবশেষে তিনি মগবান মৌজার হেডম্যান বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান এর পুরাতন রাঙ্গামাটি বাজারস্থ (কাপ্তাই হ্রদে নিমজ্জিত) দোকান পরিচালনার "সরকার" (সেলস্‌ম্যান) হিসেবে চাকুরী নেন। সংসারের প্রতি তাঁর কখনও কোন আসক্তি ছিল না এবং তিনি সব সময় ভোগ বিলাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর কর্তাবাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান মৌজার হেডম্যান, জমিদারসম ভূ-সম্পত্তির-মালিক ও বহু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়েও ধনদৌলত, টাকা-পয়সার জন্য হা-হুতাশ করতেন এবং দৈন্যতার মানসিকতা পোষণ করতেন। এতে রথীন্দ্র বিষ্ময় প্রকাশ করতেন, "এত ধন-সম্পত্তির থাকা সত্ত্বেও বিরাজ মোহন দেওয়ান কিসের অভাব অনুভব করেন।"

একদিন রথীন্দ্র গ্রামে বেড়াতে গিয়ে জনৈক ব্যক্তির এগার বছর বয়সের এক কন্যার মৃত্যুতে পরিবারের সবাইকে ভীষণ শোক প্রকাশ করতে দেখেন। তিনি দেখতে পান, বিশেষ করে মৃত কন্যার পিতা-মাতা ভীষণ উচ্চ স্বরে কাঁদছে। তারা বুকে হাত দিয়ে আঘাত করছে, গাছের সঙ্গে জোরে মাথা ঠুকছে, কখনওবা অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। এ দৃশ্য রথীন্দ্র চাক্‌মার জীবনে সিদ্ধার্থে গৌতমের" চারি নির্মিত্ত দর্শন" এর মত ক্রিয়া করল। ভগবান বুদ্ধ সিদ্ধার্থ অবস্থায় জরা, ব্যাধি, মৃত ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী-চতুর্বিধ নিমিত্ত বা দৃশ্য দেখে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। রথীন্দ্র চাক্‌মা এ দৃশ্য দেখে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর মনে সংসারের প্রতি দারুন বিতৃষ্ণার জন্ম নেয়। এ দৃশ্য তাঁকে যেন মহা নিষ্ক্রমণের ডাক দিল। মহাপুরুষের গতি, লক্ষণ ও ক্ষণের যেন মহাসাদৃশ্য দেখা যায়। সিদ্ধার্থ গৌতম ঊনত্রিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে নিষ্ক্রমন্য লাভ করেন। রথীন্দ্রও ১৯৪৯ ইং সনে ২৯ (ঊনত্রিশ) বছর বয়সে সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করে "সরকার" পদের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া নিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু গজেন্দ্র লাল বড়ুয়ার সহায়তায় চট্টগ্রাম নন্দন কাননস্থ বৌদ্ধ বিহারে যান এবং চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাথেরো বি,এ ডিগ্রী ধারী ভিক্ষু মহোদয়ের নিকট ১৯৪৯ ইং সনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

১৯৪৯ ইং সনে রথীন্দ্র চাক্‌মা নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারে 'রথীন্দ্র শ্রমন" এ রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। সেখানে অবস্থান করে তিনি যেন হিমালয়ের পাদদেশে বসে হিমালয়ের রূপ, দৃশ্য, উজ্জ্বলতা অবলোকন করছিলেন এবং ভবিষ্যতে জ্ঞানের আলো লাভ করতে পারবেন- তাঁর মনে এমন চিন্তা চেতনা জাগ্রত হল। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তিনি শিক্ষানবীশ হিসেবে গুরুর নিকট বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। নিজ দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান ছাড়াও তদানীন্তন বাংলার বৌদ্ধ জগতের বহু জ্ঞানী গুণী ভিক্ষু, স্থবির-মহাস্থবিরগণের সান্নিধ্যে আসার সুবর্ণ সুযোগও হয় শ্রমনের। তিনি নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে এর আশে পাশের অনেক বৌদ্ধ তীর্থ ভ্রমণ ও দর্শন করেন। নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারে তিনি এভাবে প্রায় তিন ~~বছর~~ মাস অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাথেরো 'দুঃখ, খুব দুঃখ' বলে প্রায়ই হতাশা প্রকাশ করতেন। রথীন্দ্র শ্রমণ গুরুর এ দুঃখ বুঝতেন না। তিনি মনে মনে ভাবতেন, "গুরুর কিসের এত দুঃখ ?" শিক্ষিত, উচ্চ ডিগ্রীধারী, মহাগণ্যমান্য ভিক্ষু তিনি। খাওয়া-দাওয়া, কোন কিছুর ত্রুটি নেই বললেই চলে। তবু তাঁর গুরুর কি দুঃখ ? একদিন কথার ছলে তিনি গুরুকে 'কিসের দুঃখ পাচ্ছেন' বলে জিজ্ঞেস করেন। গুরু তাঁকে দুঃখের কারণ সঠিকভাবে বুঝাতে পারলেন না। এতে তিনি অনুমান করতে পারলেন যে, তাঁর গুরু এত জ্ঞানী গুণী ও ডিগ্রীধারী ভিক্ষু হয়েও দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেননি এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেননি। এভাবে রথীন্দ্র শ্রমণ নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারে সেই সনের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিলেন। একদিন তিনি গুরুকে জ্ঞান, সম্যক জ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। গুরু অকপটে উত্তর দিলেন যে, সম্যক জ্ঞান তাঁর জানা নেই। তিনি কিভাবে রথীন্দ্র শ্রমণকে সম্যক জ্ঞান বুঝাবেন। তখন রথীন্দ্র শ্রমন নিজে নিজে উপলব্ধি করলেন যে, এ জন কোলাহলে প্রকৃত জ্ঞান, সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি একদিন গুরুকে বন্দনা করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তিনি কোথায় যাবেন, কোথায় সম্যক জ্ঞান পাওয়া যাবে স্থির করতে পারছিলেন না। শেষে চিন্তা করলেন, চিৎমরম বৌদ্ধ বিহার এলাকা

তথা সমগ্র বাংলার শ্রেষ্ঠতম পুরাতন বৌদ্ধ বিহার এবং তীর্থস্থান। এ বিহারের গুরু নিশ্চয়ই কিছুটা সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হবেন। এটা চিন্তা করে তিনি কোন এক দিনে চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারে এসে উপস্থিত হন এবং প্রধান ভিক্ষু বিহারাধ্যক্ষকে বন্দনা করে সম্যক জ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। এতে বিহারাধ্যক্ষ প্রায় আশ্চর্যান্বিত ও বিস্মিত হয়ে রথীন্দ্র শ্রমনকে বললেন- "হে শ্রমন, এটা খুবই দুর্লভ বস্তু, এটা লাভ করা সমজসাধ্য নয়। তোমার-আমার মত রংবস্ত্রধারী ভিক্ষুর পক্ষে সে মহাজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।"। এতে রথীন্দ্র শ্রমন হতাশ হলেন বটে, কিন্তু নিরাশ হলেন না। তিনি কিছুদিন থাকার পর চিৎমরম ত্যাগ করলেন এবং গভীর জঙ্গল, বিবেক স্থান খুঁজতে খুঁজতে প্রথমতঃ তিনি ধুল্যাছড়ি বৌদ্ধ বিহারে আসলেন। সেখানে তিনি থাকলেন কিছুদিন। কিন্তু ধুল্যাছড়ি বৌদ্ধ বিহার ও এস্থান তাঁর মনপুতঃ হল না। তিনি আর গভীর জঙ্গল বিবেক স্থান অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে বর্তমান বিলাইছড়ি থানাস্থ রেইখ্যং কেংড়াছড়ি বৌদ্ধ বিহারে গেলেন। সেখানেও তিনি উপযুক্ত স্থান পেলেন না। খুব স্বল্প সময় থাকার পর তিনি কেংড়াছড়ি বৌদ্ধ বিহার ত্যাগ করে "ধনপাতা"য় এসে হাজির হলেন। এখানে এসে তিনি আর কোন বৌদ্ধ বিহারে গেলেন না। জঙ্গলে, গাছতলায় থেকে ধ্যান সাধনা শুরু করে দিলেন। "ধনপাতা" স্থানটা তাঁর কিছুটা পছন্দ হল। মগবান, বালুখালী ও ধনপাতা মৌজার ত্রিসীমানায় চির হরিৎ বনানী রম্যভূমি ধনপাতা স্থানটি তাঁর বাসস্থানের উপযুক্ত মনে হল। এস্থানটির অবস্থান লোকালয় থেকে খুব কাছে বা খুব দূরেও ছিল না। এ ধনপাতা স্থানটি তিনি সাধন-ভজন ও বিদর্শন ভাবনার উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করলেন।

রথীন্দ্র শ্রমন নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহার ত্যাগ করে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য কৃতসংকল্প হলেন এবং ধুল্যাছড়ি বৌদ্ধ বিহারে এসে বৌদ্ধ ধর্মের কঠোর ব্রত সাধন-ভজনের শ্রেষ্ঠ পথ ধুতাঙ্গ নীতি গ্রহণ করলেন। আমি মায়ের মুখে শুনেছি তিনি নিয়মিত পিন্ডাচরণ করে সিয়ং (পিন্ড) গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেসময় কোন ভিক্ষু-শ্রমন পিন্ডাচরণ করে সিয়ং গ্রহণ করতেন না। শ্রমনের এ ধরণের ধর্মাচরণ দেখে মানুষ যেমন বিস্মিত

হতেন, তেমনই মন্তব্যও করতেন-এটাই বুঝি বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত নীতি। আমি নিজেও অনেকবার শ্রমণকে আমার মার কাছ থেকে পিন্ড গ্রহণ করতে দেখেছি। তিনি পিন্ডাচরণের আগে আগাম কোন খবর দিতেন না বা কোন পূর্ব সংকেত দিতেন না। হঠাৎ নীরবে দরজার সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন (বোধ হয় ২/১ মিনিট)। সে সময়ের মধ্যে কেউ এসে পিন্ড দিলে তা পিন্ড পাত্রে গ্রহণ করতেন। যদি কোন কারণে গৃহস্থ দায়কেরা শ্রমণকে না দেখতে পেতেন এবং তাঁর নির্ধারিত নীতি ও সময়ের মধ্যে শ্রমনকে পিন্ড না দিতেন তিনি ফিরে যেতেন। কেউ যদি পিছন থেকে ডাকেন, "ওহে শ্রমন, পিন্ড নিয়ে যান।" তিনি পিন্ড আনতে ফিরে যেতেন না। কিন্তু কেউ যদি দৌড়ে শ্রমনের আগে এসে বন্দনা করে পিন্ড দিতে চান, তবে তিনি তা গ্রহণ করতেন। নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার ত্যাগ করার পর জ্ঞান অন্বেষণ ও সাধন ভজনের বিবেক স্থান-অনুসন্ধান করতে করতে চিৎমরম, ধুল্যাছড়ি, কেংড়াছড়ি ও ধনপাতা এসে পৌঁছতে প্রায় বছর অতিক্রান্ত হল। এরমধ্যে তিনি প্রকৃত সম্যক জ্ঞান লাভ না করলেও কঠোর ব্রত ও সাধন ভজনের মাধ্যমে কিছুটা স্তর অতিক্রম করেছেন এবং কিছুটা লাভীহয়েছেন বলে প্রমাণ মিলে। বাবার কাছে শুনেছি যেদিন তিনি কেংড়াছড়ি বৌদ্ধবিহার ছেড়ে ধনপাতার দিকে যাত্রা করেন এবং পথে ধনপাতা ও কৌশল্যাঘোনা মৌজার সীমানায় চংড়াছড়ি নামক মগ পাড়ায় সকালে পিন্ডাচরণ করতে আসেন। পিন্ডাচরণ করার পর আবার গভীর অরণ্যে ফিরে যান এবং কোন গাছতলায় গিয়ে আহার করেন। বাবা বলেছিলেন, সে রাতে খুব ঝড়-বৃষ্টি তুফান হয়েছিল। কিন্তু সকালে রথীন্দ্র শ্রমন (বনভন্তে) সম্পূর্ণ শুকনো কাপড়ে (চীবর) পিন্ড চরণে যান। এটাই বোধ হয় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অলক্ষ্যে জনসাধারণের নিকট সর্বপ্রথম অলৌকিক শক্তি প্রকাশ বা আশ্চর্য দর্শন। ঘটনাটি লোকমুখে মুখে ঘুরছিল এবং বনভন্তের (রথীন্দ্র শ্রমন) প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ধন পাতায় গিয়ে তিনি জঙ্গলের ভিতর বিভিন্ন স্থানে গাছতলায় অবস্থান করছিলেন এবং সে গাছতলা থেকেই পিন্ডাচরণ করতে যেতেন। সাধারণতঃ ভিক্ষু বা শ্রমনেরা বিহারে অবস্থান করেন। কিন্তু রথীন্দ্র শ্রমন কোন বিহারে

অবস্থান না করে বনে-জঙ্গলে অবস্থান করেন বলে মানুষ খুবই অবাক হয় এবং তিনি কি প্রকৃত সাধক না অন্য কিছু এমন মন্তব্য করতে থাকে। তিনি পাড়া-গাঁয়ে পিন্ডচরণ করার পর বন-জঙ্গলের গাছতলায় আহার সেরে ফেলতেন। এভাবে সেখানে বেশ কিছুদিন, মাস বা বছর পার হয়ে গেল। সেখানকার কিছু কিছু ধর্মপ্রাণ লোক রথীন্দ্র শ্রমনের আচার-ব্যবহার ও চাল চলনে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর সাধন ভজনের জন্য একটা নির্দিষ্ট আবাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এলাকার কিছু লোক একত্রিত হয়ে ধনপাতা এলাকাস্থ জগনাছড়ি কুলে শেলজ-ঘাট নামক স্থানে সর্বপ্রথম ছোট একটা কুটির (বাজেই) তৈরী করে দেন এবং সেখানে থাকার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রমনকে ফাং (আমন্ত্রণ) করেন। অনেক অনুরোধ, প্রার্থনা ও বন্দনার পর তিনি সে কুটিরে থাকতে রাজী হন। তারপর থেকে তিনি সেখানে থেকে পিন্ডচরণ করতে বের হতেন, তবে ঐ কুটিরে কোন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে গেলে শ্রমন তা গ্রহণ করতেন না অর্থাৎ কুটিরে তিনি কোন খাদ্যদ্রব্য জমা রাখতেন না। এভাবে কিছুকাল কেটে গেলে স্থানীয় লোকজন শ্রমনের ওপর আরও বেশী শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এ সময় শ্রদ্ধাবান দায়কেরা তাঁর কুঠিরে গেলে তিনি কিছু কিছু দেশনা দিতেন। তাঁর দেশনায় বিশেষত্ব দেখা যায় যে, তিনি 'আমিত্ব' বা আমার শব্দ সম্পূর্ণ বর্জন করতেন। অর্থাৎ দেশনা ছলে কিছু বলতে বা বর্ণনা করতে গেলে আমার না বলে তিনি বলতেন 'শ্রমনের'। পরবর্তীতে স্থানীয় লোকেরা শ্রমণকে আরও সুষ্ঠভাবে দেখাশোনা করার জন্য গভীর জঙ্গলী স্থান শেলজ ঘাট থেকেলোকালয়ের অনতিদূরে তেজমনির (তেজমনি চাক্মা) ভিটায় দ্বিতীয় কুটির তৈরী করে দেন এবং নতুন কুটিরে এসে থাকার জন্য ফাং (আমন্ত্রন) করেন। এলাকার লোকেরা অনেক বন্দনা, অনুরোধ করলে রথীন্দ্র শ্রমণ নতুন কুটিরে আসতে সম্মত হল। এটাই শ্রদ্ধেয় শ্রমণের ধনপাতায় থাকা অবস্থায় স্থায়ী বাসস্থান হয়। ধনপাতা থাকাকালীন সময়ে তিনি অন্য কোন স্থানে আর স্থানান্তরিত হননি। এ ভিটার কুটিরে থেকেই তিনি তাঁর সাধনা পূর্ণ করেন। আস্তে আস্তে তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরমধ্যে তিনি লোকের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন এবং এ উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে দেশনা দিতে থাকেন। কিন্তু শর্ত থাকে যে, অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় নিরামিশ হতে হবে

অর্থাৎ কোন প্রাণী হত্যা করা চলবে না। বাবার মুখে শুনেছি উপরোক্ত শর্ত প্রতিপালিত হবে এ মর্মে অঙ্গীকার করায় স্বনামধন্য জেলা পরিষদের মেম্বার বাবু জিতেন্দ্র লাল কার্বারীর বাবা দিন রাম কার্বারীর (ধনপাতা গ্রামের লেবাছড়ি পাড়া অধিবাসী) শ্রাদ্ধক্রিয়ায় শ্রদ্ধেয় শ্রমণ (বনভন্তে) যোগদান করেন। কিন্তু তিনি সেখানে পিন্ড (আহার) গ্রহণ করেননি। ঘটনাটি এ রকম শোনা গিয়েছিল যে, শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় নিরামিষ শুধু হাঙ্গর শুটকী ও তরকারী রান্না করার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে হাঙ্গর শুট্‌কীসমূহ অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার আগে অনেকটা খেয়ে ফেললে অনুষ্ঠানে তরকারী বা হাঙ্গর শুট্‌কী না কুলানোর সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই শ্রমনের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেও গৃহস্থরা প্রাণী হত্যা করে নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন করেন। শ্রমণ (বনভন্তে) শ্রাদ্ধক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করলেও ঐ আমন্ত্রণে পিন্ড গ্রহণ করেননি। শ্রাদ্ধক্রিয়ায় দান শীলাদি কার্যশেষে পিন্ড গ্রহণ না করে নিজ কুটিরে ফিরে যান।

এরমধ্যে রথীন্দ্র শ্রমনের নাম, গুণ, খ্যাতি, জ্ঞান ও দেশনার সুগন্ধ এ এলাকার চারদিকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। শ্রমন রথীন্দ্রের দেশনা ও বহু অলৌকিক দৃশ্য অলক্ষ্যে মানুষ দেখতে পেয়ে চমৎকৃত হতে লাগলেন। এ ধরণের দু'একটি ঘটনার অবতারণা করা হ'ল (লোক-শ্রুত)

(১) কয়েকজন উৎসাহী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (পাহাড়ী) একদিন রথীন্দ্র শ্রমণকে দর্শন ও কুটিল প্রশ্ন করার মানসে সাত সকালে তাঁর পর্ণকুঠিরে এসে হাজির হয়। শ্রমণ তখন নিজ কুঠিরে ধ্যানমগ্ন। ছাত্ররা বন্দনা করে কুঠিরের এক পাশে বসে পড়ল। কোন বাক্য বিনিময় নেই। শ্রমণ তো নীরবে ধ্যানস্থ। ছাত্ররাও কোন কথা জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু তারা দেখতে পেল, শ্রমণের কোমর ছোট হতে হতে খুব ছোট হয়ে যাচ্ছিল এবং শেষ পর্যন্ত কুমর্য্যা পুক (দেওয়ালে মটির ঘর তৈরীতে পারঙ্গম একপ্রকার উড়ন্ত পিঁপড়া বা মাছি ভ্রমর) এর কোমরের সমান হয়, আবার বড় হতে হতে একসময় কাঁধের সমান বড় হয়। কিছুক্ষণ পর কোমর আবার নিজস্ব আকারে ফিরে আসে। এ দৃশ্য দেখে ছাত্ররা শ্রমণকে ভাল-মন্দ

কোন প্রশ্ন করার সাহস পেল না। তারা শ্রমণকে বন্দনা করে ফিরে চলে (লোক-শ্রুতি) গেল।

(২) একদিন ধনপাতা গ্রামের জনৈক দিনমণি চাক্‌মা, জিতেন্দ্র লাল চাক্‌মা, তীরেন্দ্র লার চাক্‌মা কিছু সংখ্যক যুবকসহ ঘোর সন্ধ্যায় মতলব নিয়ে চুপি চুপি শ্রদ্ধেয় শ্রমণকে তাঁর পর্ণ কুঠিরে দেখতে যান। কুঠিরের কিছু দূরে গিয়ে তারা দেখেন, শ্রমণের কুঠিরের উপর দু'টি বড় বড় চোখ এবং এই চোখওয়ালা প্রাণীটা দু'হাত নাড়াচাড়া করছে। বৃক্ষের সমান এর শরীর, বিকট শব্দ। ভয়ে তারা ছুটে পালিয়ে যান। রাতে কয়েকজন ছেলের জ্বর আসে। সকালে ঘটনাটি জানাজানি হয়। ঘটনা শুনে শ্রমণের বিশিষ্ট দায়ক বাবু কিংকর কার্বারী পরদিন শ্রমণকে ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করেন। শ্রমণ কিছুই জানেন না বলে উত্তর দেন এবং এভাবে মতলব নিয়ে চুপি চুপি সন্ধ্যা বা রাতে তাঁর কুটিরে না যেতে বলেন। (জীবতলী, বাঘাইছড়ির তরনীসেন চাক্‌মা-বর্তমানে মঙ্গল জ্যোতি ভিক্ষু এর উক্তি)।

(৩) শ্রদ্ধেয় শ্রমণ (বনভন্তে) ধূতাঙ্গধারী বলে কোন নতুন চীবর গ্রহণ বা ধারণ করতেন না। এক পোষাক মাত্র চীবর। চীবরটি পুরাতন বা ছিন্ন-ভিন্ন হতে হতে পরবার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে। তবু তাঁকে কেউ চীবর দিতে আসেননি এবং তিনিও কারও কাছ থেকে যাঞ্জা করেননি। শ্রমণের চীবরটি এতই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় যে, নগ্ন হয়ে থাকার উপক্রম হয়। ঠিক সে সময় এবং সে অবস্থায় তিনি এক সাত সকালে দেখতে পান যে, এক বড়ুয়া দায়ক চীবর নিয়ে সেখানে উপস্থিত। তিনি শ্রমণকে চীবর দান করতে চান এবং চীবরগুলি গ্রহণ করার জন্য বন্দনা ও প্রার্থনা করেন। এটাই শ্রদ্ধেয় শ্রমণ (বনভন্তে) কে ধুতাঙ্গ অবস্থায় প্রথম চীবর দান। অনেকের ধারণা-সেই বড়ুয়া দায়কটি দেবরাজ ইন্দ্র ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

শ্রদ্ধেয় শ্রমণ (বনভন্তে) এভাবে ধনপাতা গ্রামে ধর্মদেশনা ও ধ্যান সাধনা করে ১৯৬০ ইং সন পর্যন্ত অবস্থান করেন। কাপ্তাই বাঁধের চ্যানেল বন্ধ করার ও হ্রদের পানি উঁচু করার ফলে ১৯৬০ ইং সনে ধনপাতা ও এ এলাকার সকল স্থান প্রায় ২৫০ বর্গমাইল স্থান জলমগ্ন হতে থাকে এবং সরকার এ এলাকার লোকজনকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে ও স্থানান্তরিত করতে

আরম্ভ করেন। ঐ সনে বর্ষার আগে অর্থাৎ জুলাই/আগষ্ট-৬০ এর আগে এ এলাকার প্রায় ৯০% ভাগ লোক স্থানান্তরিত হয়ে যান। ধনপাতা এলাকা ও ধনপাতা গ্রামের প্রায় লোক এলাকা ছেড়ে চলে যান। এমন কি শ্রমণকে পিন্ডদান করার মত লোকও আর এলাকায় রইল না।

সব লোক এলাকা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরও তিনি সেখানে কয়েক সপ্তাহ থেকে যান। তারপর তিনি ধনপাতা ছেড়ে উত্তর দিকে ভ্রমণ করতে করতে এক সময় নিজ জন্মভূমি মোরঘোনা ও মগবান সীমান্ত স্থান বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান এর পরিত্যক্ত ঘরে গিয়ে উঠেন। দেওয়ান বাবুর ঘরটি কিছুটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল বলে কাপ্তাই বাঁধের পানিতে ডুবে যায়নি। সেখানেও কোন লোকজন ছিল না। তিনি কেথায় পিন্ডাচরণ করবেন? সেসময় শ্রদ্ধেয় শ্রমণের পরম ভক্ত বাবু নিশিমণি চাক্মা দীঘিনালায় গিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রমণকে দীঘিনালায় নিয়ে যেতে আকুল হয়ে উঠলেন। তিনি এরই মধ্যে শ্রমণের সঙ্গে একবার দেখা করে দীঘিনালায় যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। শ্রমণ অবশ্য তৎক্ষনাৎ যাননি। নিশি বাবুর ছোট ভাই তরুনীসেন চাক্মাকে (বর্তমানে মঙ্গল জ্যোতি ভিক্ষু, জীবতলী বৌদ্ধ বিহার, বাঘাইছড়ি) বলে পাঠান যে, তিনি শ্রমণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসছেন। তরনীসেন শ্রমণের সঙ্গে মগবানের বিরাজ মোহন দেওয়ানের পরিত্যক্ত ঘরে গিয়ে দেখা করেন এবং শ্রমণের দীঘিনালা যাওয়ার সদয় সম্মতি আদায় করেন। এ সময় শ্রমণের পিন্ডচরণের খুবই অসুবিধা হয়ে পড়েছিল। সম্ভবতঃ ১৯৬০ ইং সনের শেষের দিকে নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বাবু নিশিমণি চাক্মা শ্রদ্ধেয় শ্রমণকে জীপ গাড়ী যোগে মানিকছড়ি মুখে কর্ণফুলী ও দেবা (হ্রদ) পার করিয়ে মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি পথে দীঘিনালায় নিয়ে পৌছেন। শ্রমণ দীঘিনালায় পৌছার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের খবরও তাঁকে রাখার জন্য বিহার তৈরী করার ধুম পড়ে যায়। অনেক ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িক এতে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রমণের আবাসস্থল থানার নিকটস্থ অনুচ্চ পাহাড়ে গড়ে ওঠে। সেখানেই তিনি ১৯৬১ ইং সনে ভিক্ষু উপসম্পাদা লাভ করেন এবং সাধনানন্দ ভিক্ষু নামে নাম ধারণ করেন। বনে বসবাস করেছেন বলে

বনভন্তে নামে পরিচিত হন। ১৯৭০ইং সন পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। ১৯৭০ ইং সনে লংগদু খেদার মারা পরিদর্শন করে শেষে তিনটিলায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনটিলায় ১৯৭৩ ইং সনে সর্বপ্রথম ২৪ ঘন্টায় তুলো থেকে সুতো কেটে কাপড় বুনে চীবর তৈরী করে" মহা কঠিন চীবর দান" সূচনা ও প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ ইং সনে চাক্‌মা রাজা বাহাদুরের রাজ বিহারে দ্বিতীয় বার ও রাঙ্গামাটিতে সর্ব প্রথম তুলো থেকে সুতো কেটে কাপড় বুনে চীবর তৈরী করে "মহা কঠিন চীবর দান" করা হয়। এই দান প্রথা ও দান পদ্ধতি ধারাবাহিক হিসেবে এ পর্যন্ত নিয়মিত রাজ বন বিহারে রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৭৪ইং সনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে চাক্‌মা রাজা বাহাদুর ও রাজ পরিবার কর্তৃক দানকৃত প্রায় ১৭ (সতের) একর অনুচ্চ পাহাড় জমির উপর রাজ বন বিহারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭৫ ইং সনে নন্দপাল ভিক্ষু (বর্তমানে মহাথেরো) সহ দু'শিষ্য ভিক্ষু বর্ষাবাস যাপনের জন্য রাজবন বিহারে প্রেরণ করেন। তাঁরা সেখানে বর্ষাবাস যাপন করেন।

১৯৭৭ ইং সনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সশিষ্যে রাজবন বিহারে আগমন ও স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। সে অবধি তিনি রাজবন বিহারে আছেন। ১৯৮১ ইং সনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাস্থবির রূপে বরণ করা হয়।

ভগবান বুদ্ধের জীবন পরিক্রমায় জন্মস্থান-লুম্বিনী, বুদ্ধত্ব লাভ-বুদ্ধ গয়ায়, ধর্মচক্র প্রবর্তন-সারনাথে এবং মহাপরিনির্বান-কুশি নগরে-এ চার মহা পবিত্র স্থান। এটা সকল বৌদ্ধ নর-নারী ও বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের পরম পবিত্র স্থান। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্মস্থান-মোরঘোনা, সাধনা স্থান-ধনপাতা, ধর্মদেশনা স্থান-দীঘিনালা, তিনটিলা, রাজবন বিহার (রাঙ্গামাটি) একইভাবে পবিত্র স্থান। জন্মস্থান মোরঘোনা কাপ্তাই বাঁধের জলে ডুবে গেছে। সাধনাস্থান ধনপাত হাতছানি দিচ্ছে "আমাকেও ভুলো না", দীঘিনালা তিনটিলা ডাকদিচ্ছে "আমাকেও বাঁচাও"। আর রাজবন বিহার (রাঙ্গামাটি) বলছে "আমার আরও দাবী আছে"।

বাবু ইন্দ্র লাল চাক্মা, (প্রাক্তন থানা শিক্ষা অফিসার, রাঙ্গামাটি সদর) বনভন্তের সাধনা ভুমি- ধনপাতার ডাকে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে বনভন্তের বিলুপ্ত সাধনাকুটির (বাজেই) এর বর্তমান জমির মালিক বাবু তরণী চাক্মার কাছ থেকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকায় এক একর জমি কিনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুমতিক্রমে ধনপাতা সাধন বনে স্মৃতি মন্দির নির্মাণের বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নর-নারীকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। ইদানিং শুনলাম দীঘিনালায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বিহারটি পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। এভাবে বনভন্তের পদচারিত সকল স্থানের উন্নয়ন করে পূণ্যের অংশ গ্রহণ করা হোক। শ্রদ্ধেয় বনভান্তের পরিনির্বাণ ভুমি এখনও তাঁর চিত্তে সমাহিত। ঋষি ঋষির কর্তব্য সাধবেন।

বর্তমানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জ্ঞানের খ্যাতি এবং স্বধর্মে পথ প্রদর্শনের কৌশল ও ধর্মদেশনার বাণী ও এলাকার সীমারেখা ছাড়িয়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশ ও বিশ্বের বৌদ্ধ প্রধান দেশ- মায়ানমার (বার্মা), থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে পৌছে গেছে। রাঙ্গামাটি রাজ বনবিহার (কেন্দ্রীয় বিহার) ব্যতিত ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন থানায় ১৫ (পনের) টি রাজবন বিহারের শাখা বন বিহার নির্মাণ করা হয়েছে। আরও অনেক স্থানে রাজবন বিহারের শাখা বনবিহার নির্মাণাধীন এবং নির্মাণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর শতাধিক শিষ্য রাজ বনবিহারে ও শাখা বন বিহার গুলিতে অবস্থান করে তাঁর নির্দেশিত পথে ধর্মানুসরণ, ধর্মপ্রতিপালন ও ধর্মদেশনা দিয়ে আসছেন।

[বিঃ দ্রঃ শ্রদ্ধেয় বনভন্তে শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো এর আংশিক জীবন বৃত্তান্ত চয়ন, সংকলন ও গ্রন্থনায় আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও অজ্ঞানতাবশতঃ অভিভাষণ-এর জন্য আমি শত সহস্রবার ক্ষমাপ্রার্থী শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কাছে ও সকল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে]

শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে যেমন দেখেছি ও শুনেছি

(১৯৬০ ইং - ১৯৭০ পর্য্যন্ত)

সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা (সক্ক)

১৯৬০ সনে কাপ্তাই বাঁধের জলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের সাধনাস্থল ধনপাতার নিকটস্থ লোকালয় সমূহ জলমগ্ন হবার পূর্বে তথাকার বাসিন্দারা অন্যত্র পুনর্বসতি করেন। জনৈক নিশিমনি চাক্‌মা ছিলেন তাঁর একান্ত ভক্ত। তিনি দীঘিনালায়-পুনর্বসতি গ্রহণের প্রাক্কালে শ্রদ্ধেয় রথীন্দ্র শ্রমণকে (বর্ত্তমানে বনভন্তে) দিঘীনালায় স্থানান্তর গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি তথায় খান। উক্ত সময়ে স্থলপথে যাতায়াতের জন্য ভাল রাস্তা ছিল না। শ্রদ্ধেয় শ্রমণকে জীপে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনকার সময়ে রাংগামাটি থেকে দিঘীনালার দূরত্ব প্রায় ষাট মাইল ছিল এবং রাস্তাঘাটের অবস্থা ছিল দারুণ অসুবিধাজনক।

দিঘীনালা থানা সদরের অদূরে একটি অরণ্যময় টিলায় শ্রদ্ধেয় শ্রমণের জন্য একখানি এক কামরা বিশিষ্ট পর্ণকুটির নির্মাণ করে দেওয়া হয় (জানা যায়,-উক্ত পর্ণ কুটিরে উপবেশনের জন্য-একটি মাটির আসন, একটি সাধারণভাবে বসার বিছানা ও একটি বুদ্ধছবি ব্যতীত আর অন্যকিছু ছিল না)। শ্রদ্ধেয় শ্রমণ-উক্ত পর্ণকুটিরে ধ্যানাসনে নিরত ছিলেন। তাঁর ত্যাগময় প্রব্রজ্যা জীবন ও শীলাচার মন্ডিত আচরণে মুগ্ধ হয়ে এলাকাবাসীরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়েন। উক্ত সময়ের এক ঘটনার কথা স্মরণ-করে একবার শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেছিলেন যে, দিঘীনালায় অবস্থানকালে ক্ষুধার জ্বালায় তিনি একসময় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত -হয়েছিলেন। তিনি ক্ষুধার তাড়ণায় এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, তিনি জীবিত আছেন নাকি মরে গেছেন সেবিষয়ে নিজে ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেদিনেই তাঁর মৃত্যু অবধারিত বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর এমন অবস্থার মধ্যে বোয়ালখালী বাজারের জনৈক বড়ুয়া দোকানদার দুধ-দান দিতে যান। উক্ত দোকানদারের শ্রদ্ধা প্রদত্ত দুধ হতে উপর্য্যুপরি দু'গ্লাস দুধ পান করার পর তিনি সম্বিৎ ফিরে

পান। এভাবে তিনি আবার পূর্ণোদ্যমে ধ্যান-সাধনায় আত্মানিয়োগ করতে সক্ষম হন বলে মন্তব্য করেছিলেন।

জনৈক রূপসেন চাক্‌মা (বর্ত্তমান এম-পি বাবু কল্পরঞ্জন চাক্‌মার পিতা) নামক একজন শ্রদ্ধাবান দায়ক তাঁর সেবা-যত্ন করতেন। জানা যায়, উক্ত সময়ে ও প্রত্যহ তাঁর দর্শনে কামনায় ও ধর্মোপদেশ শ্রবণ মানসে বহুলোক এসে ভীড় জমাতেন। তিনি কিছু কিছু ধর্মোপদেশ দানে তাঁদেরকে কৃতার্থ করতেন। ১৯৬১ সনে উপরোক্ত রূপসেন চাক্‌মা মহাশয়ের অগ্রণী উদ্যোগে-মাইনী নদীর বুকে বাঁশের ভেলার উপর ভিক্ষুসীমা করে তাঁকে মাননীয় ভিক্ষু সংঘ কর্ত্তৃক উপসম্পদা প্রদান করা হয়। উপসম্পদার পর মাননীয় ভিক্ষুসংঘ কর্ত্তৃক তাঁর নাম রাখা হয় শ্রীমৎ সাধনান্দ ভিক্ষু। কিন্তু তিনি নিত্য লোকালয়ের বাহিরে বনে অবস্থান করেন বলেই লোকের নিকট "বনভন্তে" নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। উপসম্পদা প্রাপ্ত হওয়ার পরবর্ত্তীকালে তিনি গৃহীদের আমন্ত্রণ রক্ষা করে আমন্ত্রণে গমন করতেন। তবে ভিক্ষু সংঘের সঙ্গে ধর্মীয় কাজে মেলামেশা ও বিনয় কর্মে যোগদান করতেন সত্য তথাপি তিনি আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতেন। তিনি নারীলোকের নিকট সংস্পর্শ থেকে সদা সতর্কতার সঙ্গে সরে থাকতেন। তাঁর প্রকৃত ভিক্ষুসুলভ আচরণের জন্যে দিকে দিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নিজমুখে একবার প্রকাশ করেছিলেন যে, "আমি মাইনী এলাকায় দশ-বছর যাবৎ অবস্থান করেছি, কিন্তু মাইনীবাসীরা আমাকে ভিত্তি করে কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সৃষ্টি করতে পারেনি।" তিনি আরো বলেছেন যে, তথায় অবস্থান কালে জনৈক অশ্বিনী কুমার বড়ুয়া নামে এক ব্যক্তি আমাকে একটি কলম এবং বাবু কল্প রঞ্জন চাক্‌মা (বর্তমানে এম-পি) একটি কম্বল দান করেছিলেন। সেকথা আমার স্মরণ আছে।" জানা যায়, বোয়ালখালী চাক্‌মা রাজ অফিসের রাজেন্দ্র লাল বড়ুয়া নামে একজন সিপাহী-তাঁর খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁর দর্শনে তথায়-গমনা গমন করতেন। দিঘী নালায় অদ্যাবধি তাঁর অবস্থানের জন্য নির্মিত পর্নকুটিরের টিলা খন্ডটি সুরক্ষিত আছে।

(বিঃদ্রঃ -শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও লোক মুখে শ্রুত কথার উপর ভিত্তি করে লিখিত)।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে যেমন দেখেছি ও শুনেছি

১৯৭০ ইং হইতে ১৯৭৬ ইং পর্যন্ত

সংকলক ও গ্রন্থনায় ঃ

প্রতুল বিকাশ চাক্‌মা (নিরোধ)

তিনটিলা, লংগদু

মহা-পুরুষগণের জন্ম দুর্লভ। তাঁরা যেখানে সেখানে জন্ম গ্রহণ করেন না। যে দেশে জ্ঞানীগণ জন্মগ্রহণ করেন সেদেশ এবং সেজাতি সুখ সমৃদ্ধশালী হয়।

সাধারণ লোকের চেয়ে অধিক পূণ্যবান লোকেরাই মহাপুরুষ নামে খ্যাতি অর্জন করে থাকে। মানবকুলে জাত "অরহত" "সম্যক সমৃদ্ধ" এবং তাঁর অনুগত শিষ্যগণই প্রকৃত মহাপুরুষ বা মুক্ত পুরুষ। জ্ঞানীগণ জন্ম জন্মান্তরে পূণ্য পারমীপূর্ণ করেন। অনির্বান কাল কুশল কর্ম করাই তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তারা নিজেই সৎকর্ম সাধনার দ্বারা অন্যকেও সুপথে পরিচালিত করেন। নিজের ত্যাগ, আদর্শ ও সৎচরিত্রতার মাধ্যমে অপরকে উদ্বুদ্ধ করেন কুশল কর্মে। বহুজনের হিত, সুখ ও মঙ্গলের জন্য জ্ঞানীগণ অন্ধকারে আলোর প্রদীপতুল্য। স্বধর্মহারা নরনারীদের সৎপথ দেখিয়ে দিতে পারেন একমাত্র মহাজ্ঞানীরাই। তাঁদের ধর্মে, তাঁদের নীতিতে থাকে আর্য্য অষ্ঠাংগিক মার্গ।

স্বধর্ম হারা নরনারীদের কল্যণার্থে দুঃখ মুক্তির পথ দেখানোর জন্য শ্রাবক বুদ্ধরূপে "এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন' মহান আর্য্য পুরুষ" পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়। তিনি মানবের হিত, সুখ ও দুঃখ মুক্তির অমৃতময় বাণী প্রচার করে আসছেন।

এই ধরাধামে কোথায় এবং কোন স্থানে অবস্থান করলে মানবের হিত সুখ ও মংগলসাধিত হবে, ধর্মের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে, অনুধাবন করতে পারবে এবং স্বধর্মের প্রচার এবং প্রসার ঘটবে মহা-পুরুষগণ দিব্য চক্ষু, দিব্য জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করতে পারেন। "পরম আর্য্য পুরুষ" শ্রদ্ধেয়

সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয় তিনটিলা বনবিহারে আমন্ত্রণ তথা অবস্থান তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

তিনটিলা বনবিহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের আগমন ও অবস্থানঃ-

রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় লংগদু থানা একটি অন্যতম থানা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর। থানার ঠিক মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কাচালং নদী। কাচালং নদীর তীরে অবস্থিত লংগদু থানার প্রাণকেন্দ্র। থানার সদরে অবস্থিত তিনটিলা পাড়া নামক স্থানটি। তিনটিলা পাড়ায় তিনটিলা বৌদ্ধ বিহার'এ "দানোত্তম কঠিন চীবর দানোপলক্ষে" শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের ১৯৭০ ইং সনে আমন্ত্রণ করা হয়। সে সময় তিনটিলা বৌদ্ধ বিহারটি ছিল বর্তমান লংগদু থানার সদরে বি এ ডি সি'র সারের গুদাম যেখানে স্থাপিত হয়েছে, ঠিক সেখানে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে যথাসময়ে দিঘীনালা হতে তিনটিলা বৌদ্ধ বিহারে আনা হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় তিনটিলা বনবিহারে অবস্থান করার পূর্বাভাসঃ-

১৯৭০ ইং সনের কঠিন চীবর দানের তারিখটা আমার স্মরণ নেই। যেদিন পবিত্র কঠিন চীবর দান সেদিন আমি এবং স্বর্গীয় গংগাধন চাকমা প্রকাশ বুড়া চোখী বাপ (যিনি ক্যাংঠাগা নামে সকলের নিকট সুপরিচিত)সহ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বোধিপাল মহাস্থিবের (শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুগত শিষ্য)। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের স্নান সমাপনের পর বর্তমান তিনটিলা বনবিহার এলাকা গভীর অরণ্যভূমির দিকে নির্দেশ করে মত প্রকাশ করলেন যে, ভিক্ষু, শ্রমণ ঐ সমস্ত গভীর অরণ্যে ধ্যান সাধনার উপযুক্ত স্থান। লোকালয়ের নিকটস্থ বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু শ্রমণদের ধ্যান সাধনার অন্তরায় হয়ে থাকে তাহাও ব্যক্ত করলেন। দানোত্তম কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান করার আগে আমি প্রয়াত গংগাধন চাকমার সাথে আলোচনা করে পরম শ্রদ্ধেয় রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বোধিপাল মহাস্থবির মহোদয়গণের পরামর্শক্রমে বাবু অনিল বিহারী চাকমা, প্রয়াত সত্যব্রত চাকমা, প্রয়াত নিশি চন্দ্র চাকমা, প্রয়াত শচীনাথ চাকমা, প্রয়াত বীরসেন চাকমাসহ ফুলের প্লেট লইয়া সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে তিনটিলা বনবিহারে অবস্থান করার জন্য আমন্ত্রণ করি। আমার মনে হয় আমাদের ধর্মের তথা শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস আছে পরীক্ষামূলক একমাস

সময় দিয়ে বিহার নির্মাণ করতে পারব কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা উপস্থিত সকলে দৃঢ় মনোবল এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি অগাধশ্রদ্ধা রেখে বললাম, এক মাসের মধ্যেই অবশ্যই বিহার নির্মাণ করতে পারব। শ্রদ্ধেয় ভন্তে সাথে সাথে সাধুবাদ জানিয়ে কাজ আরম্ভ করতে নির্দেশ দিলেন এবং সকল প্রাণীর হিতসুখ ও মংগলের জন্য শ্রদ্ধেয় ভন্তে তিনটিলা বনবিহারে অবস্থান করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সেদিনই কঠিন চীবন দানানুষ্ঠানের দান কাজ সম্পন্ন করার সাথে সাথে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বোধিপাল মহাস্থবির সহ পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে তিনটিলা বনবিহারে এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হয়। আমার একান্ত বিশ্বাস শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুকম্পায় এবং উনার প্রভাবে এক মাসের মধ্যে গভীর অরণ্যভূমির উপর বনবিহার স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল।

মহান আর্য্য পুরুষ পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে তিনটিলা বনবিহারে আমন্ত্রণ করে প্রধান ভূমিকা ছিল পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ইন্দাসারা ভিক্ষু (গৃহী নাম সুরেন্দ্র মাষ্টার) যার প্রচেষ্টার দ্বারা মহামানব শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে তিনটিলা বনবিহারে আনা হয়েছিল, তিনটিলা পাড়াসহ সমগ্র লংগদু এলাকাবাসী আজও পর্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ইন্দাসারা ভিক্ষু ছিলেন বাঘাইছড়ি থানার অন্তর্গত খেদারমারা নামক বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ। তিনটিলা বনবিহার-এর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মাসাধিকাল শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় খেদারমারা বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করে ছিলেন। তিনটিলা বনবিহার নির্মাণের কাজ এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে খেদারমারা হতে নিয়ে আনা হয়।

১৯৭০ ইং হতে ১৯৭৭ ইং প্রায় পর্যন্ত ৬ বৎসর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় তিনটিলা বনবিহারে কঠোর সাধনার মাধ্যমে অবস্থান করেছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ৬ বৎসর তিনটিলা বনবিহারে অবস্থানের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ভন্তে সকল শ্রেণীর হিতসুখ ও মংগলের জন্য স্বধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। মানবের দুঃখ মুক্তির অমৃতময় বৌদ্ধবাণী প্রচার করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের অমৃতময় বৌদ্ধবাণী চারদিকে প্রজ্জলিত হয়ে উঠে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসতে থাকে বৌদ্ধ নরনারী স্বর্ধম শ্রবণ, আস্বাদ গ্রহণের নিমিত্তে। এই মহামানবের চিত্তের ভাব বড়ো গভীর, বড়ো উদার, বড়ো পবিত্র, অতি মহৎ, অতি শ্রেষ্ঠ, অতি

সমুজ্জল, অপূর্ব, অনুপম, অভাবনীয় ও অনির্বচনীয়। প্রথম দর্শনেই মহামানব শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রতি হয় চিত্ত সমুজ্জল। ধীরে ধীরে গড়ে উঠে তিনটিলা বনবিহার তীর্থ ভূমিতে। তিনটিলা বনবিহার এলাকাটি সত্যিই মনোরম, মনোমুগ্ধকর স্থান যাহা ধ্যান সাধনার প্রকৃত স্থান। আমার মনে হয় শ্রদ্ধেয় ভন্তে তাঁর ধ্যান সাধনার ৩য় স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছেন তিনটিলা বনবিহার এলাকাটি। দীর্ঘ প্রায় ৬ বৎসর শ্রদ্ধেয় ভন্তে তিনটিলা বনবিহারে অবস্থানকালীন আমার জানামতে বিভিন্ন সময়ে যে ভবিষ্যতবাণী করেছেন ঐগুলো প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পরে আমি সবিস্তারে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। স্বধর্ম প্রচার এবং প্রসারের মহাপুরুষগণের সদিচ্ছার উপর নির্ভর। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় দিব্য চক্ষু, দিব্য জ্ঞানযোগে নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে রাংগামাটি রাজ বনবিহারে অবস্থান করলে স্বধর্ম আরও প্রচার এবং প্রসার হইবে। তাই তিনি ১৯৭৭ ইং হতে অদ্যাবধি রাজবন বিহারে অবস্থান করে বৃহত্তম পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বধর্ম প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে মানবের হিত সুখ সাধনের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের অমৃতবাণী প্রচার করে আসছেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সত্য ধর্ম সকল বৌদ্ধ নরনারীগণ একাগ্রচিত্তে অনুধাবন করুন ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় ১৯৭০ইং হইতে ১৯৭৭ ইং পর্যন্ত তিনটিলা বনবিহারে অবস্থানকালীন বিভিন্ন সময়ে যে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, ঐগুলো প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নে আমি সবিস্তারে উল্লেখ করলামঃ-

তিনটিলা বনবিহার স্থাপনের পর ১৯৭০ ইং সনের শেষান্তে বাবু অনিল বিহারী চাক্‌মা, প্রয়াত গঙ্গাধন চাক্‌মা এবং তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু সুবল চন্দ্র চাক্‌মা প্রয়াত সত্যব্রত চাক্‌মা প্রয়াত শচীনাথ চাক্‌মা প্রয়াত নিশি চন্দ্র চাক্‌মা প্রয়াত বিজয় কুমার চাক্‌মা (আমার চাচা)সহ শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের সমীপে পুরাতন তিনটিলা বৌদ্ধ বিহারটি পুনঃ নির্মাণের জন্য উপদেশ এবং অনুমোদনের নিমিত্তে উপনীত হই। তিনটিলা বৌদ্ধ বিহারটি যেখানে ছিল পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি। পুরাতন বৌদ্ধ বিহারটি পুনঃ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করার জন্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের সদয় অনুমোদন এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে, শ্রদ্ধেয় ভন্তে জিজ্ঞাসা করলেন, কি পরিমাণ টাকা খরচ হবে? উত্তরে আমরা বললাম প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যতীত শুধু

মিস্ত্রি খরচ পাঁচ হাজার টাকা খরচ হতে পারে। শ্রদ্ধেয় ভন্তে বললেন, পাঁচ হাজার টাকা অনেক। সে সময় পাঁচ হাজার টাকা বর্তমান প্রায়-পঞ্চাশ হাজার টাকা। সেই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ভন্তে প্রথম ভবিষ্যতবাণী করলেন যে, রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত তিনটিলা বৌদ্ধ বিহারটি যেখানে অবস্থিত ঐ রাস্তা দিয়ে একদিন অগণিত সৈন্য যাতায়াত করবে। সৈন্যরা অস্ত্রসহ জুতা পায়ে বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশ করে পবিত্রস্থান অপবিত্র করবে। মহাপুরুষগণের ভবিষ্যতবাণী অব্যর্থ। শ্রদ্ধেয় ভন্তের ভবিষ্যতবাণী শুনে আমরা সকলে হতবাক হয়ে গেলাম। তাই আমরা সকলে দেব-মনুষ্য তথা সকল প্রাণীর হিতসুখ ও মংগল প্রার্থনা করে শ্রদ্ধেয় ভন্তের অনুমোদনক্রমে তিনটিলা বৌদ্ধ বিহারের জন্য টাকা তিনটিলা বনবিহারে খরচ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

মহামানব শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের ভবিষ্যতবাণী প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মে/জুন মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তিনটিলা বৌদ্ধ বিহার নামক পবিত্রস্থানটিকে জুতা পায়ে অস্ত্রসহ প্রবেশ করে পবিত্রস্থান অপবিত্র করে ফেলে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরও ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, তিনটিলা পাড়ার মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটি আছে ভবিষ্যতে ঐ রাস্তা দিয়ে অগণিত মানবের যাতায়াত হবে। মহামানব শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ভবিষ্যতবাণী আমরা বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করছি।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে প্রায় অঞ্চলে পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিবাহিনী সমর্থক লোকদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুকম্পায় এবং শক্তির প্রভাবে লংগদু এলাকার কোন লোকের ক্ষতিসাধন করতে পারেনি বলিয়া আমার একান্ত বিশ্বাস। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রায় সময় "মহামানব" শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের সমীপে হিতোপদেশ গ্রহণ করতে যেতেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তে সকল মানবের হিতসুখ ও মংগলের উপদেশ দিতেন,-মিথ্যা পরিহার করে সত্যকে আশ্রয়, অকুশল ত্যাগ করে কুশল অবলম্বন কর। সত্যকে আশ্রয় এবং কুশলকে অবলম্বন করে থাকলে সহজে অধপতন হয় না এবং নানাবিধ রোগ, ভয়, অমুনষ্য উপদ্রব থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। এই উপদেশ সর্বদা মানবের হিতসুখ ও মংগলের জন্য দেশনা করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় লংগদু

থানার দু'জনের নাম আমি উল্লেখ করছি মাইনীমুখ বাজারের এবং তিনটিলা এলাকার যথাক্রমে বাবু চিন্তাহরণ সাহা এবং বাবু বীরেন্দ্র লাল নন্দী শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশীর্বাদ এবং অপার করুণায় জীবনের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন বলিয়া আমার একান্ত বিশ্বাস। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শ্রদ্ধেয় ভন্তে প্রায় সময় ব্যক্ত করতেন পাক বাহিনীরা যেভাবে অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং নির্যাতন চালাচ্ছে অচিরেই তাদের অধপতন ঘটবে। সাধারণ মানুষ অজ্ঞানতাবসতঃ সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলে অকুশল কর্ম দ্বারা নিজের পরিণতি নিজেই ডেকে নিয়ে আসে। মহাপুরুষগণের বাণী অব্যর্থ। ৯ মাসের মধ্যে পৃথিবীর সেরা গেরিলা যোদ্ধা পাক বাহিনীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ২৫/২৬ দিন পূর্বে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিদ্যজ্ঞান, দিব্যচক্ষু দ্বারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে জানতে পারছেন যে, তিনটিলা বনবিহারে তাঁর সে সময় থাকা ঠিক হবে না বিধায় পাড়ার দায়ক/দায়িকাগণকে পূর্বাভাস দিয়ে ভাইবোন ছড়া এলাকাতে চলে যান।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধায় রোগ হতে মুক্ত এবং সন্তানের জনক লাভঃ-

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি এবং স্বর্গীয় গঙ্গাধন চাক্মা বিকাল আনুমানিক ৪টা কি ৪$\frac{১}{২}$টার সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে পানীয় দানের পর বিহার হতে ফিরে আসার পথিমধ্যে থানা সমবায় কর্মকর্তা জনাব সামসুল হক এবং মৎস্য কর্মকর্তা বাবু সুকুমার বড়ুয়ার সাথে দেখা হয়। বিশেষ করে শামছুল হক সাহেবের অনুরোধে আমরা আবার বিহারে ফিরে গেলাম। আমাকে দেখার সাথে সাথে শ্রদ্ধেয় ভন্তে বললেন, কি কারণে আবার ফিরে এলেন? তখন আমি শামছুল হক সাহেবকে নির্দেশ করে বললাম, উনি আমাদেরকে ফিরিয়ে আনলেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে শামছুল হক সাহেবকে সেখানে যাওয়ার ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করলেন। শামছুল হক সাহেবের শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রতি ছিল অগাধ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি। শামছুল হক সাহেব সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধেয় ভন্তের সমীপে তাহার স্ত্রীর দুরারোগের ব্যাপারে সবিস্তারে উল্লেখ করলেন। অনেক চিকিৎসা করার পরও নাকি রোগের উপশমের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। শ্রদ্ধেয় ভন্তে বললেনঃ-

আমি কোন ডাক্তার, কবিরাজ বা বৈদ্য নই, ঔষধ বা প্রেসক্রিপসান দিতাম। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শামছুল হক সাহেবকে হিতোপদেশ দিলেন। হিতোপদেশের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ভন্তে তাঁর উদ্দেশ্যে (শ্রদ্ধেয় ভন্তের উদ্দেশ্যে) সৎভাবে কিছু দান করলে অনেক সময় নাকি দুরারোগ হতে মুক্ত পাওয়া যায় এরকম পূর্বাভাস আকার ইঙ্গিতে ব্যক্ত করলেন। অনেকক্ষণ দেশনা দেয়ার পর আমরা বিহার হতে চলে এলাম। ফিরার পথে শামছুল হক সাহেব আমাকে বললেন, মাষ্টার সাব এখন কি করি, শ্রদ্ধেয় ভন্তে কোন কিছু বললেন না। আমি শামছুল হক সাহেবকে বললাম, আপনি কোন কিছু বুঝেন নাই? আমার মনে হয় ৪ জনের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ভন্তের আকার ইঙ্গিতের কথা আমি ব্যতীত তাঁরা ৩ জনেই বুঝেন নাই। শ্রদ্ধেয় প্রয়াত গঙ্গাধন চাক্‌মাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনিও বুঝেন নাই? উত্তরে তিনি বললেন, না। মহাপুরুষগণ সরাসরি কোন কথা বলেন না। মহাপুরুষগণ মানবের আপদ, বিপদ, সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি, উত্তান পতন আকার ইঙ্গিতে বলে থাকেন। মানুষ অজ্ঞানতা বশতঃ মহাপুরুষগণের ইঙ্গিতের কথা ধারণ করতে পারেন না। তখন আমি শামছুল হক সাহেবকে বললাম, আপনার নিজস্ব অর্জিত বেতনের টাকা হতে কিছু টাকা একাগ্র চিত্তে ইহকাল পরকাল বিশ্বাস করে কর্ম ও কর্মফলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সমীপে উৎসর্গ করুন। নতুবা সৎভাবে অর্জিত টাকা দ্বারা শ্রদ্ধেয় বনভন্তে খাওয়ার কোন জিনিষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে দান করুন। যদি আপনার শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস থাকে অবশ্যই আপনার স্ত্রীর রোগ উপশম হবে। শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রতি ছিল শামছুল হক সাহেবের অগাধ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা চিত্তে মাসিক বেতনের ১ম টাকার মধ্যে ১৫/- টাকার খাদ্য প্রয়াত গঙ্গাধন চাক্‌মার মারফত শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সমীপে শামছুল হক সাহেব দান করলেন। দান করার পর শামছুল হক সাহেব লংগদু থাকাকালীন এক সপ্তাহ পরে তাঁর নিজ বাড়ী থেকে চিঠির মারফত জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রীর দুরারোগের উপশমের কথা। সত্যিই মহাপুরুষগণের বাণী। শ্রদ্ধার বলে দুরারোগ হতে মুক্ত পাওয়া শামছুল হক সাহেবের স্ত্রী তার প্রত্যক্ষ ফল।

এখানে আর এক জনের নাম উল্লেখ করতেছি নাম জাকির হোসেন। জাকির হোসেন বর্তমানে ইহজগতে নেই পরলোক গমন করেছে। তার দুই

স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ও কোন সন্তান সন্ততী ছিল না। সন্তানের জনক লাভ করার জন্য প্রায় সময় ছুটে যেত শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সমীপে। শ্রদ্ধাভরে শুনতো শ্রদ্ধেয় ভন্তের অমৃতময় বাণী। শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রতি ছিল জাকির হোসেনের অকৃত্রিম ভক্তি এবং শ্রদ্ধা। ইহকাল, পরকাল, কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস রেখে জাকির হোসেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে পিন্ডদান করতেন এবং ধর্মীয় উপদেশ শ্রবণ করতেন। এভাবে দীর্ঘদিন চলার পর জাকির হোসেন শ্রদ্ধেয় ভন্তের অনুকম্পায় এবং আশীর্বাদে সন্তানের জনক লাভ করলেন। এদিকে জাকির হোসেন বুদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে পিন্ডদানের কথা প্রচার হলে মুসলিম সমাজের কিছু সংখ্যক লোক তাকে (জাকির হোসেন) ধিক্কার এবং সমাজচ্যুত করার ভয় প্রদর্শন দেখায়। মহামানবরূপে আবির্ভূত এ ধরাধামে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মাঝে নেই জাত-বেজাত-গোত্র ভেদাভেদ, শ্রদ্ধেয় ভন্তে উপদেশ দেন মিথ্যাকে পরিহার করে সত্যকে আশ্রয়, অজ্ঞানতাকে দূরে ফেলে জ্ঞানের আশ্রয় নিলে চির সুখ, চির শান্তি পাওয়া যায়। তিনি অহিংসা, সর্বজীবে দয়া, ক্ষমা, মৈত্রী, অক্রোধ, সহ্য ও অক্ষুন্ন মানসিকতার সহিত আত্মহিত ও পরহিত সাধনের আত্ম নিয়োগ করার উপদেশ দেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তে জাকির হোসেনকে বলেন,- যারা অজ্ঞান মূর্খ তারাই তোমাকে ধিক্কার এবং সমাজচ্যুত করতে চায়। তুমি (জাকির হোসেন) সত্যকে আশ্রয় এবং জ্ঞানকে অবলম্বন করে থাক তোমার সুখ এবং শান্তি হবে।

তিনটিলা বনবিহার আনুষ্ঠানিকথার মাধ্যমে দানানুষ্ঠানে পরম শ্রদ্ধেয় বনবন্তের পূণ্যশীলা ও রত্নগর্ভা জননী এবং ধর্মীয়গুরু চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবিরের উপস্থিতির পক্ষে মত ব্যক্তঃ-

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের জন্য নির্মিত বিহার আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে সংঘের উদ্দেশ্যে দানোৎসর্গ করার দিন নির্ধারণ হলে, শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় তাঁর মহোপূণ্যশীলা জননী বীরপুদি চাক্‌মা এবং ধর্মীয় গুরু চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবিরকে দানানুষ্ঠানে উপস্থিত রাখার নির্দেশ দেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের নির্দেশক্রমে দীর্ঘ বৎসর পর শ্রদ্ধেয় ভন্তের পূণ্যশীলা জননী এবং ধর্মীয় গুরু মহোদয়কে দানানুষ্ঠানে যথাসময়ে আনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভন্তের ধর্মীয় গুরু শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবির শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে প্রথম দর্শনেই

ব্যক্ত করছেন, সত্যিই অপরূপ, অচিন্তনীয় জ্ঞানের অধিকারী তাঁর শিষ্য। তিনি কোনদিন কল্পনা করতে পারেননি তাঁর শিষ্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এত লোকোত্তর জ্ঞানীর অধিকারী হবেন, প্রত্যক্ষ দর্শনেই সেদিন জানতে পারলেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে একজন মহামানব, মহাজ্ঞানী খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং সেদিনই শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবির তাঁর অনুগত শিষ্য পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে চীবর দান করলেন মহামানব, মহাজ্ঞানী খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং সেদিনই শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাজ্ঞানী খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং সেদিনই শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবির তাঁর অনুগত শিষ্য পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে চীবর দান করলেন এবং সাথে সাথেই আশীর্বাদ করলেন যেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরও জ্ঞানের অধিকারী হন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে তাঁর ধর্মীয় গুরু পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবির চীবর দান করার পর শ্রদ্ধেয় ভন্তে মত প্রকাশ করলেন, আমার গুরু ভন্তে মহোদয়কে আমি কি দান করবো? তখন প্রয়াত গঙ্গাধন চাক্‌মা পাহাড়ী চাক্‌মার তৈরী গিলাপ কাপড় (বরগী কাপড়) দানের কথা উল্লেখ করার পর উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতি মতামতের সাপেক্ষে এক জোড়া নুতন কাপড় (বরগী কাপড়) শ্রদ্ধেয় বনভন্তের হাতে দান করার জন্য প্রয়াত গঙ্গাধন চাক্‌মা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

মহামানব শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় কঠোর সাধনার দ্বারা নিজ অভিজ্ঞতার বলে শীল, সমাধি প্রজ্ঞার বলে মহামানব খ্যাতি অর্জন করেছেন। সত্যিই তিনি মহাপুরুষ। তিনি বন্ধনমুক্ত। তিনি অহিংসা, সর্বজীবে দয়া, ক্ষমা, মৈত্রী অক্রোধ, সহ্য ও অক্ষুন্ন মানসিকতার সহিত আত্মহিত ও পরহিত সাধনের আত্মনিয়োগ করেছেন। এ মহামানবগণের দর্শন লাভে যারা নির্মল চিত্তে লাভ করতে চান তারা সহজে দর্শন লাভ করতে পারেন। আর যাদের চিত্ত ঘোলার পানির ন্যায় কলুষ তারা দর্শন লাভ দুরে থাক হীতে বিপরীত হয়ে থাকে। আমি শুনেছি তদকালীন লংগদু হাইস্কুলের মাষ্টার বাবু সুবিলাল চাক্‌মা শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় রাত্রে ঘুমান কিনা পরীক্ষামূলক কিছু ছাত্র সাথে করে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কুঠিরের দিকে রাত্রে অগ্রসর হন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের কুঠিরে যাওয়ার পথে সেসময় একটি বাঁশের সাকো পার হতে হয়। বর্তমানে সাঁকোর স্থানে পাকা পুল তৈরী করা হয়েছে। বাঁশের সাঁকো পার হওয়ার পর বনবিহার এলাকা। বিহার এলাকায় পদার্পন করার সাথে

সাথে বাবু সুবিলাল চাক্মা অনুভব করলেন, যেন সে মুহূর্তে প্রবল বাতাস হচ্ছে, বিদ্যুতের চমকানি, মুষলধারে বৃষ্টি হবে। প্রবল বাতাস, বিদ্যুতের চমকানি এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে সুবিলাল বাবু বিহার এলাকা হতে সাকোর অপর পারে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর দেখলেন এক অপরূপ কান্ডকারখানা। প্রবল বাতাস, বিদ্যুতের চমকানিসহ বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। আকাশ একদম পরিষ্কার। ঠিক একই মনোবৃত্তি নিয়ে সুবিলাল বাবু আর একবার যেতে চেষ্টা করেন। সেদিন স্যাকো পার হওয়ার পর বিদ্‌ঘুটে কিসের শব্দ শুনতে পান। শব্দ শুনে বিহার এলাকার শ্রদ্ধেয় ভন্তের কুঠিরের দিকে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। দু'এক দিন পর সকালের দিকে শ্রদ্ধেয় ভন্তের কুঠিরের দিকে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। দু'এক দিন পর সকালের দিকে শ্রদ্ধেয় ভন্তের সমীপে সুবিলাল বাবু উপস্থিত হন। সুবিলাল বাবুকে দেখার সাথে সাথে শ্রদ্ধেয় ভন্তে মন্তব্য করছেন, বনভন্তে রাত্রে ঘুমান, নাকি ঘুমান না অনেকে রাত্রে দেখতে আছে। তিনি (ভন্তে) আরও বলেছেন বনভন্তে রাত্রে ঘুমালেও পারেন, নাঘুমালেও পারেন। খেতেও পারেন , না খেলেও পারেন, এর সাথে আরও মন্তব্য করছেন, মনুষ্যগণ শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে খাদ্য ভোজ্য না দিলে দেবগণ দিয়ে থাকেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ভন্তে আরও মন্তব্য করছেন, যারা মুর্খ, অজ্ঞানী, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলে কুশল, অকুশল জানেনা তারা শুধু খায় আর ঘুমায়। সেহেতু সুবিলাল বাবুর শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি গড়ে উঠে অকৃত্রিম ভক্তি এবং শ্রদ্ধা।

মানব জীবন বড় দুর্লভ জীবন। দুর্লভ মানব জীবনে সুখ, দুঃখ, সত্য, মিথ্যা, ভাল মন্দ সবকিছু অনুধাবন করা যায়। দুর্লভ মানব জীবনে দান, শীল, সমাধি প্রজ্ঞা দ্বারা লোকোত্তর সম্পত্তির জ্ঞান লাভ করা যায়। যারা শীল, সমাধি প্রজ্ঞা দ্বারা নিজ অভিজ্ঞতার বলে লোকোত্তর সম্পত্তির অধিকারী তাঁরাই প্রকৃত মহামানব, মহাজ্ঞানী বলে পৃথিবীতে বিবেচিত হন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় তিনটিলা বনবিহারে অবস্থানের সময়ও বলতেন যে দেশে যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে সে দেশ সে জাতি সুখ সমৃদ্ধশালী হয়। শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন তোমরা (দায়কগণ)শীলে প্রতিষ্ঠিত হও, দেখবে তোমাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হবে। সত্যিই মহাপুরুষের বাণী। শ্রদ্ধেয় ভন্তে তিনটিলা অবস্থানকালীন তিনটিলা পাড়ায় মদ, জুয়া, প্রাণী হত্যা বলতে

কিছুই ছিলনা, শীলের প্রভাবে দায়ক, দায়িকাগণের আর্থিক অবস্থা সচ্ছলতায় ফিরে আসে। এভাবে গড়ে উঠে তিনটিলা পাড়া নামক জায়গাটি তীর্থ ভূমির আশ্রয় স্থল হিসাবে। ভগবান গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় সর্ব সুলক্ষণা মহোপসিকা, মিগার মাতা বিশাখা কতৃক প্রবর্ত্তিত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড় তৈরী করে সেলাই করে "দানোত্তম কঠিন চীবর দান" "মহামানব" শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় সর্বপ্রথম ১৯৭৩ ইং সালে ২৭/২৮শে নভেম্বর তিনটিলা বনবিহারে প্রবর্তন করেন। দানোত্তম কঠিন চীবর দানের সময় মারের অশুভ শক্তির প্রভাব (সারাদিন সারারাত মুষলধারে বৃষ্টি) থাকা সত্ত্বে ও দায়ক, দায়িকাগণের অগাধ ভক্তি, শ্রদ্ধা দ্বারা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অপার করুণায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে দানোত্তম কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান করা সম্ভব হয়েছিল। কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর মারের অশুভ শক্তির প্রভাব তিনটিলা পাড়ার কমে নাই। মার নামক এক প্রকার মারাত্মক আমাশয় রোগ দেখা দেয় তিনটিলা পাড়ায়। এ রোগে আক্রান্ত ৩-৮ বৎসরের অনেক ছেলে মেয়ে মারা যায়। তার মধ্যে আমার এক ছেলেও এ রোগ হতে রক্ষা পায়নি। এ রোগ যখন চারদিকে ছড়িয়ে না যাওয়ার প্রার্থনা করা হয়। শ্রদ্ধেয় ভন্তে অনুকম্পা পূর্বক এলাকার দায়ক, দায়িকাগণের প্রতি সদয় হয়ে সমস্ত পাড়া বেষ্ঠন করে নানা রোগ, ভয় থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য তাঁর অনুগত শিষ্যগণকে পরিত্রাণ পাঠ করার নির্দেশ দেন। তিনটিলা পাড়া তিন বার বেষ্ঠন করে সূত্র পাঠ করার সাথে সাথে শ্রদ্ধেয় ভন্তের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে পাড়ার যাবতীয় রোগ, ভয় দূরীভূত হয়। মহাপুরুষগণের শক্তির প্রভাব সত্যিই অচিন্তনীয়, অপুরণীয় যাহা প্রত্যক্ষ ফল।

মারের আর এক অশুভ শক্তির প্রভাব ১৯৭৪ ইং সনে রাংগামাটি রাজ বিহারে দানোত্তর কঠিন চীবর দানোপলক্ষে কাপ্তাই হ'তে রাংগামাটি লঞ্চ পথে দানানুস্থানে অংশ গ্রহণকারী অনেক পুন্যার্থী লঞ্চ ডুবে মারা যায়। ইহাও মারের অশুভ শক্তির প্রভাব বলে আমি নিঃসন্দেহে মনে করি। পুণ্যার্থীরা লঞ্চ ডুবে মারা গেলেও যেহেতু তারা পুন্যানুষ্ঠানে পূণ্য অর্জন করার জন্য আসতেছে তাদের চিত্ত ছিল কুশলে ধাবিত। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মৃত পূণ্যার্থীদের দিব্যজ্ঞান, দিব্য শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করে জানতে পেরে মন্তব্য করছেন, মৃত ব্যক্তিরা যারা পূণ্য কর্মে অশুভ শক্তির প্রভাব দেখাতে শ্রদ্ধেয়

ভন্তে দায়ক, দায়িকাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, যে কোন মহৎ পূণ্যের কাজ করার সময় মার তার অশুভ শক্তির প্রভাব ফেলতে চেষ্টা করে। মার যেকোন কুশল কর্ম করতে বাঁধার সৃষ্টি করে থাকে। মারকে একমাত্র দমন বা পরাভূত করতে পারে শ্রদ্ধেয় উপগুপ্ত মহাথেরো। সুতরাং তোমরা (দায়ক দায়িকারা) যে কোন মহৎ পূণ্যের কাজ করার আগে শ্রদ্ধা চিত্তে অষ্টশীল গ্রহণ করে মহৎ পূণ্যের কাজে যেন মার নামক এক প্রকার শক্তি বাঁধা সৃষ্টি করতে না পারে নির্দিষ্ট সময়সীমা দিয়ে শ্রদ্ধেয় উপগুপ্ত মহাথেরোকে আমন্ত্রণ এবং শ্রদ্ধা চিত্তে পূজা করার পরামর্শ দেন। সে হতে যে কোন মহৎ পূণ্যের কাজ করার আগে শ্রদ্ধেয় উপগুপ্ত মহাথেরোকে আমন্ত্রণ করে পূণ্যের কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং মারের অশুভ শক্তির প্রভাব আর ফেলতে পারে না।

দেব মনুষ্য তথা সকল প্রাণীর হিত সুখ ও মংগলের জন্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের অনুমতিক্রমে তিনটিলা বনবিহারে পাকা মন্দির নির্মানের কাজ ১৯৭২ ইং সনে শেষান্তে উদ্যোগ আরম্ভ করা হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আনুষ্টানিকতার মধ্য দিয়ে মন্দিরের কাজ ভিত্তি স্থাপন করেন। সর্বজন হিতসুখ ও মংগলের জন্য মন্দির নির্মাণ কাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী (ইট, লোহা) ৩নং লংগদু মৌজার হেডম্যান, বাবু অনিল বিহারী চাক্‌মার সেচ্ছাদানের প্রধান ভূমিকা ছিল। মন্দির নির্মানের কাজ চলাকালীন পরিকল্পনা ও তদরাকী ব্যাপারে স্থানীয় দায়ক, দায়িকা ব্যতীত রাংগামাটি নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট প্রয়াত জ্যোতির্ময় চাক্‌মা ও বাবু সনৎ বড়ুয়ার ভূমিকা ছিল মূখ্য। ১৯৭৭ ইং শেষান্তে শ্রদ্ধেয় ভন্তে মহোদয় রাংগামাটি যাওয়ার পর মন্দিরের কাজ স্তিমিত হয়ে পড়ে। লংগদু এলাকা সহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শ্রদ্ধাবান দায়ক দায়িকাগণের শ্রদ্ধাদান দ্বারা মন্দিরের কাজ কিছুটা অগ্রসর হলে থাইল্যান্ড সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি তিনটিলা বনবিহারের পাকা মন্দিরে স্থাপন করা হয়। শ্রদ্ধেয় ভন্তে রাংগামাটি যাওয়ার পর পাকা মন্দিরের কাজ আংশিক অসমাপ্ত থেকে যায়। রাংগামাটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত আড়াই লক্ষ টাকা পাওয়া গেলে মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার পর আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মন্দিরের দানোৎসর্গ করার প্রত্যাশা থাকলো।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের অনুগত শিষ্য তাঁরই উপস্থিতিতে অন্য জনের সমীপে শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় শ্রদ্ধেয় ভন্তের হৃদয়ে, ব্যাথিত ভাব প্রকাশঃ-

১৯৭৬ ইং সনের এপ্রিল মাসের ১৪/১৫ তারিখ আমার বড় মেয়ে বিষধর সর্পে দংশন দ্বারা মারা যায়। যেদিন মারা যায় সেদিন ছিল ১লা বৈশাখ, পূর্ণিমা তিথি এবং মংগলবার। মেয়ে মারা যাওয়াতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের সমীপে হিতোপদেশ গ্রহণ করতে উপনীত হই। শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে বন্দনান্তে আমাকে নাম ধরে বললেন, তোমার মেয়ে মারা গেছে, আমার (শ্রদ্ধেয় ভন্তের) ছেলে ও মারা গেছে। শ্রদ্ধেয় ভন্তে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার দুঃখের চেয়ে ও আমার দুঃখ কম নয়। অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুগত শিষ্য শ্রীমৎ উত্তর পাল (বর্তমানে গৃহী) কে শ্রদ্ধেয় রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবিরের সমীপে নূতনভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় শ্রদ্ধেয় আমার অন্তরে রেখাপাত করে। শ্রদ্ধেয় ভন্তে আবেগের সাথে আমাকে বলার মুহূর্তেই আমার মেয়ের মৃত্যুর শোকের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। ইতিপূর্বে শ্রদ্ধেয় ভন্তের অনুগত শিষ্য যথাক্রমে শ্রীমৎ আর্য্য পাল (বর্তমানে ইহজগতে নেই) শ্রীমৎ সংঘপাল (বর্তমানে গৃহী) শ্রীমৎ নন্দপাল (বর্তমান যমচুগের বিহারধ্যক্ষ) শ্রীমৎ বর্ষাপাল কারো প্ররোচনায় বার্মায় চলে গেছেন। যাদের নিয়ে শ্রদ্ধেয় ভন্তে ধর্মে আলো ভবিষ্যতে প্রজ্জলিত করার আশা আকাঙ্খা ছিল, তারা চলে যাবার পর শ্রদ্ধেয় ভন্তের মনে আঘাত পাবার ব্যাপার বুঝতে পেরে আমি আমার মেয়ের শোকের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে শ্রদ্ধেয় ভন্তের অনুশোচনা তীরের মত আমার অন্তরে অনুভব হতে লাগলো।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে জন্ম জন্মান্তরে সঞ্চিত পূণ্যের প্রভাবে ইহজগতে শীল, সমাধি প্রজ্ঞা এবং নিজ অভিজ্ঞতার বলে লোকোত্তর সম্পত্তি অর্জন করে মহাজ্ঞানী, মহামানব খ্যাতি অর্জন করেছেন তাহা নিঃ সন্দেহে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য।

তিনটিলা বনবিহারে মহামানব শ্রদ্ধেয় বনভন্তে অবস্থানকালীন কোন এক সময়ে বিকালে পানীয় দানের জন্য বিহারে উপনীত হই। পানীয় দানের পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে বন্দনান্তে মাথা উঁচু করার সাথে সাথেই আমি এক অপরূপ আকর্ষণীয় অচিন্তননীয় জ্যোতি (আলো) শ্রদ্ধেয় ভন্তের

মাথার পিছন দিকে যাহা ভগবান গৌতম বুদ্ধের জ্যোতি আমরা প্রতিচ্ছবির মধ্যে দেখতে পাই, সেই জ্যোতি আমি স্বচক্ষে অবলোকন করি। সেদিন হ'তে আমার অন্তরে রেখাপাত করলো। সত্যিই শ্রদ্ধেয় ভন্তে একজন মহামানব, মহাজ্ঞানী যাহা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি মানবের দুঃখমুক্তির পথ দেখানোর জন্য এধরাধামে "শ্রাবক বুদ্ধ" রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি বন্ধনমুক্ত মহাপুরুষ। তাঁর সর্বক্ষণ দেশনায় মানবের দুঃখ মুক্তির পথ দেখানো এবং লোকোত্তর জ্ঞান অর্জন করা। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় গৃহীদের লৌকিক সম্পত্তি অর্জনের জন্য তিনটিলা বনবিহারে অবস্থানকালীন এবং বর্তমানে ও উপদেশ দেন তোমরা (দায়ক, দায়িকাগণ) শীলে প্রতিষ্ঠিত হও ভাগ্য পরিবর্তন আসবে। মহাপুরুষগণের বাণী সত্যিই অখন্ডনীয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের দৈনন্দিন ধর্মীয় বাণী আমরা একাগ্রচিত্তে অনুধাবণ, ধারণ চেষ্টা করি যেন অন্তিমে আমাদের ধর্মচক্ষু, ধর্মজ্ঞান উদয় হয়ে নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হয়।

সকল প্রাণী সুখী হোক
দুঃখ হ'তে মুক্ত হোক।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে যেমন দেখেছি ও তাঁর কথা যা শুনেছি

(১৯৭৭ ইং-১৯৯৬ পর্য্যন্ত)

সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা (সঙ্ক)

আমার শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের দর্শন লাভ। তাঁর উপদেশ শ্রবন ধর্মীয় শিক্ষাদান, নিকট সান্নিধ্য ও মহান অনুকম্পালাভের সৌভাগ্য হওয়ায় আমার ইহজীবন ধন্য ও সার্থক হয়েছে। তাঁর মহান কৃপায় আমার ব্যক্তিগত জীবনে প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছে বিধায় আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ। আমার দেখা ও তাঁর সম্বন্ধে শোনা মতে আমি যা উপলব্ধি করেছি এবং বৃহত্তর বৌদ্ধ সমাজ জীবনে তাঁর

অমিত প্রভাবে ধর্মীয়ক্ষেত্রে যে নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে সেই বিষয়ে তুলে ধরাই প্রতিপাদ্য বিষয়ের লক্ষ্য। আমার লেখার মধ্যে যে কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে তজ্জন্য আমি আগে থেকেই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং পাঠকদের কাছেও তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রাখছি।

১৯৭২ ইংরেজী সনে লংগদুর তিনটিলা বনবিহারে আমার সর্বপ্রথম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়। পরবর্তীকালে রাঙ্গামাটিতে রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠা, বিহার পরিচালনা ও ইহার উন্নয়ন ইত্যাদি মহাপূণ্য প্রসূ কাজে আমার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৭৭ ইং সনে রাজবন বিহারে তাঁর বর্ষাবাস যাপন ও পরবর্তীকালে এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ করার পর হতে বিভিন্ন পূণ্যানুষ্ঠানে যোগদান করে তাঁর দর্শন লাভ ও অমূল্য উপদেশাবলী শ্রবণের সুযোগ হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, এই পবিত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিয়ম বিধি অনুযায়ী এযাবৎ গঠিত বিহার পরিচালনা কমিটি গুলোর মধ্যে ৪র্থ কমিটির মেয়াদকালে সাধারণ সদস্যপদ লাভের পর সাধারণ সম্পাদক পদে এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ উভয় কমিটির মেয়াদকালে সভাপতিপদে আসীন থাকাকালে অন্যুন দশ বছরাধিক সময় ধরে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও বিহার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট থাকার সুযোগে স্বীয় লব্ধ উপলব্ধি বোধ থেকে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর কিছু আলোকপাত করছি।

মানব সমাজে সাধারণ লোক পরস্পরের যোগে বিশেষ জাতির, বিশেষ দেশের ও বিশেষ শ্রেণীর পরিচিতিতে আবদ্ধ। আবার বুদ্ধিমত্তা, মানবিক-বোধশক্তি। আশা-আকাঙ্খা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও। মানুষে-মানুষে বিভিন্নতা রয়েছে এবং প্রতিটি মানব জীবন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চলছে। এই বৈশিষ্ট্যগত প্রভেদের কারণে মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন রুচিবোধ ও বিচারশক্তির মধ্যে এত কম সাদৃশ্য ও পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। মোটামুটি বলতে গেলে, নিজস্ব উপলব্ধিবোধে ও নিজস্ব বলয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে একজন ব্যক্তি মানুষের জীবন প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে চল্‌ছে। কিন্তু যুগে যুগে দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে মানব সমাজে এমন অনেক মনিষীর ও ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তির জন্ম হয়েছে যাঁদের পরিচয় দেশ-কাল-জাতির গণ্ডীবদ্ধ পরিচিতিতে নয়, তাঁদের পরিচয় মানবেতিহাসের অসাধারণ

মানুষরূপে। এই অসাধারণ ব্যক্তিরা আপন ধ্যান-ধারণার আদর্শে ও আপন ইচ্ছানুসারে সাধারণ মানুষকে চালনা করেছেন এবং মানেবেতিহাসের পাতায় অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যদিও মানবসমাজে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান ও বিশিষ্ট স্থান রয়েছে সত্যের খাতিরে তবুও বলতে হয় নিখুঁত সত্যের বিচারে তাঁদের অনেকের মধ্যে শুধু সত্যের খন্ড প্রকাশই পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁরা বড়ো মাপের অসাধারণ মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, কিন্তু তাঁদের অনেকেই প্রচ্ছন্নভাবে অহংবোধ ও আত্মস্বার্থের এক অবরুদ্ধ চৈতন্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ। বলা যায়, পরিপূর্ণ সত্যের বিকাশ তাঁদের মধ্যে অপরিণত, যার ফলশ্রুতিতে মানুষে মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে ও দেশে দেশে ভেদ বুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তায় যুগে যুগে নররক্তে রঞ্জিত হয়েছে মাটির ধরণী। মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে হিংসা-বিদ্বেষ-স্বার্থপরতা ও পারস্পরিক ঘৃণাবোধে পদে পদে মনুষ্যত্ব হয়েছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত। বিশ্বের ইতিহাসে এমন লোকের জন্ম অতি বিরল যাঁরা দেশ-কাল-জাতি ও শ্রেণীভেদের উর্ধে-প্রকৃত সত্যলাভীর প্রভা নিয়ে আপন মহিমায় পূর্ণরূপে স্বতঃই প্রকাশবান। যিনি সকল মানুষকে এমনকি সকল জীবকে আপনার মতো করে দেখে আপনার মধ্যে প্রকৃত সত্যকে দর্শন করতে পেরেছেন। কেবলমাত্র তাঁর মধ্যে পূর্ণ সত্য প্রকাশিত এবং তিনিই পরিপূর্ন সত্যের দীপ্তিতেই দীপ্তিমান। যিনি চিরন্তন সত্যকে স্বয়ং জেনে, সত্যকে বুঝে, সত্যকে দর্শন করে সবার মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সবাইকে দেখতে পেয়েছেন তিনি আর কোন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না,-তিনি সর্বকালের, সর্বমানুষের জন্যে প্রকাশিত হন লোকোত্তর মহামানবরূপে।

সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষেরা অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁরা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার দ্বারা মোহান্ধ জগদ্বাসীকে সত্যপথের সন্ধান দেন। তাঁদের মহান প্রভাব ও অনুকম্পায় জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রদ্ধেয় আর্য্য পুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয় ও একজন অনন্য লোকোত্তর মহামানব; যাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ সত্যের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত, যিনি চিরন্তন সত্যকে অধিগত করে পূর্ণভাবে প্রকাশমান। তিনি একজন অনন্য সাধকরূপে সুদীর্ঘ বারো বছরের অরণ্যচারী সাধক জীবনের সিদ্ধিতে ধন্য হয়ে আপনাকে প্রকাশিত করেছেন মানুষের মধ্যে। তিনি দেশ-জাতি ও শ্রেণীভেদের

সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে যেমন আবদ্ধ নন, তেমনি কোন ক্ষুদ্র প্রয়োজন সিদ্ধির প্রলুব্ধতায় তাঁর আত্ম প্রকাশ নয়। তিনি স্বয়ং প্রকৃত সত্যকে অধিগত করে আপনার মধ্যে সর্ব জীবকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে প্রকাশমান হয়েছেন। তিনি একজন চিরন্তন সত্যদ্রষ্টারূপে সত্যের সমুজ্জ্বল প্রভায় দীপ্তিমান। তাঁর মতো সত্যলাভী আর্য পুরুষ পৃথিবীতে ডজন ডজন জন্মায় না, হাজার বছরে একজনই জন্মান কিনা সন্দেহ। তিনি শুধু একাই একশ' নন, একাই লক্ষ-কোটি। যুগন্ধর এই মহাবীর্যবান সর্বত্যাগী আর্য-পুরুষ সত্যকে অধিগত করার লক্ষ্যে খ্যাতি লোভহীন নিষ্কাম সাধনায় কঠোর ত্যাগ ও অসহনীয় দুঃখ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতো এতো ত্যাগ, এতো সাধনা কোন মহাজীবন স্বীকার করেছেন কিনা জানা নেই। তাঁর অরণ্যচারী সাধক জীবনের সাধনা কোন আবেগ তাড়িত চমক নয়, কিংবা কোন ধর্মীয় গোঁড়ামীর উদ্দেশ্য সাধনও নয়,- তাঁর সাধনা ছিলো প্রকৃত সত্যোপলব্ধির সাধনা। তিনি সেই সাধনায় বিফল হননি। ভগবান বুদ্ধের প্রদর্শিত সত্যদর্শনের সোনালী পথ বেয়ে তিনি স্বয়ং সত্যোপলব্ধিতে ধন্য হয়েছেন এবং অপরের কল্যাণার্থে নিজেকে উদাহরণরূপে প্রদর্শনের দ্বারা মানুষকে দেখায়ে চলেছেন সত্যপথের নিশানা। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় জীবনে নব প্রাণ প্রবাহের সঞ্চার করেছেন এবং আপামর মোহগ্রস্ত মানুষের চেতনায় নতুন উদ্যমের ধারা বইয়ে দিয়েছেন। তিনি তেজস্বী ভঙ্গীতে প্রতিনিয়ত সিংহনাদ করে প্রচার করে চলেছেন তথাগত বুদ্ধের অমৃতময় মহাবাণীর কথা ও ভগবান বুদ্ধের সত্য ও জ্ঞানালোকের সুমহান আদর্শ অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্যে মোহান্ধ মানুষের প্রাণে উত্তীর্ণ চেতনার বীজ পুঁতে দিচ্ছেন অহরহ। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁদেরকে শোনাচ্ছেন সত্য ও জ্ঞান-চেতনার মুক্তধারার বাণী এবং মোহগ্রস্ত মানুষের মনোরাজ্যে সদা আঘাত হেনে আহবান করছেন সকলকে সত্যাশ্রয়ী ও জ্ঞানাশ্রয়ী হতে। তিনি বলেন, "আত্মোৎকর্ষ সাধনই ধর্ম সাধনার চরম লক্ষ্য। কাজেই প্রত্যেকে জ্ঞানশক্তি অর্জনে সচেষ্ট হও যাতে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যেতে পার।" তিনি সদা উপদেশ দিয়ে চলেছেন বিবেকের পরিপূর্ণতা সাধনে অগ্রণী হতে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মতো সাধনসিদ্ধ অনন্য সৎপুরুষের জ্ঞানের গভীরতা ও অনন্ত গুণাবলী সম্বন্ধে ধারণা করা সাধারণের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে তিনি যে মানবতার সার্বিক কল্যাণ ও শান্তির বাণীবাহক দিগন্তব্যাপী এই

অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন মানব সমাজে সত্যের আলো জ্বালাবার মহান ব্রত লয়ে বিশ্ববাসীকে অনুকম্পা প্রদর্শন করছেন একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায়। তাঁর আবির্ভাবে মানব সমাজে একটি সত্য ও জ্ঞানের আলোকজ্জ্বল শিখা জ্বলে উঠেছে একথা সর্বৈব সত্য।

বর্তমান চাক্‌মা বৌদ্ধ সমাজে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের অমূল্য অবদান অপরিসীম। যুগ যুগ ধরে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী চাক্‌মা সমাজের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে কালের বিবর্তনে ধর্মীয়ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা দেয়, যার ফলে চাক্‌মা সমাজে ধর্মের নামে অনেক অন্ধ সংস্কার অনুপ্রবেশ করেছিল এবং চাক্‌মা সমাজ জীবন ধর্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে বন্দী হয়ে পড়েছিল। যদিও চাকমাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ অটুট রয়েছে তবুও সমাজে মিশ্র ধর্মভাবের প্রচলন হয়েছিল। সমাজ জীবনের নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও চাক্‌মারা বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি সত্য, তথাপি পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গল কামনায় তাঁদের সমাজ জীবনে কালক্রমে বহু অবৌদ্ধ জনোচিত আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-প্রথা অনুপ্রবেশ করেছিল এবং চুমুলাং, থানমানা, বুরপারা, ধর্মকাম বা শিবপূজা, গাঙপূজা, পশুবলি সংযুক্ত পূজা অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। এভাবে চাক্‌মা সমাজে বৌদ্ধধর্মের বহু পরিহানি দেখা দিয়েছিল। ধর্মীয়ক্ষেত্রে চাক্‌মা সমাজের সেই সঙ্কটময় মূহুর্তে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় স্বীয় সাধনা সুন্দর জীবন শেষে সত্য ও জ্ঞানের অমিয় ধারায় অভিষিক্ত হওয়ার পর বৌদ্ধ ধর্মের অমিয় বাণী প্রচার করে চাক্‌মা বৌদ্ধ সমাজে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন। যুগ যুগ ধরে চাক্‌মা বৌদ্ধ সমাজে ধর্মের নামে লালিত অন্ধ বিশ্বাস, নানা কল্পিত দেব-দেবীর পূজার্চনা ও ধর্মান্ধতার মূলে চরম আঘাত হেনে সমাজ জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের মহান আদর্শকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি চাক্‌মা সমাজ তথা এদেশের বৌদ্ধ মতালম্বীদেরকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তিনি স্বীয় লব্ধ জ্ঞান, সত্যবাদিতা, মহানুভবতা ও বিশ্বস্ততার জন্যে এদেশের বৌদ্ধ সমাজের কাছে সর্বজনপূজ্য একজন মহান ধর্মগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত। নিঃসার্থতা উদারতা ও মহত্ত্বতার গুণে তিনি বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্মীয় ভাবধারায় অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করতে পেরেছেন। তিনি বৌদ্ধ সাধারণকে এই মহানধর্মের সুশীলতল ছায়াতলে এসে সুন্দরভাবে বেঁচে

থাকার অধিকার নিয়ে সৌভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীগত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আদর্শ বৌদ্ধ সমাজ গঠনে যত্নবান হওয়ার জন্যে নিয়ত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, অভিজাত্যের দম্ভ, বংশমর্যাদার আস্ফালন ও শিক্ষাভিমানের অহমিকা এসবের কোনটাই উত্তম, ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত ও জ্ঞানীর মাপকাঠি নয়, সেই ব্যক্তি উত্তম, ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত ও জ্ঞানী যিনি জ্ঞান-সত্য যোগে আত্মহিত পরহিত সাধনে সদা যত্নবান ও মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী। তিনি বলেন, "ইহকাল-পরকাল সুখলাভের জন্য প্রত্যেকের উচিত আমার কথা মানা, বিশ্বাস করা ও আমার উপদেশ মেনে চলা। প্রত্যেকের সুখ ও মঙ্গলের জন্য এবং যাতে পরিহানি না হয় তজ্জন্য সত্যান্বেষী হও, সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা কর, যা সত্য গ্রহণ কর, মিথ্যা হলে পরিত্যাগ কর, সুপথ কুপথ চিনে নাও, ভাল-মন্দ যাচাই কর। পরস্পর বলাবলি কর যে, আমরা বুদ্ধের শাসন গভীরভাবে বিশ্বাস করবো ও একাগ্রভাবে মেনে চলবো। আমার উপদেশ মত চল্‌লে উন্নতি, মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি হবে, কিছুতেই পরিহানি হবে না। আমাকে উপলক্ষ্য করে দানাদি যেমন পূণ্যকাজ করছো বৃথা যাবে না, আমি ফাঁকি দেব না।"

তিনি স্বীয় সাধক জীবনের কথা স্মরণ করে বলেন, "সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যে আমাকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। আমি জীবন-অঙ্গ-অবিদ্যা-তৃষ্ণা ত্যাগ করেছি। তবে আমার এসব ত্যাগ চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। কাজেই সাধারণ মানুষে তা' বিশ্বাস করবে না। আমার ত্যাগকে দেখার জন্যে জ্ঞান চক্ষু দরকার। জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ লোকে আমার ত্যাগ সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পারবে না। আমার সাধনাকালে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি এখন আমার কোন দুঃখ নেই। আমি পরিপূর্ণ সুখে সুখী হয়েছি। আমি অতি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে যে ফললাভ করেছি তা অপরকে বিলিয়ে দিচ্ছি। আমি যা প্রকাশ করি তা স্বীয়লব্ধ অভিজ্ঞা বলে প্রকাশ করি। বই-পুস্তক পাঠ করে কিংবা কারোর নিকট থেকে শুনে বলি না। অপরকে বুঝাতে হলে বাহ্যিক ত্যাগ দেখাতে হয় নতুবা লোকের বিশ্বাস হয় না। তাই অপরকে বুঝাতে পারছি না। আমি ভগবান বুদ্ধের ন্যায় রাজ্য, ধন-সম্পদ, ভোগৈশ্চর্য ও স্ত্রীপুত্র ত্যাগ দেখাতে পারি না। কাজেই সাধারণ লোকে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।"

তিনি তাঁর গৃহীকালের অবস্থা প্রসংগে বলেন যে, আমাদের পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে.আমার সামর্থ্যের অভাব ছিল না। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করলে আমি বর্তমান ফললাভ করতে পারতাম না। তিনি বলেন, বাল্যকাল থেকে আমি নানা নিমিত্ত দেখতে পেতাম ও আমার মনে নানা ভাবনা ভীড় জমাতো। আমি সমবয়সীদের সংগে মেলামেশা করতাম তবে সবসময় সংযত আচরণ করতাম। যৌবনাবেগের চাঞ্চল্যতা, যৌবন সুলভ আনন্দ-কৌতুক, হাসি-তামাসা, ঠাট্টা-কৌতুক ও লাগামহীন আমোদ-প্রমোদের প্রমত্ততা থেকে আমি সবসময় দূরে সরে থাকতাম এবং নির্জনতায় সময় কাটাতাম। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমার সহপাঠীরা যখন সাঁতার কাটা, দোঁড়াদৌড়ি ও খেলাধূলায় মেতে থাকতো এবং গ্রামের নিকটবর্তী লেমুছড়ি নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বণীতে মাছধরায় মশগুল হয়ে পড়তো তখন আমি বৃক্ষছায়ায় বসে বই পড়ায় মগ্ন থাকতাম। আমি বসে বসে সদা আনমনে চিন্তা করতাম যে, আজ যাদের দেখা পাচ্ছি হয়তো কাল অনেককে দেখতে পাবো না। জীবন একান্ত নশ্বর, সংসারে সবকিছু অনিত্য। পার্থিব সব বস্তু ক্ষণিকের জন্য। 'আমি', আমার বলে যে আমিত্বের অহংকার তা' নিরর্থক। কাজেই সংসার জীবনের মোহ আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তিনি আরো বলেন, বাল্য ও যৌবনকালে আমি অধিকাংশ সময় ধর্মীয় বই-পুস্তক পাঠে নিমগ্ন থাকতাম। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবনী সংক্রান্ত পুস্তক পাঠে আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। বই-পুস্তক পাঠের মাধ্যমে আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের বহু প্রেরণা লাভ করেছি।" তিনি তাঁর গৃহীকালের এক সামাজিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমার গৃহীকালে জনৈক মগবান মৌজাবাসী স্বীয় কন্যার বিয়ে অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করাতে পাড়াবাসীরা নিমন্ত্রণ খেতে আসেননি বলে সামাজিকতার খাতিরে বাধ্য হয়ে ছাগল-শূকর বধ করে পাড়াবাসীদেরকে খাওয়াছিলেন।" তিনি বলেন, "এই ঘটনা হতে দেখা যায়,- সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে হলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপ কাজ করতে হয়। আমি সমাজ জীবনে এই অনার্য্য আচরণ দেখে মর্মাহত হই এবং সংসার জীবনের প্রতি মনে মনে বিরাগ ভাব জন্মে।" তিনি জনৈক ব্যক্তির পত্নী-বিয়োগের কথা উল্লেখ করে আরো বলেন যে,- "সেই ব্যক্তিটি স্ত্রীর মৃত্যুতে খুবই শোকাতুর

হয়েছিলো। সেই ব্যক্তি ও তাঁর সন্তানদের শোকসন্তপ্ত হয়ে উচ্চঃস্বরে ক্রন্দনের আহাজারির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সংসারের দুঃখময়তা আমার মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিলো। সামাজিক জীবনে বসবাসের নানা বাঁধা ধরার জটিলতা ও বিপদ দেখে আমার মন বিশেষভাবে বিচলিত হয়। সংসারযাত্রা নির্বাহ করার ক্ষেত্রে বিপদের ঝুঁকি লক্ষ্য করে সংসার জীবনের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মে।" তিনি নিজের প্রব্রজ্যা গ্রহণ প্রসংগে বলেন যে,- নশ্বর মানব জীবনের প্রতি বীত স্পৃহ হয়ে আমি জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর স্বভাব ধর্ম দর্শন করে, দুঃখময় সংসারের সবকিছু অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম ভেবে সর্বদুঃখ হতে মুক্তিলাভের জন্য এবং প্রকৃত সত্যকে জানা, বুঝা, ও সত্যকে দর্শন করার জন্য ও উচ্চতর জীবনে বৌদ্ধ ধর্মকে জানা, বুঝা ও নির্বাণ সাক্ষাত করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিলাম। আমি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সংসারের যাবতীয় মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে প্রব্রজ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরস্থিত নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারের পথে গমন করি। চট্টগ্রামে পৌঁছার পর একজন ধনী-মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি আমাকে তাঁর ব্যবসাকাজে জড়িত করার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করেছিলেন। লোকমুখে শুনেছি যে, সেই ব্যক্তি নাকি চট্টগ্রাম শহরের একজন পূঁজিপতি ব্যবসায়ী। ঐ ব্যবসায়ীর প্রলোভনে আমার মন আকৃষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল। আমি আমার মনের দুর্বল মুহূর্তে তথাগত বুদ্ধের কথা ভেবেছিলাম। তথাগত বুদ্ধ গৃহী জীবনে রাজপুত্র ছিলেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র ও ভোগ-সম্পদের অভাব ছিলো না। তিনি ঐসব পার্থিব সম্পদ ও সুখ ভোগ হেলায় বিসর্জন দিয়ে শ্রেষ্ঠতম সুখ সর্বদুঃখহর নির্বাণ অনুসন্ধানে বহির্গত হয়ে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে অবশেষে সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের এই মহাত্যাগের দৃষ্টান্ত স্মরণ করে আমি আপন সঙ্কল্পে অটল থাকতে পেরেছি বলে উক্ত ব্যবসায়ীর প্রলোভনে সঙ্কল্পচ্যুত না হয়ে দৃঢ় মনোবল নিয়ে আপন অভীষ্ট সাধনের লক্ষ্যে ধাবিত হয়েছিলাম।"

সংসার দুঃখ হতে মুক্তিলাভের সহজাত বাসনা যাঁর অন্তরে সঞ্জাত হয়েছে তিনি তুচ্ছ সংসার জীবনে আবদ্ধ থাকতে পারবেন কি করে? কাজেই তিনি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধিমানসে দুর্লভ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দীক্ষাগুরুর কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, "আমার দীক্ষাগুরু ছিলেন একজন উচ্চ ডিগ্রীধারী খ্যাতনামা ভিক্ষু। তাঁর সান্নিধ্যে থাকাকালে তিনি প্রায়ই

আক্ষেপ প্রকাশ করতে শুনেছি যে, "ভিক্ষু জীবন কঠিন ও দুঃখময়।" আমার গুরুমুখে তাঁর উক্ত আক্ষেপের কথা শ্রবণ করে আমার বোধোদয় হয় যে, আমার গুরু একজন উচ্চ শিক্ষিত খ্যাতনাম ভিক্ষু হলে কি হবে; তিনি তো এখনও দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারেননি। আমার গুরুর অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম যে- শুধু মস্তক মুন্ডন ও কাষায় বস্ত্র ধারণ করে ভিক্ষু হলে কিংবা উচ্চ শিক্ষিত হলে দুঃখ হতে মুক্তিলাভ করা যায় না। কাজেই ঐসবে আত্ম প্রসাদ লাভের কোন সার্থকতা নেই। স্বধর্মের সম্যক অনুশীলন তা বাস্তব উপলব্ধি বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভবদুঃখ হতে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। সত্যভাব উদয় না হলে সত্যধর্মের আস্বাদ পাওয়া যায় না।" তিনি বলেন,- "অবশেষে আমি আমার দীক্ষাগুরুর সাহচর্য্য পরিত্যাগ করে পার্বত্য-চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে 'পোমরা বৌদ্ধ বিহারে কিছুদিন অবস্থান করার পর চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান গ্রহণ করি। তথায় অবস্থানকালে তৎকালীন বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে বলেন যে, "বর্তমান সময়ে ভাল গুরুর খুব অভাব। কেঁদে মরে গেলেও ভাল গুরু মিলবে না।" তাঁর এই অমূল্য উপদেশে আমার চৈতন্যোদয় হয়। অতঃপর আমি রাইংখ্যং এলাকার একটি বৌদ্ধ বিহারে কিছুকাল অবস্থান করার পর উক্ত বিহার ত্যাগ করে "দোখাইয়া" নামক স্থানে কিছুদিন ধ্যানাসনে কাটাই। কিন্তু উক্ত স্থান ধ্যানোপযোগী না হওয়ায় কর্ণফুলীর বাম তীরবর্তী ধনপাতা ছড়ার তীরে অবস্থিত এক নির্জন বনে প্রবেশ করে গুরুহীন অবস্থায় সাধনায় আত্মনিয়োগ করি। বাঘ-ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত নির্জন অরণ্যে শুধুমাত্র অষ্ট পরিষ্কার সামগ্রী সম্বল করে সাধনারত ছিলাম। আমি বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অটল সাধনায় নিমগ্ন থাকাকালে নিকটবর্তী লোকালয়ে পিন্ডাচরণে বহির্গত হতাম। পিন্ডাচরণকালে কোন সময় পর্যাপ্ত আহার পেতাম আর কোনদিন কম পেতাম। অনেক সময় অর্ধসিদ্ধ তরকারী অপক্ক ভাত জুট্‌তো। অনেক সময়ে অনাহারে অর্ধাহারে কাটাতে হয়েছে। হিংস্র প্রাণীর উপদ্রব, মশামাছি-ইত্যাদির উৎপাত ও আহার সংগ্রহে সমস্যা সত্ত্বেও আমি ধৈর্য্যচ্যুত হইনি বলে আমি বর্তমান অবস্থান প্রাপ্ত হয়েছি। এগার বছর যাবৎ ধনপাতায় সাধনাকালে আমার মাঝে-মধ্যে যে চিত্ত বিতর্ক হয়নি তা' নয়। আমি ভগবান বুদ্ধের প্রতি অটল বিশ্বাসের বলে ধর্মকে অধিগত করার লক্ষ্যে নিজেকে বলি দিতে পেরেছি বলে আমার সাধনা বিফল হয়নি।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কথা বলতে গেলে প্রসংগক্রমে রাজবন বিহারের কথা এসে যায়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও রাজবন বিহারের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই দুটি নামের সঙ্গে রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠার জন্য চাক্‌মা রাজ পরিবার কর্তৃক বর্তমান বিহার এলাকার ভূমিদানের মাহাত্ম্য কথা ও চিরযুক্ত হয়ে আছে। বস্তুতঃ লক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে না হলে রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠা হতো না; আবার চাক্‌মা রাজ পরিবার কর্তৃক বর্তমান বিহার এলাকার ভূমিদান করা না হলে রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠা হতো না। কাজেই শ্রদ্ধেয় বনভন্তে, রাজবন বিহার ও দানশীল চাক্‌মা রাজ পরিবার-এই তিনটি শব্দ একই সূত্রে গ্রথিত। ১৯৭৪ সনে এই পবিত্র বিহার প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৬ সনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এখানে বর্ষাবাস যাপন করেন ও পরবর্তীকালে বৈশাখী পূর্ণিমার প্রাক্কালে স্থায়ীভাবে এখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণের ফলে ইহা বর্তমানে একটি অন্যতম বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজবন বিহার একটি বিনয় সম্মত আদর্শ-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠান হতে ইহার ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। এখানকার আবাসিক ভিক্ষুসংঘ বিনয় সম্মতভাবে দানীয় বস্তু গ্রহণ করেন ও নিজের পিন্ড পাত্রে আহার করেন। দায়ক-দায়িকার আমন্ত্রণ ব্যতীত অকারণে ও অসময়ে বিহার এলাকার বাহিরে যান না এবং অযথা যত্রতত্র বিচরণ না করে ধ্যান-সমাধিতে ও ধর্ম-চর্চায় নিরত থাকেন। আবাসিক ভিক্ষুসংঘের জন্য বিহার এলাকায় নির্মিত কুটির গুলোতে তাঁরা ভাবনারত থাকেন। এই বিহার প্রতিষ্ঠানে ভিক্ষুসংঘের উপোসথ কর্ম ও বিনয় সম্মত উপসম্পদাকল্পে একটি ভিক্ষুসীমা রয়েছে। ১৯৭৬ সন হতে এই বিহার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার হয়। বিহার পরিচালনা কমিটির অক্লান্ত প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত উদ্যোগে উন্নয়নমূলক কাজ সমাধা ও পূণ্যকামী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের তিল তিল করে ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানের বর্তমান পর্যায়ে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। তাঁর পাশাপাশি সদাশয় সরকারের সামরিক বেসামরিক কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত আর্থিক ও অন্যান্য বিবিধ সহায়তার ফলে এই বিহার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকে বেগবান করেছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে উপলক্ষ্য করে এই পবিত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান একাধারে পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ, শমথ-বিদর্শন ভাবনার জন্য একটি আদর্শ কেন্দ্ররূপে বৌদ্ধ ধর্মের স্থিতি, প্রচার, বিস্তৃতিকল্পে বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মীয়

জীবনে পথিকৃৎ এর ভূমিকা পালন করে চলেছে। শ্রদ্ধেয় বনভান্তের সাক্ষাৎলাভে প্রয়াসী হয়ে এখানে প্রত্যহ ছুটে আসেন শত শত ধর্মপ্রাণ ভক্তমণ্ডলী দেশের নানা অঞ্চল থেকে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় বৌদ্ধধর্মের সার মর্ম ও সত্যধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণযোগে ভক্তদের কাছে এর উজ্জ্বল মর্মবাণীকে হৃদয়ে ধারণ করায়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় নিরন্তর আত্মনিবেদিত রয়েছেন। তিনি অত্র বিহারে স্থানান্তর গ্রহণের প্রথম দিকে তাঁর দর্শনার্থীদের সংখ্যাগত কলেবর ছিলো ক্ষীণ। কালক্রমে তাঁর মহান প্রভাবে ধর্মানুরাগীদের অন্তরের তাগিদে প্রতি বছর ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌তে থাকে দর্শনার্থীর সংখ্যা। এখানে নববর্ষে সার্বজনীন পরিত্রাণ-শ্রবণ, বৈশাখী-পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, সাধারণের প্রবারণা অধিষ্ঠান, বিশাখা প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিতে কঠিন চীবন দান, বোধি পূজা, সার্বজনীনভাবে অর্হৎ সীবলী পূজা ইত্যাদি বৌদ্ধ ধর্মীয় পর্বসমূহ প্রতি বছর ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে নিয়মিত উদযাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৯৯৬ সন হতে ৮ই জানুয়ারীতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্ম দিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়ে আস্‌ছে। এসব অনুষ্ঠান সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এদেশের বৌদ্ধগণের সজীবতা প্রকাশ পায়। পূণ্যকামী লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে এখানে সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান, পরিত্রান শ্রবণ ও বিবিধ দানীয় বস্তু দান করতে আসেন ও শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হতে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে কৃতার্থ হন। অন্য সম্প্রদায়ের অনেক অবৌদ্ধ ব্যক্তিবর্গ ও অভীষ্ট সিদ্ধি মানসে বিবিধ উপচার নিয়ে শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে অর্ঘ্য নিবেদন করে উপদেশ গ্রহণের জন্য আগমন করেন। এখানে অনুষ্ঠেয় উক্ত ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষ্যে অগণিত ধর্মপ্রাণ নর-নারীর ঢল নামে দেশের নানা অঞ্চল থেকে। বাংলাদেশের মধ্যে আর কোথাও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকের এতো বৃহৎ সমাগম হয় না। সারা বছর ধরে প্রত্যহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে আগত অগণিত পূণ্যার্থীদেরকে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দর্শনাসৃত বিতরণে কৃতার্থ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের সারতত্ত্ব ও এই ধর্মের মানবিকতার মূল মর্মের সুগভীর জীবন দর্শন নিয়ে দেশনা করেন প্রতিনিয়ত। তিনি তাঁদেরকে বৌদ্ধ ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে অতি প্রাঞ্জল ও সাবলীলভাবে উপদেশ দান করেন। এখানে কোন বস্তুগত প্রাপ্তির আশা নিয়ে নয়, বরং অন্তরে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি নিবেদন নিয়েই সবাই এসে থাকেন তাঁর শ্রীমুখ থেকে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে নিজেদের

ধর্মবোধকে প্রতিষ্ঠা করে নিতে এবং নিজেদের অন্তরের ধর্মীয় দীপ্তি আরো উজ্জ্বল করে তোলার জন্য। বিহার থেকে ফিরে যাবার সময় তাদের মনে জেগে থাকে এর উজ্জ্বল দীপ্তি যার ফলশ্রুতিতে তাঁদের চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দূর হয় ও নিজেদের চিন্তা চেতনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ক্রমে সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী করুণা, ভালবাসা আর মানবিক বোধে ভরে উঠে সত্যিকারের ধর্মানুরাগীদের মন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দর্শনে আগমনকারীদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁকে দর্শন করে হতবাক হয়েছেন তাঁর তেজোদীপ্ত বাগ্মীতার শক্তি দেখে, কেহবা খুঁজে পেয়েছেন জীবনে চলার পথ। আমার জানামতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংস্পর্শে এসে অনেকের গতানুগতিক জীবন ধারায় আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য্য যে, তিনি অজ্ঞানান্ধ লোকের জ্ঞানালোকের পথ প্রদর্শক। তাঁর মহান প্রভাবে সর্বস্তরের বৌদ্ধ নরনারী ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। একজন বুদ্ধপুত্ররূপে তিনি স্বধর্মের প্রদীপ্ত শিখায় বৌদ্ধ জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় দীপ্তিমান। তিনি বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের একজন অতি শ্রদ্ধেয় পূজনীয়, বরণীয় ধর্মগুরু এবং কল্যাণমিত্র। তাঁর মতো একজন সত্যদ্রষ্ঠা সাধনসিদ্ধ ধর্মগুরু পেয়ে এদেশের বৌদ্ধ সমাজ ধন্য ও গৌরবান্বিত হয়েছে। তিনি দেব-মানবসহ সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা করে জ্ঞানদান, ধর্মদান ও অভয়দানকারী কল্যাণ মিত্ররূপে সবার শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর সংস্পর্শে আসার যাঁর সুযোগ হয়েছে তার মানব জীবন ধন্য ও তিনি নিঃসন্দেহে একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এতদ্‌ঞ্চলে ধর্মীয় উন্নতিকল্পে করণীয় বিষয়ে যা মত প্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে কিছু তুলে ধরা দরকার। তিনি মত প্রকাশ করে বলেন যে, "এদেশে ভিক্ষু-পরিষদ, ভিক্ষুনী পরিষদ, উপাসক পরিষদ ও উপাসিকা পরিষদ নেই। অথচ বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্যে এই চারি পরিষদ প্রয়োজন। কিন্তু এখানকার বৌদ্ধ জনগণ ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ও আর্থিকভাবে দরিদ্রগ্রস্ত। ধর্মীয় উন্নতি বিধানকল্পে দক্ষ ভিক্ষু, উপযুক্ত উপাসক-উপাসিকা ও ভিক্ষুসংঘের সুখ-সুবিধাদি সম্বলিত বিহার প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুব্যবস্থাদি থাকা প্রয়োজন। যিনি নামরূপ, পঞ্চস্কন্ধ, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি পুংখানুপুঙ্খভাবে জানেন, বুঝেন, যিনি মারভূবন দক্ষ, অমার ভূবন দক্ষ, মৃত্যুরাজ দক্ষ, অমৃত্যুরাজ দক্ষ, ইহকাল দক্ষ ও পরকাল দক্ষ-একমাত্র সেই ভিক্ষুর কথা শুনলে ধর্মে সুফল লাভ করা যায়। উপরোক্ত বিষয়ে না জেনে,

না বুঝে শুধু বইপড়া জ্ঞানে আন্দাজে ধর্মকথা বল্‌লে হবে না। চাক্‌মা বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলে ভাল ব্যবস্থাদি সম্বলিত বিহার প্রতিষ্ঠানের অভাব। সেজন্যে আমি বিহার নির্মাণ, উন্নয়ন ও একটি উপযুক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্য্যাদি করার উপর জোর দিচ্ছি। ভিক্ষু সংঘের সুবিধা বিধানকল্পে রাজবন বিহার এলাকায় আরো বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে। ধ্যান-সাধনার উপযোগী আরো বহুবিধ সুব্যবস্থাদি বিধানেরও প্রয়োজন রয়েছে। আমি থাকতে যদি এসব করতে না বলি ভবিষ্যতে অন্য ভিক্ষুদের পক্ষে এসব করা কঠিন হবে। কারণ তখন লোকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তো এসব করতে বলেননি, এই ভিক্ষু কেন করতে বলেন ইত্যাদি। স্বধর্মের গৌরব রক্ষা, ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি ও সকলের মঙ্গলের জন্য আমি উন্নয়নমূলক কাজসমূহ করার উপদেশ দিচ্ছি। তবে মনে রেখো আমার নিজের জন্যে আর এসবের কোন প্রয়োজন নেই। আমার সুখ-সুবিধার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন আমি সুখে আছি। আমার সুখ সুবিধা করে দেওয়ায় তোমাদের ও বিপুল পূণ্য হয়েছে। তবে ধর্মীয় উন্নতিকল্পে আমার কথামত ভিক্ষুসংঘের জন্য আবাসিক সুব্যবস্থাদি করা একান্ত প্রয়োজন। যদি আমার কথামত একাজে অগ্রসর হতে পার তাহলে ভবিষ্যৎকালে বর্তমান রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজের লণ্ডন শহরে পরিনত হবে। আমি আন্দাজে এসব কথা বলছি না। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যা বলা হয় সেই কথাগুলো প্রচন্ডবেগে "সাইক্লোন" হওয়ার সময় "শলাই কাঠি" জ্বালালে যা' হয় সেই অবস্থা হয়। আমি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মতো এসব কথা বলছি না।"

এতদঞ্চলে ধর্মের স্থিতি, বিস্তৃতি ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠানের অবদান অসামান্য। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় যেমন নিজের তুলনা নিজে অপরপক্ষে রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের ধর্মীয় জীবনে অনন্য স্থান দখল করে আছে। বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগী বৌদ্ধ জনগণের প্রাণপ্রিয় এই পবিত্র ধর্মীয় কেন্দ্র স্বধর্ম চর্চা ও ধর্মীয় বিকাশের প্রাণকেন্দ্ররূপে আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বলভাবে বিরাজমান। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও রাজবন বিহার দ্বারা এদেশের বৌদ্ধদের যেমন গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে, বাংলাদেশেরও গৌরব

বেড়েছে। বৌদ্ধধর্মের লালনভূমি হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ, ময়নামতি, পাহাড়পুর ও মহাস্থানগড় প্রভৃতি সুপ্রাচীন কালের বৌদ্ধ নিদর্শনসমূহের লীলাভূমি এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অতীশ দীপঙ্করের জন্মভূমি আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধিতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও রাজবন বিহার বিশেষ সহায়ক হয়েছে সন্দেহ নেই।

তিনদিকে কাপ্তাই হ্রদের জলে ঘেরা, অনুচ্চ এক ভূখন্ডের উপর শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে উপলক্ষ্য করে প্রতিষ্ঠিত এই বিহার প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ অতুলনীয়। এখানকার ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য গাছ-গাছালিতে ভরা শীতল ছায়া ঢাকা মনোরম প্রান্তর, নীল গগনের সোহাগ মাখা সকাল-সন্ধ্যা দর্শনার্থীদের হৃদয় হরণ করে। বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে এমন একটি মাধুর্য্য ফুটে উঠে, যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই পবিত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূলে রয়েছে শুধুমাত্র কঠিন ধর্মীয় নীতিবোধ নয়, বরং একটা প্রসারিত আত্মীয়তাবোধ, মমত্ববোধ, মানবতাবোধ, শ্রীবোধ ও প্রীতিবোধ। এর পবিত্র প্রাঙ্গনে প্রত্যহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে শত শত পূণ্যার্থী ও দর্শনার্থী কোন এক আশ্চর্য আকর্ষণে এখানে সমবেত হন। দেশে-বিদেশে এই প্রতিষ্ঠানের প্রসিদ্ধি ও সুনাম দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছে। দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা ভিক্ষু ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শুভাগমন হয়েছে এখানে। এই বিহার প্রতিষ্ঠানের আরো সম্প্রসারণকল্পে বিগত ১৯৯৫ সনে বিহার এলাকা সন্নিহিত প্রায় সাড়ে ছয় একর জমি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাদানের সাহায্যে ক্রয় করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিহার পরিচালনা কমিটির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ চলছে।

এই বিহার প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠেয় পূণ্যযজ্ঞে যোগদান করতে পারার আনন্দের আবেগে পূণ্যার্থীরা নিজকে খুলে দেয়, মেলে দেয়, মিলতে চায় একে অন্যের সঙ্গে। মানুষে-মানুষে মিলনের আনন্দে বিহার এলাকার বহিরাঙ্গন উৎসব মুখর রূপ নেয়। এভাবে এতদ্‌ঞ্চলের বৌদ্ধগণের প্রবল ধর্মানুরাগ, ধর্মপ্রাণতা ও কুশল চেতনার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা চির অটুট থাকুক- এই প্রত্যাশা সকলের।

"সকল প্রাণী সুখী হোক।"

চিকিৎসকের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে

ডাঃ নীহারেন্দু তালুকদার
অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন

রাংগামাটির রাজ বনবিহার বর্তমানে একটি সার্বজনীন তীর্থস্থান। দেশ বিদেশের বহু পূণ্যার্থী এ তীর্থস্থানে দৈনিক এসে ভীড় জমাচ্ছেন। উদ্দেশ্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে দর্শন ও ভন্তের শ্রীমুখ নিঃসৃত ধর্ম কথা শ্রবন। ভক্তরা তাঁদের হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি অর্ঘ্য দিয়ে বনভন্তেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে গন্তব্য স্থলে ফিরে যাচ্ছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন "পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার" কবিগুরুর সাথে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে চাই তথাগত বুদ্ধের ধর্মনগরের মতই রাজ বনবিহার আজ ধর্মনগরে পরিণত হয়েছে। ধর্মপিপাসু ও মুক্তিকামী মানুষের দল এ ধর্মনগরে উপস্থিত হয়ে কর্মমূল্যে ও শ্রদ্ধামূল্যে দুঃখ মুক্তির প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে চলেছেন।

তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ একজন মহান চিকিৎসক ছিলেন। দুঃখরূপী রোগমুক্তির জন্য তিনি আর্য অষ্টাগিংক মার্গ নামক অব্যর্থ মহৌষধ আবিষ্কার করেছেন। অমৃতময় এ মহৌষধি সেবন করে গৃহী ভিক্ষু নির্বিশেষে শত সহস্র নরনারী দুঃখমুক্তির স্বাদ পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন। তাই বলা হয় "বেজ্জবির বুদ্ধো, ভেষজ্জ বিয় ধর্ম্মো, রোগ মুত্তো সংঘো" অর্থাৎ চিকিৎসকের মত বুদ্ধ, ভৈষজ্যের মত ধর্ম ও রোগ মুক্তের মত সংঘ। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর পরবর্তীতে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের মার্গফল লাভী ভিক্ষুরা দেব মনুষ্যের হিত কামনায় দুঃখ মুক্তির জন্য চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করে আসছেন। বর্তমানে রাজ বনবিহারের বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও একজন দক্ষ চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আপামর জনসাধারণের দুঃখ মুক্তির জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভগবান বুদ্ধের ধর্মনগরে যেমন নানা প্রকার ধর্মের পণ্য আছে। যথাঃ- ১। ফুলের দোকান ২। গন্ধ দ্রব্যের দোকান ৩। ফলের দোকান ৪। ভৈষজ্যের দোকান ৫। শিকড় ছালের দোকান ৬। অমৃতের দোকান ৭। রত্নের দোকান ৮। সর্বদ্রব্যের দোকান প্রসারিত থাকে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মের দোকানেও বিভিন্ন প্রকারের পন্যের দোকান সাজানো আছে। বনভন্তে বলেছেন এই হ্রদের জল কেউ সারাজীবন ব্যবহার করলেও নিঃশেষ করতে পারবে না। তদ্রুপ আমার জ্ঞান ভান্ডার ও হ্রদের জল তুল্য। আমি তোমাদের নিকট উদাত্ত কণ্ঠে জানাই,- তোমরা ক্ষমতা অনুযায়ী জ্ঞান পাত্র নিয়ে আস। আমি পাত্র অনুযায়ী তোমাদেরকে জ্ঞান পরিপূর্ণ করে দেব। আমার নিকট কেউ এসে শুধু জলপান করে চলে যায়, কেউ কেউ ছোট পাত্র, কেউ মধ্যম পাত্র নিয়ে আসে। খুব কম সংখ্যক লোকই বড় পাত্র নিয়ে আসে। আমি তাদের আয়তন বুঝে পরিপূর্ণ করে দিই।

মিলিন্দ রাজ শ্রদ্ধেয় নাগসেন স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-ভন্তে নাগসেন। বুদ্ধের ঔষধের দোকান কি? নাগসেন স্থবির উত্তরে বলেছিলেন- ১। দুঃখ আর্যসত্য ২। দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য ৩। দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য ৪। দুঃখ নিরোধগামী মার্গ আর্যসত্য। এই চারি আর্য-সত্যই বুদ্ধের ঔষধের দোকান। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও উপাসক-উপাসিকাদের প্রায়শ এই চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে বলে থাকেন। তিনি বলেন-নির্বাণ লাভেচ্ছু ব্যক্তিকে অবশ্যই চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। তবেই দুঃখ মুক্তি সম্ভব।

তথাগত বুদ্ধের ভৈষজ্য দ্রব্যের দোকানের ন্যায় বনভন্তের ও ভৈষজ্য দ্রব্যের দোকানে প্রসারিত আছে চারি স্মৃতি উপস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধি অংগ এবং আর্য অষ্টাগিংক মার্গ। এই সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম। এই সমস্ত ভৈষজ্য দ্রব্যের তৈরী বিরোচন সেবনে নির্বান লাভেচ্ছু ব্যক্তির মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা ব্যায়াম, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি দূরীভূত হয় এবং লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, সংশয়, উদ্ধত্য, তন্দ্রালস্য, নিলর্জ্জতা, সংকোচহীনতা এবং সর্বাধিক কলুষকে দমন করানো

হয়। ইহা ছাড়া ও সাধারণ দোকানের পণ্য সামগ্রীতে আছে জাতি সম্পত্তি, ভোগ সম্পত্তি, আয়ু সম্পত্তি, আরোগ্য সম্পত্তি, সৌন্দর্য সম্পত্তি, প্রজ্ঞা সম্পত্তি, মানবিয় সম্পত্তি, দিব্য সম্পত্তি ও নির্বাণ সম্পত্তি। যারা উপরোক্ত সম্পত্তি লাভ করতে চান তারা উচিত মূল্য দিয়ে প্রার্থিত সম্পত্তি ক্রয় করতে পারেন। কেউ কেউ শীল পালনের দ্বারা উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন, কেউ উপোসথ কর্মদ্বারা ক্রয় করেন আবার কেউ স্বল্পমাত্র পূণ্য দ্বারা ও অনুরূপ সম্পত্তি ক্রয় করেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রায়ই উপাসক উপাসিকা ও দর্শনার্থীদের চিত্তের অবস্থা বুঝে দেশনা করে থাকেন। চিত্তের কোন অবস্থায় উপাসক-উপাসিকাদের কি ধরণের ধর্মকথা বললে উপকার হবে সেই বিচেনাতেই তিনি প্রায়ই ধর্মদেশনা করে থাকেন। আমি বা ডাঃ সুপ্রিয় বাবু যখনই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের চিকিৎসার জন্য বনবিহারে যাই তখন ভন্তে আমাদেরকে বলেন-তোমরা আমার রোগের চিকিৎসা করছ, কিন্তু তোমাদের চিকিৎসা আমাকে করতে হবে। তোমাদেরকে ধর্মের ঔষধ খেতে হবে। তখন আমরা অত্যন্ত বিনীতভাবে বলি-ভন্তে, আমরা অবশ্যই ধর্মের ঔষধ খাব। আপনি দয়া করে আমাদেরকে ধর্মের ঔষধের কথা বলুন। তখন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে অত্যন্ত গুরু গম্ভীর ভাবে কুশল ধর্ম, অকুশল ধর্ম, লোভ, দ্বেষ, মোহের কুফল ও অলোভ, অদ্বেষ, অমোহের সুফল, ক্লেশমার, স্কন্ধমার ইত্যাদির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং সর্বসংস্কার অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মভাব উপলব্ধির মাধ্যমে পরম শান্তিপ্রদ নির্বান্ লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান দেশনা দিয়ে থাকেন। দেশনার শেষে আমরা পরিতৃপ্ত মন নিয়ে ফিরে আসি।

মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ। এই দুর্লভ মানব জন্মকে সার্থক করে তোলার জন্য প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের সৎজীবন যাপন ও ধর্মচারণের মাধ্যমে উর্দ্ধগতি সম্পন্ন হয়ে উত্তরোত্তর নির্বানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। নির্বাণকামী মানুষের এ অগ্র যাত্রায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মোবধিরূপ মূল্যবান উপদেশ সবার পাথেয় স্বরূপ হোক, এ কামনা করি।

"জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক"

লোকোত্তর জ্ঞান

সুকোমল কান্তি চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপক

রাংগামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

লোকোত্তর জ্ঞান সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া পরম আর্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তে লোকোত্তর জ্ঞান সম্পর্কে জনসাধারণকে যে ধারণা দিতে সক্ষম সেদিক দিয়ে তাঁর জ্ঞানের কাছে আমরা একেবারেই শিশু। লোকোত্তর জ্ঞান যিনি আয়ত্ব করেছেন তাঁর কাছে লোকোত্তর জ্ঞান বিশ্লেষণ করা অতীব সহজ। কিন্তু আমাদের মত নগণ্য জ্ঞানের অধিকারীদের পক্ষে লোকোত্তর জ্ঞান ব্যাখ্যা করা বড়ই কষ্টসাধ্য। তবুও পন্ডিতগণের গবেষণালব্ধ বই পড়ে লোকোত্তর জ্ঞান সম্পর্কে বিশ্লেষণের এ আমার মৃদু প্রয়াস।

লোকোত্তর জ্ঞান প্রাপ্ত হয় লোকোত্তর ধ্যান চিত্তের মাধ্যমে যেখানে ধাপে ধাপে এজ্ঞান আয়ত্ব করা যায়। যেমন প্রথমে চার প্রকার লোকোত্তর মার্গচিত্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১। **স্রোতাপত্তি মার্গচিত্তঃ-** যখন চিত্ত আর্য অষ্টাগিংক মার্গ দ্বারা নির্বাণ প্রবাহে প্রবেশ করে স্রোতাপত্তি মার্গে উপনীত হয় তখন এ অবস্থাকে স্রোতাপত্তি মার্গ (পথ) চিত্ত বলা হয়।

২। **সকৃদাগামী মার্গচিত্তঃ-** যখন চিত্ত আর্য অষ্টাগিংক মার্গ দ্বারা নির্বাণ মার্গে উপস্থিত হয়ে একবার মাত্র মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে তখন এ অবস্থাকে সকৃদাগামী মার্গচিত্ত বলা হয়।

৩। **অনাগামী মার্গচিত্তঃ-** যখন চিত্ত অষ্টমার্গ দ্বারা নির্বাণ প্রবাহের অনাগামী মার্গে উপনীত হয়, এই চিত্তের অধিকারীদের মনুষ্যলোকে জন্ম নিতে হয় না। এ অবস্থাকে অনাগামী মার্গচিত্ত বলা হয়।

৪। **অর্হৎ মার্গচিত্তঃ-** চিত্ত যখন অষ্টমার্গ দ্বারা সব ক্লেশ হতে মুক্ত হয়ে সর্বজীবের পূজ্য হয় তখন এ অবস্থাকে অর্হৎ মার্গচিত্ত বলা হয়।

এই চার প্রকার লোকোত্তর মার্গ জ্ঞান লাভ করলে নিম্নবর্ণিত ফল লাভ করা যায়।

১। স্রোতাপত্তি ফল দুই প্রকারঃ-

ক) যেসব পুদগলেরা ধ্যাণ বিনা স্রোতাপত্তি জ্ঞান (ভাব) লাভ করেন তাঁরা মনুষ্যলোকে বা দেবলোকে একমাত্র জন্ম নেন এবং সেখান থেকে অর্হৎ হয়ে নির্বান লাভ করেন। একে একবার প্রতিসন্ধি নামক স্রোতাপত্তি পুদগল বলে।

খ) যেসব পুদগলেরা ধ্যাণ বিনা স্রোতাপত্তি ভাব লাভ করেন তাঁরা এক থেকে ছয়বার মনুষ্য লোকে অথবা এক থেকে ছয়বার দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করে। অরহত্ব ফল লাভ করে নির্বাণ গমন করেন। যাকে ছয়বার প্রতিসন্ধি নামক স্রোতাপত্তি পুদগল বলে।

২। সকৃদাগামী মার্গফল দুই প্রকারঃ-

ক) যেসব পুদগলেরা ধ্যাণ বিনা সকৃদাগামী জ্ঞান ফল লাভ করেন তাঁরা সে ভূমিতে একবার মাত্র প্রতিসন্ধি প্রাপ্ত হয়ে সে ভূমি হতে অর্হৎ হয়ে নির্বাণ লাভ করেন।

খ) যেসব পুদগলেরা ধ্যাণ বিনা সকৃদাগামী ফললাভ করেন তাঁরা দেব ভূমিতে একবার মাত্র প্রতিসন্ধি প্রাপ্ত হয়ে অরহত্ব ফল লাভের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করেন।

৩। অনাগামী ফল দুই প্রকারঃ-

ক) যেসব পুদগলেরা ধ্যান বিনা মনুষ্য ভূমিতে অনাগামী ফল লাভ করেন তাঁরা শুদ্ধাবাস বদ্ধভূমিতে অর্ধকাল অবস্থানের পর সে ব্রহ্মভুমি হতেই নির্ব্বাণ লাভ করেন।

খ) যেসব পুদগলেরা ধ্যান বিনা মনুষ্য ভূমিতে অরহত্ব লাভ করেন তাঁরা সে ভূমি হতেই নির্বাণ গমন করেন।

৪। অরহত্ব পুদগলেরা চার প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত চিত্তের ভাব ও এক প্রকার ঔদ্ধত্য চিত্তের ভাব গ্রহন করেন। চিত্তে লোকোত্তর মার্গের কারণ উৎপত্তি করতঃ লোকোত্তর ফল উৎপত্তি করে থাকে। চিত্ত একবার লোকোত্তর মার্গে প্রবেশ করলে সব ক্লেশ উৎপত্তির বিনাশ হয়। যেমনঃ বজ্রপতন বৃক্ষের পত্র, শাখা ও মূল বিনাশ হয়। তেমনি চিত্তের সব ক্লেশ উৎপত্তি বিনাশ হয়।

এছাড়া আরও চল্লিশ প্রকার লোকোত্তর ধ্যান চিত্ত নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ-

"চল্লিশ প্রকার লোকোত্তর ধ্যান চিত্ত"

এ অবস্থায় যোগীদের কর্মস্থান ধ্যানের সময় পাঁচ প্রকার লোকোত্তর ধ্যান অবস্থা অতিক্রম করতে হয়। প্রথমাবস্থায় ধ্যানের কোন এক প্রকার ধ্যানে যোগ প্রবেশ করে সবরকম সংস্কার অনিত্য, সব রকম সংস্কার দুঃখ, সব ধরণের সংস্কার অনাত্ম কিংবা সব অনাত্মভাব বা সর্বভাবে আমি নেই এরূপ পুনঃ পুনঃ ভাবনার মাধ্যমে লোকোত্তর মার্গচিত্ত লাভ করে, অর্পন ভাব উৎপত্তি হয়। এ পরিকর্ম ও উপাচার অনুলোপ গোত্রের (লোকোত্তর গোত্রের) বিদৃশ জ্ঞান উত্থানগামীর কারণ নিকটবর্তী হয়। এটি পাদক নামক ধ্যানে নামে পরিচিত।

এ কর্মস্থান ধ্যানের সময় যোগীরা সব ধরণের সংস্কার অনিত্য, সব ধরণের সংস্কার দুঃখ ও সব ধরণের অনাত্মা ভাব, এরূপ বারবার ভাবনা ও বারবার প্রবৃত্ত হয়ে সম্মৃসা নামক ধ্যান লাভ করে।

ধ্যানের প্রথম অবস্থায় যে যোগী স্রোতাপত্তি জ্ঞান লাভ করে তাঁকে প্রথম অবস্থার স্রোতাপত্তি পুদগল বলে। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থার ধ্যানে যোগী জ্ঞান লাভ করলে তাদেরকে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থার স্রোতাপত্তি পুদগল বলে। ঠিক তেমনি সকৃদাগামী ও অনাগামী ধ্যানের পুদগল। অর্হৎ ধ্যানের পুদগল ও স্রোতাপত্তি পুদগলের সদৃশ।

যে যোগীরা স্রোতাপত্তি ধ্যান চিত্ত কিংবা সকৃদাগামী ধ্যান চিত্তের জ্ঞান লাভ করে থাকেন তাঁরা ব্রহ্মলোক হতে অর্হৎ ফল লাভ করে নির্বাণ গমন করেন।

এভাবে বিভিন্ন ধ্যান মার্গের মাধ্যমে লোকোত্তর জ্ঞান আয়ত্ত্বের মাধ্যমে মহাসুখময় নির্বাণ লাভ করা যায়।

সাহায্যকারী গ্রন্থ ঃ অভিধর্ম গ্রন্থ।

আমার স্মৃতিতে রাজবন বিহার

সঞ্জয় বিকাশ চাক্‌মা
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি।

সাধক প্রবর পরম শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) এর আবির্ভাব আমাদের জাতীর কল্যাণের এক শুভ ইঙ্গিত বহন করে। জাতীর সংকটময় চরম মুহূর্তে এমনিভাবে যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাব ঘটে। আমাদের বেলায়ও তাই ঘটেছে। ষাট দশকের দিকে আমার ছাত্র জীবনে শ্রদ্ধেয় ভন্তের সরাসরি সান্নিদ্ধে আসার সুযোগ হয়নি। তবে "বন শ্রমন" নামটি তখন বড়দের মুখে মুখে বলাবলি করতে শুনেছি। সাধ জেগেছিল দেখ্‌তে কিন্তু সুযোগ হয়নি। ১৯৭৪ ইং সনে রাজবাড়ী ভিটার দরবার শালায় বিশাখা প্রবর্তিত পদ্ধতিতে কঠিন চীবর দানোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে আমন্ত্রন করে রাঙ্গামাটি আনা হয় তখনই তার দর্শন লাভ করি। বলতে গেলে তখন থেকেই সুতা রং করা, সিদ্ধ করা, মারকরা ও সুতা শুকানো বিভাগে প্রায় প্রত্যেক বৎসর কঠিন চীবন দানোৎসব সক্রিয়ভাবে পূণ্যকাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়। সেদিনের করুন স্মৃতি এখনও মনে পড়ে। মধ্যরাত থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল সাথে সাথে বাতাস। যতই ভোর হতে থাকে ততই ঝড়ের গতিবেগ বাড়তে থাকে। সেই ঝড়ের ঝাপটায় কাপ্তাই থেকে আগত পূন্যার্থীর একটি লঞ্চ জলমগ্ন হয়ে যায়। এতে বহু নর-নারী মারা যায়। হতাহত পূণ্যার্থীর পরিবারের সদস্য এখনও সেই স্মৃতি মুছে ফেল্‌তে পারেনি।

অনুষ্ঠানের পর পরই শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আবারও তিনটিলায় চলে যান। তিনি চলে গেলেও তাঁকে রাঙ্গামাটি শহরে বিহার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি। কঠিন চীবর দানোৎসবে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অস্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য ১টি বিহার, ১টি চংক্রমন কুটির, ১টি ভোজনশালা, ১টি ভিক্ষু কুটির, ১টি দেশনালয় ও ১টি রান্নাঘর নির্মাণ করা হয়। উল্লিখিত ঘরগুলির নির্মাণ কাজে বাবু লগ্নকুমার চাক্‌মা (বনভন্তের কারিগড়) কায়িক শ্রম দিয়ে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে রাঙ্গামাটিতে স্থায়ীভাবে

অবস্থানের আমন্ত্রণ জানাতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাবু সমর বিজয় চাক্‌মা, বাবু কুমুদ বিকাশ চাক্‌মা, বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা, বাবু লগ্নকুমার চাক্‌মা আরো অনেকেই এবং রাজপরিবারের মধ্যে রাজমাতা রাণী আরতি রায়, রিজেন্ট কুমার সুমিত রায় (জনি), সম্ভবত রাজা দেবাশীষ রায় (তখন ছাত্র) নিজেও ছিলেন। এব্যাপারে তখনকার সময়ে রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরো সুদপদেশ প্রদানসহ সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখেছিলেন।

১৯৭৫ সনে শ্রীমৎ নন্দপাল ভিক্ষু ও শ্রীমৎ উত্তমানন্দ ভিক্ষু প্রথম বর্ষাবাস যাপন করেন। ১৯৭৬ সনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রথম বারের মত বনবিহারে বর্ষাক্রম যাপন করেন। অতঃপর ১৯৭৭ সনে জুন বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে তাঁর শিষ্যবর্গসহ স্থায়ীভাবে তিনটিলা বন বিহার হতে রাজবন বিহারে স্থানান্তরিত হন। ১৯৭৫ ইং হতে ১৯৮১ ইং পর্যন্ত সাত বৎসর সময়কাল এড্‌হক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। এতে সভাপতি- ডাঃ হিমাংশু বিমল দেওয়ান এবং সম্পাদক বাবু বঙ্কিম চন্দ্র দেওয়ান দায়িত্ব পালন করেন। তখনকার সময়ে ১৯৮১ ইং সন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে "মহাস্থবির বরণ" একটি পাকা ভিক্ষুসীমা স্থাপন এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীলংকা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বোধিচারা রোপন। এতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ধর্মবিষয় মন্ত্রীসহ আরও দুজন প্রতিমন্ত্রী এবং শ্রীলংকা, বার্মা ও ভারতের রাষ্ট্রদূতগণও উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে বুদ্ধগয়া হতে বাবু প্রকৃতি রঞ্জন চাক্‌মা (তখন ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট) কর্তৃক আনিত বোধি চারাটি শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কর্তৃক রোপন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে যে স্থানে দেশনা ঘরটি দণ্ডায়মান তখন ঐ স্থানটিই সমতল করে ঘরটি তৈয়ার করা হয়। ঠিক তার উত্তর পার্শ্বে বর্তমানে যে স্থানে বড় বড় ইমারত বিহার গড়ে উঠেছে সেটি ছিল বড় উঁচু পাহাড় এবং বড় একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। বাবু নব কুমার তঞ্চংগ্যা, বাবু অদ্যুৎ কুমার চাক্‌মা, বাবু নির্মল কান্তি চাক্‌মা, বাবু প্রশান্ত দেওয়ান, বাবু পংকজ কুমার দেওয়ানসহ আমি নিজেই পাহাড়টি কাটার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সম্ভবত প্রথমাবস্থায় বাবু নির্মল কান্তি চাক্‌মা মাত্র ৫০০/- টাকা শ্রদ্ধা দান প্রদানের মধ্য দিয়েই কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে বাবু অদ্যুৎ কুমার

চাক্‌মার প্রচেষ্টায় খাদ্যের বিনিময়ে কাজের প্রকল্পাধীনে অনুদানের মাধ্যমেই সংস্কার কাজের সিংহভাগ অগ্রগতি সাধিত হয়। তখন পরিচালনা কমিটির অনেকেই এতে বাধা প্রদান করেছিলেন। হয়তো অর্থাভাবে কাজ শেষ করা সম্ভব নয় ভেবে বাধা প্রয়োগ করেছিলেন। মাঠ সংস্কারের শেষান্তে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমাদেরকে পর পর তিন বৎসর সীবলীপূজা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তখন থেকেই সীবলী পূজা অনুষ্ঠান চালু করা হয়। সেই পূণ্য কাজে স্বয়ং দেবগণও যে পূন্য অনুমোদন করে আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করতেন তাহা শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ঋদ্ধির প্রভাবে আমরা আকাশে উজ্জ্বল আলোর ছটা দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। তখন এক সন্ধ্যায় দেশনা ঘরের দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে কাঁঠালগাছের নীচে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেছিলেন তাঁর পরিনির্বানের প্রাক্কালে আমরা যদি প্রার্থনা করি তাহলে তিনি শয্যাসনে অবিকল অবয়বে পাঁচ বৎসর অধিষ্ঠান করে থাকতে পারবেন। যেমনটি থাইল্যাণ্ডে এক অরহৎ ভিক্ষুকে রাখা হয়েছে বলে জানা যায়।

এমনিভাবে পর পর তিন বৎসর সীবলী পূজা অনুষ্ঠান করার পর পরিচালনা কমিটির নিকট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তখনকার সময়ে থাইল্যান্ডের রাজগুরু শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দর্শনে রাজবন বিহারে এসেছিলেন। তাঁকে রাজবন বিহারে অবস্থান করার আমন্ত্রণ করা যাবে কিনা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট অনুমতি চাওয়া হলে তিনি অনুমতি প্রদান করেন নাই। যেহেতু ভালভাবে অবস্থানের জন্য কোন পাকা বিহার গড়ে উঠে নাই। তখন আমরা যাঁরা মাঠ কাটা এবং সীবলী পূজা অনুষ্ঠান সম্পাদনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলাম সবাই মিলে সীবলী পূজার উদ্বৃত্ত শ্রদ্ধাদান এবং ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাদানের দ্বারা বোধি বৃক্ষের দিকে যাওয়ার পথে ডান পার্শ্বের পাকা কুটিরটি তৈরী করি। এটিই রাজবন বিহারের প্রথম পাকা ভাবনা কুটির।

উল্লেখ্য যে, প্রাক্তন পরিচালনা কমিটির তত্ত্বাবধানে আপামর জনগণের শ্রদ্ধাদান দ্বারা যে দ্বিতল পাকা বিহার ভবনটি নির্মাণ করা হয় এতে মোজাইকের কাজের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়ার নিকটতম আত্মীয় শ্রদ্ধাবাণ দাতা বাবু সজল কান্তি বড়ুয়া। ১৯৮৬ ইং সনে তাঁর চারতলা বিশিষ্ট পাকা ভবনটির শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে আমন্ত্রণ জানালে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সদয় অনুমোদন প্রদান করায়

তিনি উক্ত পূণ্যকাজে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে মোজাইক সম্পাদনের সদিচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

১৯৮৮ ইং সনে আমি প্রথম রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করি। ইতিপূর্বে যাঁরা বিভিন্ন পূণ্যকাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টির মাধ্যমে ভিক্ষু সংঘের চতুর প্রত্যয়সহ উন্নয়ন কর্মকান্ডে হাত দিই। ব্যাপকভাবে বিদ্যুতায়নসহ জলসরবরাহের সুব্যবস্থা করি। জড়াজীর্ণ পর্ণ কুঠির গুলির আধাপাকাসহ পূনসংস্কার করে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলি। স্বধর্মের বহুল প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আপামর বৌদ্ধগণকে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পূণ্য কাজে সরাসরি অংশ গ্রহণের নিশ্চিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করি। ব্যক্তিগত এবং সমষ্ঠিগত উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ভাবনা কুটির গড়ে উঠে। পরিচালনা কমিটি তখন নিজ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কুঠির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। কঠিন চীবর দানোৎসবের সময় পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বাঁশ গাছ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে তাদেরকে সরাসরি পূণ্যকাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করি।

১৯৯১ ইং সনে তীব্র ঘূর্ণিঝড়েরর কারণে রাজবন বিহারে বড় বড় গাছ ভেঙ্গে গিয়ে বৈদ্যুতিক লাইনসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অনেক লোহার খুটি ভেঙ্গে যায়। প্রথমদিকে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীর দ্বারা মেরামত কাজ শুরু করা হলেও পরবর্তীতে আমাদেরকেই কায়িক শ্রম দিয়ে মেরামত কাজ সুসম্পন্ন করতে হয়। এতে আমার সাথে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে বাবু সুশোভন দেওয়ান (ববি), বাবু মৈত্রী প্রসাদ খীসা, বাবু প্রশান্ত কুমার দেওয়ান (টুকু), বাবু লগ্ন কুমার চাক্মা (কালিগড়) ও বাবু নবকুমার তঞ্চগ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয় ব্যাপক পানি সরবরাহ সম্প্রসারণ কাজেও তাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলতে গেলে টিউবওয়েল মেরামত কাজ, বৈদ্যুতিক জল সরবরাহের কাজ সবকিছুই পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ কায়িকশ্রম দিয়ে দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবে কাজ সমাধান করতেন।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে যে মাঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয় সেটিও ছিল একটি ঢালু পাহাড়। তার দক্ষিণ পার্শ্বে সামান্য একটি সমতল জায়গায় কাঁচা উনুনশালা ছিল। সেই মাঠটি কাটার প্রধানত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বাবু লগ্ন কুমার চাকমা (কালিগড়) বাবু মৈত্রী প্রসাদ খীসা এবং বাবু নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যা। সড়ক ও জনপথ বিভাগ বুলড্রেজার ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ করেছিল।

তখন পুরুষদের পাশাপাশি শ্রদ্ধাবান মহিলাদের পূণ্যকাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণেরও যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রয়াত মিসেস বাসন্তী দেওয়ানের উদ্যোগে উপাসনা বিহারের যাবতীয় মোজাইকের কাজ মহিলাদের শ্রদ্ধাদানের দ্বারা সম্পাদন করা হয়। স্বাধীনভাবে পূণ্যকাজে মহিলাদের অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতি বৎসর ২৫শে ডিসেম্বর তারিখ মহাসংঘদান অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের দিন নির্ধারণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনকল্পে পরিচালনা কমিটির সাহায্য সহযোগিতা করে মাত্র। এছাড়া বয়স্কা মহিলারা যাঁরা অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী তিথি সমূহে অষ্টশীল গ্রহণ করেন তাঁদের থাকার সুবিধার্থে একটি স্বতন্ত্র অষ্টশীল কুঠির কমিটির আর্থিক সহায়তায় তৈরী করা হয়। এতে রাঙ্গামাটি রিজিয়ন কর্তৃপক্ষ ও ঢেউ টিন দিয়ে পূণ্যকাজে অংশ গ্রহণ করে। এমনিভাবে বিহার ভিটার পশ্চিম পার্শ্বে বাবু প্রভাংশু বড়ুয়ার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাদানে একটি আধাপাকা ভাবনা কুঠির তৈরী করা হয় এতে কমিটির তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান করা হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্য নির্মিত পাকা চংক্রমন বিহারটি রাজমাতা রাণী আরতি রায় এবং বাবু ইন্দ্রনাথ চাক্‌মার উদ্যোগে সার্বজনীন শ্রদ্ধাদানের দ্বারা তৈরী করা হয়। তারই পার্শ্বে ঘাগড়া টেক্সটাইল মিলের বৌদ্ধ কর্মচারীগণের শ্রদ্ধাদানের দ্বারা একটি পাকা কুঠির তৈরী করা হয়। এটিও পরিচালনা কমিটির কর্তৃক নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্য দ্বিতলা বিশিষ্ট যে অত্যাধুনিক আবাস ভবনটি নির্মিত হয় সেটির প্রধান উদ্যোক্তা লাকী চাক্‌মা। এতে অনেকেই শ্রদ্ধাদান দিয়ে পূন্যাংশে গ্রহণ করেন। প্রথমে এ জায়গায় ছিল একটি মাটির কুটির। বাবু অজিত কুমার দেওয়ান এটি তৈরী করে দেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সুদীর্ঘ বহু বৎসর এ কুঠিরে অবস্থান করেন।

আমার সময়কালে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে অষ্ট ধাতুর বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ। প্রতিটি প্রায় ১০ (দশ) মণের উর্দ্ধে ওজনের তামা, পিতল, সোনা, রূপা ইত্যাদি গলিয়ে দু'টি বড় বড় বুদ্ধমূর্তি তৈয়ার করা হয়। এতে রাঙ্গামাটি কারিগড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ যন্ত্রপাতিসহ নির্মাণকারিগড় দিয়ে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন তা সত্যি কখনও ভুলবার নয়। এতে কমিটির সদস্যের মধ্যে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বাবু সুশোভন দেওয়ান (ববি) বাবু লগ্নকুমার চাক্মা (কালিগড়), বাবু মৈত্রী প্রসাদ খীসা, বাবু প্রশান্ত কুমার দেওয়ান, বাবু নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যা এবং আরও অনেকেই। প্রথমদিকে কারিগড় সংগ্রহসহ উদ্যোক্তা হিসেবে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাবু নিউ মং মহাজন, বাবু বঙ্কিম চন্দ্র দেওয়ান, বাবু হ্লাথোয়াইপ্রু কার্বারীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বুদ্ধমূর্তি দানোৎসর্গ ও জীবণ্যাস অনুষ্ঠানোপলক্ষ্যে ৮৪ হাজার প্রদীপ জ্বালানোর ঘটনাটি বহুলাংশে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ'অনুষ্ঠানে সুদূর ভারতে অবস্থানরত বৌদ্ধরাও প্রদীপ পাঠিয়ে পূণ্য কাজে অংশ নিয়েছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার পূণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটেছিল বলে মত প্রকাশ করা হয়। প্রাক্তন পরিচালনা কমিটির কর্তৃক যে উপাসনা বিহারটির নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় সেটি শেষ করার আগেই কমিটি পরিবর্তন হয়। তথাপি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নির্দেশে প্রাক্তন কমিটিকেই শেষ করতে হয়। উক্ত উপাসনা বিহারটি আমাদের সময়কালে অর্থাৎ ১২ই মার্চ ১৯৯২ ইং তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে দানোৎসর্গ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সদাশয় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম, এ, মান্নান, শ্রীলংকা ও নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতগণ, তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান, তিন পার্বত্য জেলার এম,পি ও রাজবনবিহারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ব্যারিষ্টার রাজা দেবাশীষ রায়, সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন।

এমনিভাবে তিথি সমূহের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের দানোৎসর্গের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধ জাতীসত্ত্বা সমূহের পূণ্যকাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে চারিত্রিক উন্নতি সাধনের প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়। এমনিভাবে ব্যাপকভাবে

শ্রদ্ধাদান সংগ্রহের মাধ্যমে বিবিধ উন্নয়নকাজও দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠে। বিভিন্ন সময়ে তখন দেশনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে শাখা বিহার প্রতিষ্ঠার কথা বল্তেন। আমরা তাই প্রথমেই শাখা কমিটি গড়ার চিন্তাভাবনা করি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুমতিক্রমে ৯/১/৯২ ইং সনে রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির সক্রিয় সহযোগিতায় বাঘাইছড়িতে প্রথম শাখা কমিটি বা উপ-কমিটি গঠিত হয়। তখন উক্ত উপ-কমিটির সভাপতি হিসেবে বাবু শৈলেন্দ্র বিকাশ চাক্‌মা এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বাবু বিনিময় চাক্‌মা দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এমনিভাবে জুড়াছড়ি, লংগদু, খাগড়াছড়ি, ফুরামোইন, কাঁটাছড়ি, বন্দুকভাঙ্গা ইত্যাদি এলাকাসমূহে শাখা বিহারসহ শাখা কমিটি গঠিত হয়। বর্তমানে অন্যত্রও শাখা বিহার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। এমনিভাবে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে শাখা বিহার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় বিহার হিসেবে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের সাথে যখন সরাসরি ব্যাপক জনগোষ্ঠির যোগসূত্র সৃষ্টি হতে থাকে তখনই আন্তর্জাতিকভাবে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এবং বনবিহারের পরিচিত তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে থাইল্যান্ড বাসীদের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তাঁরা রাজবন বিহারে একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সরাসরি তা অনুমোদন প্রদান করেন। ১৯৯৪ ইং সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে থাইল্যান্ড হতে পূণ্যার্থী ভিক্ষুর একটি দল বুদ্ধমূর্তিটিসহ রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ ও মিসেস থাথিলাঅং, ফ্রা জান্‌থাকো, ফ্রা জুয়াথং এবং ফ্রা জাক্কারো। রাজস্ব বিভাগের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রসহ বিদেশীদের রাঙ্গামাটি প্রবেশের অনুমোদনের ব্যাপারে বাবু কল্পরঞ্জন চাক্‌মা এম,পি এবং বাবু সাধন মানিক কার্বারী সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তাদের থাকা, খাওয়া এবং বুদ্ধমূর্তি ঢাকা হতে রাঙ্গামাটি আনার ব্যাপারে পরিবহনের ব্যবস্থা করে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির মহোদয় যে কৃপা করেছিলেন তা সত্যি ভুলবার নয়। সবকিছুর ব্যাপারে বাবু সুশোভন দেওয়ান (ববি) সবসময় আমার পাশে ছিলেন। আমরা দু'জনে পরামর্শক্রমে কাজ চালিয়ে যেতাম। তাঁকে বাদ দিয়ে কৃতকার্জ হওয়া মোটেও সম্ভব ছিল না। তাই তাঁকে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

এমনিভাবে আমার দায়িত্বের সময়কালে অর্থাৎ ১৯৮৮ ইং সন হতে ১৯৯৩ ইং সন এবং ১৯৯৪ ইং সনের কিছু সময়কাল পর্যন্ত পরিচালনা কমিটির সকল সদস্যসহ বয়জ্যেষ্ঠদের সৎপরামর্শের ফলশ্রুতিতে যেটুকু সফলতা অর্জন করেছি তা সকলের সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে। এতে আমার এককভাবে কোন কৃতিত্ব নেই। কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানসহ সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকায় উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এবং রাজবন বিহার নিয়ে পূর্নাঙ্গ ইতিহাস রচনাকালে উক্ত স্মরণিকাসমূহ যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। তবে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর সাধক জীবনের প্রথমদিকে প্রায় সুদীর্ঘ ১২ বৎসর যে স্থানে ধ্যান সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন সেই ধনপাতা নামটিমাত্র উল্লিখিত আছে। সাধক জায়গা পরিচিহ্নিত করে স্মৃতি মন্দির গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৬ ইং সনের অক্টোবর মাসে থানা শিক্ষা অফিসার বাবু ইন্দ্র লাল চাক্‌মার উদ্যোগে প্রকাশনীর কিছু শ্রদ্ধাবান সদস্যবৃন্দের সহযোগিতায় প্রজ্ঞা সাধনা এবং আপামর জনগণের অংশ গ্রহণের দ্বারা সেই জায়গাটি ক্রয় করে জায়গা সংস্কারপূর্বক স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিমন্দির এবং বিহার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। জায়গাটির নাম রাখা হয় "সাধনাবন" সেই সাধনাবন একদিন মহা তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হবে এতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রদ্ধাবান লেখক ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়ার অনুরোধে কিছু স্মৃতি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। এটি ইতিহাস প্রণয়নে পরিপূর্ণতা আন্‌তে সক্ষম নয় বলে আমার বিশ্বাস। জীবন ও জীবিকার তীব্র সংঘাতে বহু ঘটনাপ্রবাহ আমার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। তবে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উপদেশ মুছে যায়নি। ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আধুনিককাল পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্যে এসে যাতে আশীর্বাদ লাভে সক্ষম হই এই আমার প্রার্থনা।

'সকল প্রাণী সুখী হোক"

উপাসক-উপাসিকাদের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় বনভন্তে

সনৎ কুমার বড়ুয়া
সহকারী প্রধান শিক্ষক
রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়।

পরম আর্য্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সম্পর্কে কিছু লিখার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি তাঁর শিষ্যের ও শিষ্য হবার যোগ্যতাও অর্জন করিনি। আমি শুধু তাঁর সেবক-বৃন্দের তল্পিবাহক মাত্র। এই সুবাদে কদাচিৎ তাঁর পদ-প্রান্তে উপবেশন করার সুযোগ আমার হয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রায়ই আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কি বিষয়ের উপর শিক্ষা দিয়ে থাকেন? আমি তার উত্তরে বলি- তিনি চতুরার্য্য সত্য, আর্য্য অষ্টাংগিক মার্গ ও নির্বাণ সাক্ষাতের উপায় সমূহ শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমার এ উত্তর যথার্থ হয় কি-না, তার নিম্নের শ্লোকাবলী হতে বিজ্ঞ পাঠক মন্ডলী অবহিত হতে পারবেন বলে আমার ধারণা।

একদিন আমারই একান্ত আপনজন, আমার সর্ব বিষয়ে হিতকাঙ্খী শ্রদ্ধেয় ডাঃ অরবিন্দ বাবু আমাকে হঠাৎ বল্‌লেন উল্লেখিত বিষয়ের উপর আমাকে কিছু লিখতে হবে। আমি পড়ে গেলাম উভয় সংকটে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের পদপ্রন্তে বসারই সুযোগ পাই না, আমি কেমন করে এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সম্পর্কে লিখব? আবার সরাসরি তা প্রত্যাখ্যানও করলাম না। একদিন আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় বাবু শান্তিময় চাক্‌মা, বললেন আজ আমরা কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ভন্তের দর্শনে যাব, আপনি যাবেন কি? আমার মন-প্রাণ আনন্দে উচ্চাসিত হয়ে গেল। আমি সাথে সাথেই বললাম যাব। সাথে ছিলেন বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা, (চক্ক) বাবু সন্‌জয় বিকাশ চাক্‌মা, বাবু নির্মল কান্তি চাকমা, বাবু সাধন মানিক কার্ব্বরী আরো কয়েকজন। আমার উদ্দেশ্য কিন্তু আমরা লিখার কুঠিরে গিয়ে, তাঁর পদপ্রান্তে উপবেশন করলাম। একটু পরেই তিনি কোন ভূমিকা না রেখেই কয়েকটি শ্লোক বলতে লাগলেন এবং আরও বল্লেন ওগুলি লিখে নিতে। এর

জন্য তিনি অতি সযতনে রাখা কয়েক সীট সাদা কাগজও এগিয়ে দিলেন। আমাদের প্রধান শিক্ষক বাবু শান্তিময় চাক্‌মা অতি ক্ষিপ্র গতিতে এ সমস্ত শ্লোকাবলী লিখে নিলেন। পরে তা আমি সংগ্রহ করে আমার এ লেখার উপায় হিসাবে পাঠকদের জন্য সরাসরি উপস্থাপন করলাম।

সম্যক সম্বুদ্ধ যিনি জ্ঞানের ভান্ডার,
মুক্তির সঠিক পথ করিল প্রচার।
ঠিক যে প্রণালী যথা হইল বর্ণন,
আর্য্যগণ যে পথে করেছে গমন।
আর্য্য নীতি আচরণে স্থির যেবা রয়,
ইহকাল পরকাল তার শান্তি সুখের হয়।
স্মৃতি বিদর্শনে যিনি স্থির বীর্য হন,
সম্ভবে সপ্তম দিনে নির্বাণ দর্শন।
এইভাবে স্মৃতি জ্ঞানে রত যেই জন,
বিদর্শন জ্ঞান তার বাড়ে অনুক্ষণ।
দর্শন মননাদি রূপ আর নাম,
ক্ষণিক স্বভাব হয়, ব্যয় অবিরাম।
স্মৃতি বিদর্শনে সদা থাকে যেই জন,
নাম-রূপ ধ্বংস মাত্র করেন দর্শন।
ধন জন স্ত্রী পুত্রে আমিত্ব ধারণা,
ভ্রম দৃষ্টি সংশয়াদি কিছুই রবে না।
ষড়ায়তন জাত যত আরম্মন,
চিন্তা স্রোতে উপজিত যত ধনজন।
ভালোবাসা ক্রোধ দ্বেষ স্বার্থ পরায়ন,
ধন লিপ্সা মোহ ঈর্ষা যত সংযোজন।
স্মৃতি সাধনে সব হও অবগত,
বিদর্শনে ছিন্ন কর সংযোজন যত।
ভোগাসক্তি সংযোজন ছিন্ন যার হয়,
দুঃখ মুক্ত শান্ত তিনি জানিবে নিশ্চয়।
ধন জন মানে যেবা মোহ যুক্ত হয়,

ভবাৰ্ত্তন দুঃখ তার মুক্তি কভু নয়।
ধন জন স্ত্রী পুত্রে আনে অহংকার,
পরমার্থ সত্য চ্যুত বিজ্ঞপ্তি অসার।
পরমার্থ সত্য জ্ঞান হইলে অর্জন,
সংযোজন ছিন্ন হবে, হবে নির্বাণ দর্শন।

নিদর্শন জ্ঞান চক্ষু কর উন্মীলন,
রূপ স্কন্ধ দেখ ঘৃণ্য অশুভ লক্ষণ।
বেদনার অনুভূতি দুঃখ হাহাকার,
ক্ষণেতে ভোজ বাজি অনিত্য সংসার।
সংজ্ঞা চেতনা চিত্তের বিজ্ঞান,
বিদর্শনে তৃষ্ণা দৃষ্টি হবে অন্তর্ধাণ।
অশুভ লক্ষণ সবে দেখ বারংবার,
নিত্য নহে, শুধু দুঃখ সকলি অসার।
স্মৃতি ধ্যানে চারি সত্য করহ উদ্ধার,
দুঃখের স্বরূপ সত্য দেখ পুনবার।
দুঃখের মূল হেতু তৃষ্ণা সমুদয়,
হেতুর নিরোধ রুদ্ধ জাতি ভবোদয়।
দৃঢ় চিত্তে বিধিমত স্মৃতি বিদর্শনে,
তৃষ্ণা দৃষ্টি চ্যুতি হবে জ্ঞান বৃদ্ধি সনে।
ভাবনা প্রণালী ঠিক হইল বর্ণন,
শান্তির সন্ধান এই প্রজ্ঞার দর্শন।

জ্ঞানবান সুজনের জীবন সুফল,
জ্ঞান কর্ম হীনতায় জনম বিফল।
অসৎ এর সংগমে হবে শ্রদ্ধা অবনতি,
ইহকাল পরকাল অশেষ দুর্গতি।
ক্ষান্ত হও, পাপ কর্ম কর পরিত্যাগ,
বুদ্ধ ধর্ম সংঘের প্রতি রাখ অনুরাগ।

জগতের অনিত্যতা করিয়া স্মরণ,
পুন্যের সঞ্চয়ে দাও দিবানিশি মন।
আসল পন্ডিত সহ, অলুব্ধে মিত্রতা,
উত্তমে সহবাস করিবে সর্বদা।
দাও প্রভু জ্ঞান বল শক্তি অমরতা,
ত্যাগের বিমল বুদ্ধি দৃষ্টি অসারতা।
চিরঞ্জয়ী দেখে যাব জ্ঞানের প্রভাব,
মানব স্বভাব ফুটে মনের আকাশ।
মায়ার মোহিনী মন্ত্রে হয়ে বিমোহিত,
সংসার সাগরে ভাস জ্ঞান তিরোহিত।
অভিনব মুক্তি পথ সর্ব তৃষ্ণা জয়,
অহিংসা পরম ধর্ম বিশ্ব প্রেমময়।
পিতা পুত্র পরিজন কেহ না করে রক্ষণ,
নিজেই নিজের রক্ষ মৃত্যুঞ্জয়ী যে জন।

তাঁহার এই দেশনা হতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি যা দেশনা দেবেন তা হতে যিনি যেই উদ্দেশ্য নিয়ে দেশনা শুনতে যাবেন, তিনি তাঁর সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই জানতে পারবেন। তবে তাঁকে হতে হবে খুবই বিচক্ষণ। তাঁর দেশনার রহস্য উৎঘাটন করতে হলে বার বার তাঁর সান্নিধ্যে যেতে হবে। হাল্‌কা মন নিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে গেলে তাঁর দেশনার কোন রহস্যই উৎঘাটন করা যাবে না। শুধু বেড়ানোর সার হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের কত সৌভাগ্য, আমাদেরই জীবদ্দশায় এমন একজন আর্য্যপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি। যখন খুবই সস্তায় আমাদের বুদ্ধি, আমাদের বিবেক, আমাদের রুচি, আমাদের আত্মমর্য্যাদা বিকিয়ে দিচ্ছিলাম তখন তিনি উপস্থিত হলেন আমাদের এই অধঃপতন প্রতিরোধ করতে। নিজের শক্তির উপর আস্তা স্থাপন করে, নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সকল বিধিন্ন শক্তিকে এক স্থানে সংহত করে জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে বলিয়ান করে দুরুহ অথচ অসাধ্য নয় এমন সুবিপুল আয়োজন তিনি করে যাচ্ছেন।

সব্বে সত্ত্বা ভবন্ত সুখিতাত্ত্বা।।

কথা আর কাজে মিল থাকা উচিত

সুরেশ বড়ুয়া
সহকারী শিক্ষক
রাংগামাটি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

আমাদের সমাজে বা দেশে প্রায় দেখা যায় বিভিন্ন প্রকৃতির লোক। কেউ শুধু কথাই বলে কিন্তু কাজে বাস্তবায়িত করে না। কেউ কাজ করে কিন্তু কথায় ব্যক্ত করে না। কেউ কথাও বলে না কাজও করে না। আবার কিছু সংখ্যক লোকই দেখা যায় তারা কথাও বলে কাজেও বাস্তবায়িত করে। সুতরাং চতুর্থ ব্যক্তিরাই সঠিকরূপে চিহ্নিত হয়।

কথা আর কাজে মিল ও অমিলের মধ্যে রয়েছে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, নারী, বৃদ্ধ, চাষী, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, চিকিৎসক, ধর্মযাজক প্রভৃতি সর্ব শ্রেণীর লোক। কথা আর কাজে মিল না থাকায় ব্যক্তিগতভাবে, সমষ্টিগতভাবে সমাজে, দেশে ও ধর্মীয়ভাবে কত যে ক্ষতি হচ্ছে তা আপনাদের নিকট সংক্ষিপ্তাকারে মাত্র ৪টি বিবরণ দিচ্ছি।

একজন কিশোর তার প্রধান কাজ হল যথাযথভাবে লিখাপড়া করা। সময় মত খেলা ধূলা করা, ধর্মীয় শিক্ষা ও আচরণ করা এবং মা-বাবার নির্দেশ অনুযায়ী ছোট খাট কাজ করা। কিশোরদের মধ্যে কথা আর কাজে অমিলের উদাহরণ স্বরূপ যেমন বলা যেতে পারে। জনৈক মা তার ছেলেকে বলল-বাবা, তুমি বাজার হতে সামান্য জিনিষ নিয়ে এসে লিখাপড়া আরম্ভ কর। ছেলে বাজারে যেতে যেতে পথের ধারে তার সংগীদেরকে দেখে বাজারের কথা ভুলে খেলায় যোগদান করল। এদিকে কিশোরের মা রান্না করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে কিশোরদের মধ্যে কথা আর কাজে মিল না থাকায় অসন্তোষের কারণ হচ্ছে।

একজন যুবককে তার অভিভাবক অতি যত্নে ও বহু অর্থের বিনিময়ে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। যখন সে কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তখন সে তার লিখাপড়া বাদ দিয়ে যোগদান করে রাজনৈতিক সংগঠনে। পরিনামে তার জীবন হয় বিষময় ও বিভিন্ন দুঃখের কারণ।

একজন রাজনীতিবিদ তার কথায় যেন জনগণের একদিকে অকৃত্রিম বন্ধু অন্যদিকে সকল সুযোগ সুবিধার ধারক বাহক। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তার বিপরীতে। এরকম কতিপয় রাজনীতিবিদরা সমাজে ও দেশে জনগণের মধ্যে বিভিন্ন অশান্তির সৃষ্টি করে চলছে।

পরিশেষে ধর্মযাজকদের কথা আর কাজ সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি সংক্ষেপে অবগত করছি। একজন লোক প্রব্রজ্যা নেয়ার পূর্বে তার গুরু নির্বাচন করে। সে গুরুই হবে মুক্তির পথ প্রদর্শক। প্রব্রজ্যা প্রার্থনায় বলা হয় "সব্ব দুকখা নিস্‌সরনেন নিববানং সচচ করনথায়..... অর্থাৎ সর্ব দুঃখ বিনাশ করে নির্বান সাক্ষাৎ করার জন্যে অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে প্রব্রজ্যা ধর্ম প্রদান করুন।" প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে হয়। এদিকে উক্ত ব্যক্তিরা কথা আর কাজে মিল না রেখে কেউ স্কুল কলেজে লিখাপড়া করে, কেউ চাকুরী করে, কেউ টাকা পয়সা সংগ্রহ করে সমাজের কাজে ব্যস্ত থাকে, কেউ রাজনীতি করে এবং কেউ অনার্থ আশ্রম করার কাজে ঝুঁকি পড়ে। বর্তমানে এ সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ কোনদিন বলেননি। বরঞ্চ এগুলি গৃহীদের কাজ। কতিপয় ভিক্ষু শ্রমনরা রংবস্ত্র ধারণ করে ধর্মের নামে অধর্মের সৃষ্টি করছে। এগুলি হল কথা আর কাজে মিল না থাকার কারণ।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা সম্বন্ধে বলছি। তিনি প্রায় দেশনার বলে থাকেন-কথা আর কাজ যথাযথভাবে সঠিক না হলে নির্বাণ লাভ কখনো হবে না। যেমন জনৈক ব্যক্তি ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা দিল। যদি উক্ত ব্যক্তি ঘাগড়ায় গাড়ী হতে নেমে যায় তার ঢাকা যাওয়া হবে না। ঠিক সেরকম কথা আর কাজে সঠিক হলে যে কোন উদ্দেশ্য সফল হয়। আমাদের বাংলাদেশ অপ্রতিরূপদেশ বলে ধর্মের ক্ষেত্রেও ভিক্ষু শ্রমনদের মধ্যে নানাবিধ বিশৃংখলা ও অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন-প্রত্যেক গোয়ালারা দুধে পানি মিশ্রিত করে না। সে রকম আমার ধর্মেও ভেজাল দেইনা। ইহার অর্থ হল কথা আর কাজে মিল রেখে চলি। কথা আর কাজে যথাযথভাবে মিল রাখলে কোন দোষ থাকে না। শান্তি স্থাপন হয়, কোন প্রকার দুঃখ থাকে না, সুশৃংখল হয় এবং চিত্তে অনাবিল পরম সুখ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করা যায়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কি ঋদ্ধিমান ও লাভীশ্রেষ্ঠ ?

বিমলেন্দু বিকাশ খীসা
কালিন্দীপুর, রাংগামাটি।

বর্তমান যুগে আর্য্যপুদ্গাল মহামানব শ্রদ্ধেয় বনভন্তে (সাধনানন্দ মহাস্থবির) একজন অনন্য মহাপুরুষ। সুদীর্ঘ দিন নির্জন বন-জঙ্গলে সাধনা করে তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞানের মহিমায় আজ এক তেজোদীপ্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত নিজ গরিমায় ভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁর জ্ঞান গরিমার কথা কার অজানা? নাবালক থেকে অশীতিপরায়ন বৃদ্ধ পর্য্যন্ত যাঁর নামএবং পদধূলিতে নিজকে ধন্য মনে করেন সেই মহামানবকে কৃতাঞ্জলিপুতে বন্দনা এবং এক নজর দেখে নয়ন সার্থক করার জন্য হাজার হাজার পূণ্যার্থীর আগমনে রাংগামাটি রাজ-বন-বিহার হয়ে উঠে লোকারণ্য ও গণরবে মুখরিত।

এই মহামানব শ্রদ্ধেয় ভন্তে ১৯৭৫ ইং সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত তিনটিলা বন বিহারে স্বশিষ্যে অবস্থান করতেন। রাংগামাটির ধর্মপ্রাণ উপাসক, উপাসিকা এবং রাজমাতা আরতি রায়-এর আকুল প্রার্থনায় তদানিন্তন রাজ বিহারে কঠিন চীবর দানোপলক্ষে ১৯৭৪ ইং সনে নভেম্বর মাসে তিনি রাংগামাটিতে আগমন করেন। ভন্তের আগমণ উপলক্ষে রাজবাড়ীর পশ্চিমে স্থিত জলবেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমন্ডিত বনকুঞ্জে সাধারণভাবে এক কুঠি নির্মাণ করে দেয়া হয়। কঠিন চীবর দান পর্ব শেষ হওয়ার প্রাক্কালে রাজমাতাসহ রাংগামাটি সধর্মপ্রাণ আবাল বৃদ্ধ বর্নিতার সনির্বন্দ প্রার্থনায় শ্রদ্ধেয় ভন্তে রাংগামাটিতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সেই আমন্ত্রনের প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ ইং সনে নভেম্বর মাসে স্বশিষ্যে রাংগামাটিতে আগমন করেন এবং বনকুঞ্জে অবস্থান করতে থাকেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের রাংগামাটিতে অবস্থানকে দৃঢ় করার প্রত্যয়ে দানশীলা রাজমাতা আরতি রায়-এর অবদান অনস্বীকার্য্য। তাঁর দানশীলতার গুণে তিনি রাজ-সম্পত্তি থেকে ১৫.০০ একরের অধিক-ভূমিদান করে বর্তমান রাজ-বন-বিহার প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারপর থেকে

শুরু হয় শ্রদ্ধেয় ভন্তে তথা ভিক্ষু সংঘের আবাসের জন্য বিহার, মন্দির, আবাস কুঠি নির্মাণের কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভন্তের স্থায়ীভাবে অবস্থানের ফলশ্রুতিতে আজ হাজার হাজার পূণ্যার্থী দেশ-বিদেশ থেকে এসে শ্রদ্ধেয় ভন্তের দর্শন লাভ করে অমৃতময় ধর্মদেশনা শ্রবণ করে উৎকণ্ঠিত চিত্তে শান্তির অমিয় বারিধারা লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। রাংগামাটি আজ বৌদ্ধদের পরম পূণ্য তীর্থে পরিণত হয়েছে। ধন্য রাজমাতা আরতি রায়, তুমি ধন্য। হাজার হাজার মানুষ কৃতাঞ্জলিপূতে তোমাকে জানায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এই নৈর্বানিক মহাপুরুষের এক অপূর্ব কাহিনীর অতি ক্ষুদ্র অংশ রেখাপাত করা যাক। ১৯৯৬ ইং সালের কথা। তখন শ্রদ্ধেয় ভন্তে স্বশিষ্যে রাংগামাটি রাজ-বন-বিহারে অবস্থান করতেছেন। সে সময় তিনি ধর্মদেশনা প্রসংগে প্রায়ই আমাদিগকে বলতেন "দেখ্‌ব তোমরা রাংগামাটি বাসীরা কত বড় ধার্মিক" মাঘ মাসের শীতের রাতে তোমাদের ঘরে ঘরে ১৫/২০ জন করে অতিথি পাঠাবো এবং তোমাদের ধর্মীয় চেতনা পরীক্ষা করবো। অনুরূপ একটি ঘটনা আমাকে দিয়ে শ্রদ্ধেয় ভন্তে পরীক্ষা করেছেন। ১৯৭৬ ইং সালের জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী মাস হবে। দিন তারিখ আমার স্পষ্ট মনে নেই। সুদূর দিল্লী থেকে ১৪/১৫ জন লোক ভন্তের দর্শনের জন্য আসেন। আমিও প্রাত্যহিক নিয়মমত সকাল বেলায় বন বিহারে যাই। ঐ দিন ধর্মদেশনা দিতে দিতে ১১.৩০/১২.০০ টা বেজে যায়। এমন সময় শ্রদ্ধেয় ভন্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছেন এই অতিথি উপাসক/উপাসিকারা কোথায় ভাত খাবে রাংগামাটির বাসিন্দা আমি ছাড়া অন্য কেহই ছিলেন না। আমি ধরে নিলাম শ্রদ্ধেয় ভন্তে অতিথিগণকে আমার বাড়ীতে নেওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে বলতেছেন। আমি ভন্তেকে বললাম ভন্তে অতিথিরা সকলেই আমার সাথে যাবে এবং আমার বাড়ীতে দুপুরের আহার করবে। ১৯৭৬ ইং সাল, তখন দেশে আকাল চলতেছে। চাউলের সের ১০/১১ টাকা। তখনকার ১১.০০ টাকা বর্তমান ৫০/৬০ টাকারও বেশী। আমি জানি যে- আমার বাড়ীতে অতিথি আপ্যায়নের মত চাউল নেই। আমার পকেটেও এমন কোন টাকা ছিল না যে চাউল কিনতে পারি। যা হোক মাত্র ১০.০০

টাকা সম্বল নিয়ে একজন লোক দিয়ে বাড়ীতে খবর পাঠালাম যে দিল্লী থেকে আসা ১৪/১৫ জন অতিথি দুপুর বেলায় আহার করবে। কাজেই "তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো"। ৫.০০ টাকায় কিছু ডাল এবং অবশিষ্ট টাকায় কিছু কাঁচা তরিতরকারী কিনে নিয়ে দিতে বললাম। অতিথি আগমনের খবর শুনে আমার স্ত্রী কনকলতার একেবারে চক্ষুস্থির। কারণ বাড়ীতে এক মুঠো চাউল নেই অথচ ১৪/১৫ জন অতিথির খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শেষে অনেক কষ্ট করে এক প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে ১$\frac{১}{৪}$ সের চাউল সংগ্রহ করে ভাত রান্না করলেন। এদিকে আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে বন্দনা করে অতিথিদেরকে নিয়ে আমার বাড়ীতে আসলাম এবং এসে বিস্তারিত বিষয় শুনলাম। উপায়ান্তর না দেখে শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে বার বার স্মরণ রেখে অতিথিগণের আহারের ব্যবস্থা করা হলো। আশ্চার্য্যের বিষয়-এই ১$\frac{১}{৪}$ সের চাউলের ভাত এবং আমাদের পরিবারের জন্য ইতিপূর্বে রান্না করা এক সের পরিমান চাউলের ভাত দ্বারা ১৪/১৫ জন অতিথিসহ আমরা ২১ জন লোকে তৃপ্তির সহিত দুপুরের আহার করে দেখা গেল আরো বহু ভাত অবশিষ্ট রয়েছে এবং যে ভাত অবশিষ্ট রয়েছে তদ্বারা আরো অন্ততঃ ২ জন লোকে খেতে পারতো। ইহা সম্পূর্ন শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের আশির্বাদে সম্ভবপর হয়েছে। সত্যিই শ্রদ্ধেয় ভন্তে লাভী শ্রেষ্ঠ এবং ঋদ্ধিমান আর্য্যপুদ্গল।।

সুবলং জুরাছড়ি শাখা বনবিহারে ১৯৯৫ সালের কঠিন চীবর দানের দেশনা

সংকলনে ঃ প্রচারক চাক্‌মা
জুরাছড়ি

১৬ই অক্টোবর, রোজ শনিবার, বিহারের দক্ষিণদিকের বড় মাঠটায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রায় সাড়ে তিনটায়। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন বাবু জগৎ জ্যোতি চাক্‌মা। তাকে সহযোগিতা

করে বাবু সুনীল কার্বারী। শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করেন বাবু হিরন বিজয় চাক্‌মা। বিশেষ প্রার্থনা করেন বাবু প্রবর্তক চাক্‌মা। পঞ্চশীল প্রার্থনা করি আমি নিজে। স্বাগত ভাষণ করেন কমিটির সুযোগ্য সভাপতি বাবু ধলকুমার চাক্‌মা। ভিক্ষুদের মধ্যে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভদ্দজী স্থবির। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রথমেই বলেন, জ্ঞান সত্য নিয়ে থাকলে সুখ আর অজ্ঞানতা ও মিথ্যা নিয়ে থাকলে দুঃখ। বর্তমান লোকদের জ্ঞান, সত্য নেই বলে যত হীনকাজ অজ্ঞানীর কাজগুলোই করছে আর তাই এত সহ্য সীমার অতীত দুঃখ কষ্টগুলোই পাচ্ছে। যারা জ্ঞানী তারা কোনদিন হীনকাজ, অজ্ঞানীর কাজ করতে পারে না। বর্তমানে চাক্‌মাদের মহাদুর্যোদের দিন। এভাবে চলতে থাকলে চাক্‌মা জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাবে । চাক্‌মারা পূন্যকাজ, ভালকাজগুলো করতে পারে না। চাক্‌মারা কি পারে জান? চাক্‌মারা মদ খেয়ে মাতলামী করতে পারে, টাকা দুটো হাতে পড়লেই জুয়া খেলতে পারে। আর কি পারে? আর পারে অঘটন ঘটাতে, লুকিয়ে থাকতে আর পালাতে পারে। আর কি পারে বলো? "আমি দোজেই জানি, পল্লেই জানি, আধেই যেই জানি এইমাত্র পারিদে"। তারপর আবার বললেন, আমাকে অনেক চাক্‌মা বলে, "ভন্তে আপনিতো বলেন, যে জাতিতে আর্য মহাপুরুষ থাকে সে জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। আপনি থাকতে আমরা কেন ধ্বংস হবো"। কথাটা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু তোমরাতো আমার কথা শুন্‌ছোনা। পালন করছোনা। একটা উদাহরণ দিই, মনে করো একজন পেট পীড়ার রোগী পেট ব্যথায় ছট্‌ফট করছে। বিলেত ফেরত ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দিলো-এই এই ঔষধ, এই মাত্রায় খেলে পুরাপুরি ভাল হয়ে যাবে। রোগীটা তাঁর কথাবিশ্বাস না করে ঔষধগুলো ফেলে রাখলো। আচ্ছা বলোতো এরোগী ভাল হবে কি? না ভাল হবে না। আর রোগী যদি ঔষধ না খায় তবে এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের করার কি আছে? তোমরাও যদি বনভন্তের কথাকে, বুদ্ধকে, ধর্মকে, কর্মকে, ইহকাল পরকালকে বিশ্বাস না কর এবং সে অনুসারে আচরণ না কর তবে এক্ষেত্রে বনভন্তের ও করার কি আছে? শোন এক ঘটনার কথা বলি, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থাইল্যান্ডে খবর এলো, শত্রুর বিরাট বাহিনী আক্রমন করতে আসছে থাইল্যান্ডে। এতে থাইল্যান্ডের জনগণের মাঝে বিরাট ভয় ঢুকে গেলো। চারিদিকে হাহাকার

পড়ে গেলো-" এখনি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো, এখনি আমরা মারা পড়বো"। এমনি দুর্দশা দেখে সেখানকার চন্দ্রাবতী নামে এক মেয়ে অরহত অধিষ্ঠান করলো" আমি থাক্‌তে এ জাতিকে ধ্বংস হ্‌তে দেবো না"। তারপর তিনি সমস্ত থাইবাসীকে আহবান জানালেন। এসো ভয় পেয়ো না। যদি তোমরা আমার কথা শোন তবে শত্রু যতই ভয়ংকর শক্তিশালী হোক কিছুই করতে পারবে না। থাইবাসী তার কথায় বিশ্বাস করে সেই অনুসারে আচরণ করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত অরহত চন্দ্রাবতীর অনুভাব বলে থাইবাসী নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেলো। তোমরাও আমার কথা শোন, ভগবান তোমাদের রক্ষা করবেন। মনে রেখো ধর্মচারীকে ধর্মই রক্ষা করে। এই কথায় উপাসক উপাসকিদের মধ্য থেকে মুহু মুহু সাধুবাদ পড়লে ভন্তে আবার বললেন, তাহলে বলো" আজ থেকে আমরা ধর্মানুসারে চলবো। উচ্চমনা, উচ্চাকাংখী হয়ে শীলবান প্রজ্ঞাবান, ধার্মিক হবো"। আর আজ থেকে জানাজানি করে দাও বনভন্তে বলতেছেন চাক্‌মা জাতিকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করতে হলে ৫টি নিয়ম মেনে চলতে হবে। (১) ক্ষান্তি, মৈত্রী, যাহারা বলেন তাহাদের নিকট ধর্ম শ্রবন করতে হবে। (২) বুদ্ধের শাসনকে গভীরভাবে মেনে চলতে এবং বিশ্বাস করতে হবে। (৩) তৃষ্ণা ক্ষয় বা ধ্বংস করবো এই মনোভাব বা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। (৪) দুঃখ মুক্তি নির্বান প্রত্যক্ষ করবো এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে। (৫) জীবন উন্নতির প্রধান সহায় হিসাবে উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকতে হবে।

তারপর তিনি নিজের মুখে আংগুল দিয়ে সিংহনাদে বললেন-বনভন্তে এই মুখে যা বলে তাই সত্য হয়। আর আমি আমার বিরুদ্ধবাদীদের ১০ নম্বর মহাহুশিয়ারী সংকেত দিচ্ছি। কোন কিছু হলে তখন আমাকে দোষ দেবে। তোমরা বনভন্তকে না মানলে না মানো, বিশ্বাস না করলে না কারো ক্ষতি নেই, কিন্তু অযথা গালিগালাজ করিও না, এক্ষেত্রে একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলে তৎক্ষণাৎ মুখে রক্তবমি করে, মলদ্বার দিয়ে রক্ত গিয়ে মারা পড়বে। কোন ডাক্তারের সাধ্য নেই ভাল করতে। বনভন্তের কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নাই। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়েও তার অস্ত্র ভয়ংকর।

স্যারেন্ডার করা শান্তি বাহিনী পিয়রের কথা জানো? সেই পিয়রের স্ত্রী আমাকে সিয়ং এনে দিচ্ছে। স্ত্রীকে বলে" কোথায় যাচ্ছো? সেই ভন্ড আলসকে সিয়ং না দিয়ে বরং আমাকেই দাও বলে টিফিন ক্যারিয়ার স্ত্রী থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেই খেতে লাগলো। সেই পিয়র দিন যেতে না যেতেই গুরুম শব্দের গুলিতে শেষ। শান্তিময় দেওয়ান নিজেকে বড় মনে করেছে, বনভন্তেকে বন্দনা করেনি, ১৩দিন যেতে না যেতেই শান্তিময় দেওয়ানও শেষ। বুদ্ধ রক্ষিত (ভিক্ষু) ছেলে মানুষ না বুঝে আমাকে নানা কটাক্ষ কথা বলেছে। হসপিতালে নিয়ে যেতে না যেতেই মুখে রক্ত বমিকরে করে মারা গেছে। বালুখালীতে এক শান্তিবাহিনী কলেক্টর আমাকে নাকি বলেছে "বনভন্তে আমার কাছে কেন সারেণ্ডার করে না"। বলার সাথে সাথেই আর্মির কাছে ধরা পড়েছে। এরকম আরও অনেক ভুড়ি ভুড়ি প্রমাণ আছে। তারপর তিনি আবার বললেন- খুর দেখেছো? খুর (নকরুন) দিয়ে নখ, চুল, দাড়ি কাটান যায়। কিন্তু ধারালো ক্ষুর দিয়ে কণ্ঠনালিতে ঘষলে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। বনভন্তেও ক্ষুর সদৃশ। ক্ষুর ব্যবহারকারী তার ব্যবহারের দোষেই যেমন নিজের কণ্ঠনালী ছেদ করছে ঠিক তেমনি বনভন্তকেও যারা নানা কথা বলে তারাও নিজেদের দোষেই মরে। যাহোক তোমরা শীলবান, ধার্মিক হও। তোমরা যাই চাচ্ছো তাই পাবে। তোমাদের সুখ হউক, মংগল হউক, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সাধু- সাধু- সাধু

তৃতীয় অধ্যায়

কবিতায় বনভন্তের দেশনা ও বৌদ্ধ কবিতা গুচ্ছ

১৯৭৭ ইংরেজী হতে ১৯৮৮ ইংরেজী পর্যন্ত আমি আমার মনের সখে কবিতা লিখার অভ্যাস করতাম। তাতে উৎসাহ দিতেন পরলোকগত বাবু জ্যোতির্ময় চাক্‌মা (অবঃ ম্যাজিষ্ট্রেট) ও রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক বাবু নন্দলাল শর্মা। পরবর্তীতে প্রয়াত বৌদ্ধ পন্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জিন বংশ মহাথের ও কবিরত্ন প্রয়াত শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী মহাথের মহোদয়ের উপদেশে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা কবিতায়, ছন্দে ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কবিতা লিখার চর্চা করি। কবিতাগুলি চতুর্দশপদী মিশ্রপদী, পয়ার ও ছড়ার ছন্দে অন্তর্ভূক্ত। নিম্নে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মুখ নিঃসৃত অভিজ্ঞাপূর্ণ বাণী বা 'কবিতায় বনভন্তের দেশনা' হতে মাত্র ১৭টি কবিতা এবং 'বৌদ্ধ কবিতা গুচ্ছ' হতে মাত্র ১৫টি কবিতা পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃতি দেয়া হল। যদি কেউ উক্ত কবিতাগুলি পাঠ করে উপকৃত হন তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

বনভন্তের লক্ষ্য

প্রথমে স্মরণ করি ত্রিলোকের গুরু।
বনভন্তের লক্ষ্য লিখিতেই শুরু।।
শাক্যপুত্র সিদ্ধার্থ চারিদৃশ্য দেখিয়া।
সন্ন্যাসী হইলেন গৃহত্যাগ করিয়া।।
সম্বুদ্ধ হইয়া তিনি বিলাইলেন সুধা।
মিটাইলেন নরদেবে ভবজ্বালা ক্ষুধা।।
এইরূপে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া।
ধরাধামে প্রচারিলেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
বনভন্তে গৃহ ত্যাগীলেন কি দৃশ্য দেখিয়া?

সংক্ষেপে বলিব আজি শোন মন দিয়া।।
ছোট বেলায় ধর্মমতি ছিলেন অতিশয়।
ভবিষ্যতে মহৎলোক হইবেন নিশ্চয়।।
একদা গ্রামেতে কুমারীর মৃত্যু হইল।
দলে দলে আসে লোক মৃতেরে দেখিল।।
একমাত্র ছিল কন্যা বাড়ীর সন্তান।
পিতা মাতা কাঁদে সদা হইয়া অজ্ঞান।।
পিতা মাতা বেহুস হয় বারে বার।
পাড়া পড়শি ঢালে পানি মাথার উপর।।
এই দৃশ্য দেখি তিনি হতবাক হইয়া।
গৃহ ত্যাগ করিলেন সন্ন্যাসী হইয়া।।
গৃহবাস কন্টকপূর্ণ দুঃখের জন্যে।
সন্ন্যাস জীবন যেন পক্ষী উড়ে শূন্যে।।
সংসারের অনিত্য দুঃখ অনাত্ম বুঝিয়া।
ধ্যানে বসিলেন গভীর জঙ্গলে গিয়া।।

নির্বানের অভিযান

থাকব নাক অবিদ্যাতে,
ছুট্‌ব এবার নির্বানেতে।
আসুক মৃত্যু আসুক ভয়,
তবু কিন্তু পিছু নয়।
ভয় কর না কিছুতে,
ভয় কর শুধু পাপেতে।
পড় যদি তৃষ্ণা স্রোতে,
উঠ কিন্তু নির্বান পেতে।
যদি থাক সুখেতে,
ডুবে যেয়োনা আনন্দেতে।

যদি পড় দুঃখেতে,
জ্বলিও না হুতাসেতে।
পড় যদি নিন্দাতে,
টল না কোন তাতে।
যদি পড় প্রশংসাতে,
স্ফীত হয়োনা উহাতে।
যদি থাক যশেতে,
উড়ো নাক আকাশেতে।
পড় যদি অযশেতে,
পড় না তো পাতালেতে।
যদি থাক লাভেতে,
পড় নাক লোভেতে।
যদি পড় অলাভেতে,
কেঁদো নাক উহাতে।
থাক যদি মধ্য পথে,
পৌঁছবে তবে নির্বাণেতে।
চল যদি ভন্তের নির্দেশ পথ,
থাকবে সাপছড়ির পাহাড় মত।

স্বাধীন

নর আর নারী আছে মাত্র দুই জাতি।
সারা বিশ্বময় জুড়ে আছে বসতি।।
কেহ থাকে পাহাড়ে কেহ সমতলে।
কেহ থাকে হিম দেশে কেহ মরুস্থলে।।
ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আর বিভিন্ন প্রকৃতি।
সাদা কালো লম্বা খাটো বিভিন্ন আকৃতি।।
ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন মতি।

ভিন্ন ভিন্ন কর্মের ভিন্ন ভিন্ন গতি।
কেহ চায় রাজতন্ত্র কেহ গণতন্ত্র।
কেহ গড়ে তুলে আধুনিক সমাজতন্ত্র।।
সবার উদ্দেশ্য এক পরা ও খাওয়া।
সংসারের নীতি শুধু আসা যাওয়া।।
কেহ কারো মুনিব কেহ কারো দাস।
মানবের ইহা ধর্ম সদা করে আশ।।
কেহ অন্যেরে মারে লোভের তাড়নায়।
সর্বজীবে থাকে কেহ মৈত্রী ভাবনায়।।
কেহ বলে থাকা খাওয়া অভাবে অধীন।
কাহারো অধীনে না থাকিলে হয় স্বাধীন।।
বাঁধা বিপত্তি না থাকিলে হয় স্বাধীনতা।
প্রতিরূপ দেশে হয় প্রকৃত স্বাধীনতা।।
স্বাধীন কেহ নহে বনভন্তের মতে।
সব কিছুর অধীন হয় শুধু জন্ম হতে।।
এই দেশ ভাল নয় অন্য দেশে যাব।
সেই খানেতে পরম সুখ সমৃদ্ধি পাব।।
বুদ্ধের সময়ে একদা বলেন আনন্দ।
এই দেশ ভাল নয় সর্বদা নিরানন্দ।।
উত্তরে বলেন বুদ্ধ যদি দিই আদেশ।
সেই খানেতে সেরূপ যাইবে কোন দেশ?
স্বাধীন স্বাধীন বল কারে স্বাধীন কেহ নয়।
নির্বাণেতে না পৌছিলে ধর্মে কর্মের অধীন হয়।।
মুক্ত পক্ষীর মত স্বাধীনতা ত্যাগীর।
খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর মত ভোগীর।।
আত্ম দমন শ্রেষ্ঠ দমন আপনারে।
নিজে আচরিয়ে অপরে শিখাতে পারে।।
দমিত ব্যক্তি হন মহা বলিয়ান।
নির্বাণের দিকে সদা করেন আগুয়ান।।

শান্ত চিত্তে সুখ পায় নির্বাণ সমুদ্র তটে।
নির্বাণ রস সব রস জয় করে অকপটে।।
এই রূপে স্বাধীন হও কর অপরে।
মুক্ত ব্যক্তি পরকে মুক্ত করতে পারে।।
ত্যাগ দমন দমিত চিত্তের সমতা।
বিদর্শনে রমিত প্রকৃত স্বাধীনতা।।

মান

পৃথিবীর মধ্যে আছে এক দেহ অরি।
তাহার কারণে সত্ত্ব যত ঘুরাঘুরি।।
কর্মে উপার্জিত আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল।
অবুঝ লোকে করে মানের কোলাহল।।
সুঠাম দেহ আর বর্ণ সমুজ্জ্বল।
তাহার সমান নাই এ ধরণীতল।।
পূর্ব জন্মের উপার্জিত পরম সুখ।
এই জন্মে বুঝে না কি রকম দুঃখ।।
ধন বল জনবল আরো গায়ের জোর।
মনে করে তাহার সমান জুড়ি নাই মোর।।
আমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ বলে সবার উদ্দেশ্য।
আমি আছি সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠের সদৃশ্য।।
আমি শ্রেষ্ঠ হতে হীনতর মনে করি।
আমি সদৃশ হতে শ্রেষ্ঠ তুলিব গড়ি।।
আমি সদৃশের সদৃশ বলে জনগণে।
আমি সদৃশ অপেক্ষা হীন বলে মনে মনে।।
আমি অধর্মের হীন আছি করে মান।
আমি সবার মধ্যে অধর্মের সমান।।
আমি অধম অপেক্ষা অধম ছোট জানে।

সবাই জড়িত আছে নয় রকম মানে।।
আমি নামে কিছু নাই মানের আকর।
আয়ু শেষে হয় শুধু যমের চাকর।।
আমার নামেতে হয় তৃষ্ণার বশ।
তাহাতে ডুবিয়া মরে মানবের যশ।।
আত্মা নামে কিছু নাই ত্রিভব মায়ার।
আকাশ আর নির্বাণ আছে মাত্র সার।।
ঘুমন্ত মানব আজ হউন চেতনা।
গ্রহণ করুন বনভন্তের দেশনা।।

বনভন্তের নির্দেশ

ত্রিলোকের মধ্যে ধারণ করিলে দেহ।
পঞ্চমার হতে পরিত্রাণ পায় না কেহ।।
দেহ ধারণে যত কষ্ট কেহ জানিত।
নির্বাণের পথিক হইয়া সে যাইত।।
নিত্য দেহ পরিবর্তন কালের গতিতে।
অনিত্য দেহ হয় নশ্বর পৃথিবীতে।।
জন্মিলে মরিতে হয় সংসারের রীতি।
সর্বদাই ক্ষয় শীলতা দেহের নীতি।।
অনিত্য দেহ লইয়া নিত্য দুঃখ পায়।
অষ্ট সংবেগ স্মরণ করুন সর্বদায়।।
অক্টোপাসে ধরে যেন সমুদ্রের তলে।
নানাবিধ দুঃখ ধরে জন্ম হলে।।
দেহ হল সবার তৈরী এই অবণীতে।
জন্ম না হলে কি করিবে এই মহীতে ?
দেহ যদি দুঃখ হয় তাহা অনাত্ম।
পাগলের উক্তি যেমন সব অনর্থ।।

নিঃসার দেহ লইয়া ঘুরি ভবে ভবে।
প্রতীক্ষায় আছি সদা সার পাব কবে।।
অসূচী পদার্থ বহে নব দ্বার দিয়া।
বত্রিশ প্রকার অসূচী লিপ্ত হইয়া।।
দোষ পূর্ণ দেহ কোন কালে মুক্ত নয়।
অসূচী দেহের বহু দোষ পূর্ণ হয়।।
দেহই এক মাত্র মুক্তির বিঘ্নকারী।
তাহার নিরোধে হয় নির্বাণের অধিকারী।।
দেহ আছে বলিয়া বার বার দুঃখ পায়।
মুক্তিকামী রত থাকুন অসূচী ভাবনায়।।
দুঃখের আঁধার দেহ জ্ঞানীজনে জানিয়া।
নির্বাণে গমন করেন দেহ ত্যাগ করিয়া।
বিষ্টা পিত্ত তুল্য দেহ জানেন সাধু জনে।
অংকুরে নিক্ষেপ করে চলে যান নির্বাণে।।
চল সবে পরম নির্বাণের উদ্দেশ।
গ্রহণ করুন বনভন্তের নির্দেশ।।

বনভন্তের উপদেশ

ত্যাগ কর ত্যাগ কর ত্যাগে মহা সুখ
পঞ্চ কাম ভোগী গনে পায় মহা দুঃখ।
পঞ্চ ইন্দ্রিয় দমন কর সর্ব প্রথমে।
দমিত হও কায় বাক্য মন সংযমে।।
পাপেতে লজ্জা কর আরও হীন কাজে।
দুঃখ পূর্ণ স্থান দেখ ত্রিলোকের মাঝে।।
নিজ দেহ তুল্য সম্পদ নাই জগতে।
তাহার মত দয়া কর সর্ব জীবেতে।।
শত্রু মিত্র হীন শ্রেষ্ঠ প্রত্যেকের প্রতি।

আত্মবৎ জান সবে হও মৈত্রী মতি।।
উপদ্রব সহ্য কর ক্ষমা শীল হয়ে।
সব কিছু জয় কর ক্ষান্তি মৈত্রী দিয়ে।।
বায়ুর মত হও সর্বজন ত্যাজিয়া।
অঙ্গ জীবন ত্যাগ কর নির্বাণে ডুবিয়া।।
নির্বাণ ব্যতীত যাইও না কোন দেশ।
গ্রহন করুন বনভন্তের উপদেশ।।

সংগ্রাম

যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করে সৈনিক দল।
সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দেহের বল।।
বিপক্ষকে নিঃধন করিয়া হয় জয়ী।
বুদ্ধ মতে তাহা নহে প্রকৃত বিজয়ী।।
আত্মজয় শ্রেষ্ঠ জয় সর্বজয় হতে।
প্রত্যেক জয় বিজয় করে ত্রিলোকে।।
লোভ হিংসা অজ্ঞানতা মিথ্যাদৃষ্টি আর।
নিপাত কর নয় প্রকার অহংকার।।
পঞ্চ শত্রু জয় কর যদি চাও সুখ।
জন্ম জন্মান্তরে ঘুচে যাবে সর্ব দুঃখ।।
লোভকে অলোভে হিংসাকে অহিংসা দ্বারা।
অজ্ঞানতাকে কর জয় জ্ঞানের দ্বারা।।
মিথ্যা দৃষ্টিকে সম্যক দৃষ্টি অস্ত্র দিয়া।
অহংকার ধ্বংস কর প্রজ্ঞাবান হইয়া।
সংগ্রামীর রাস্তায় আছে ছয়টি বাঁধা।
সাধারণের মাথায় লাগে বড় ধাঁ ধাঁ।।
নানা কর্মাসক্ত বাক্যাসক্ত নিদ্রাসক্ত।
মিত্রাসক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত আহরাসক্ত।।

সর্বশক্তি ত্যাগীয়া চল মুক্তির সন্ধানে।
পাইবে পরম সুখ নির্বাণ গমনে।।
যাইওনা বিরুদ্ধে বুদ্ধ ও নির্বাণের।
হইবে পতন অবীচি নরকের
পতঙ্গ যেন বাতিকে গিলিবার তরে।
ত্রিরত্ন বিরুপীও সেই রকমে মরে।।
সংগ্রাম কর সবে নির্বাণের লাগিয়া।
সংগ্রামী হও ভন্তের দেশনা শুনিয়া।।

সাত প্রকার ধন

শ্রদ্ধা, শীল, লজ্জা, ভয়, ত্যাগ, শ্রুতি, প্রজ্ঞা।
সপ্তম প্রকার ধন নির্বাণের সংজ্ঞা।।
শীলবানকে দর্শন সদ্ধর্ম শ্রবন।
কর্ম ও কর্মফল বিশ্বাস শ্রদ্ধা ধন।।
কায় শুদ্ধি বাক্য শুদ্ধি করিবে যাহারা।
পরিশেষে শীল শুদ্ধি হইবে তাহারা।।
পাপে লজ্জা ভয় ধন উপার্জে যতনে।
তাহার ভয় থাকে না অপায় পতণে।।
লোভ দ্বেষ মোহ মিথ্যা দৃষ্টি আছে যত।
অবিদ্যা তৃষ্ণা মান ত্যাগ অবিরত।।
চারি আর্য্যসত্য দর্শন বুদ্ধের বাণী।
শ্রুতি ধন উপার্জে সূত্র-দেশনা শুনি।।
বিগত পাপ ধ্বংস কর নূতনে বন্ধ।
কুশল উৎপাদনে নির্বাণের সম্বন্ধ।।
দুঃখে জ্ঞানোদয় দুঃখের কারণে জ্ঞান।
দুঃখ নিরোধে, নিরোধ প্রতি পদায় জ্ঞান।।
অধিক জ্ঞানকে মন্থন করিলে আর।

প্রজ্ঞাই থাকে একমাত্র সংক্ষিপ্ত সার।।
প্রজ্ঞাধন ধন-শ্রেষ্ঠ সর্ব ধন হতে।
ইহার সমান ধন নাই ত্রিলোকেতে।।
সপ্তধন উপার্জিতে করুন কামনা।
গ্রহন করুন বনভন্তের দেশনা।।

সদ্ধর্ম পুকুর

চির শান্তি আছে এক সদ্ধর্ম পুকুর।
অবগাহনে শান্ত কর চিত্ত মুকুর।।
নিত্য স্নান করে যারা গ্রামের পুকুরে।
চিত্ত ময়লা যায়না যে কোন প্রকারে।।
কেহ চলে বহু দূরে কেহ সেই পাড়ে।
কেহ ঘাটে পানি নারে কেহ স্নান করে।।
দূরের লোকে পায়না তাহার ঠিকানা।
কোথায় আছে পুকুর সবার অজানা।।
অজ্ঞানতা, মিথ্যা দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান।
তাদের জন্যে পায়না উহার সন্ধান।।
নিত্য যারা পাড়ে চলে আছে চতুষ্টয়।
সদ্ধর্ম পুকুর দেখে কিছু যায় ক্ষয়।।
ঘাটে বসে পানি ধরে সন্দেহ ভঞ্জনে।
জ্ঞানের আলোকে দেখে মান নিরসনে।।
সদ্ধর্ম পুকুরে যারা নিত্য স্নান করে।
অবিদ্যা তৃষ্ণা ধ্বংস করে পুনঃ না মরে।।
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু দেয় মহা দুঃখ।
অসহায় হয়ে খোঁজে মহা শান্তি সুখ।
চির শান্ত হও সবে সদ্ধর্ম পুকুরে।
স্নানে পরিষ্কার কর চিত্তের মুকুরে।।

বনভন্তের আর্য্যনীতি

সত্য, ত্যাগ, অকৃত্রিমতা, অছদ্ম বেশী।
চার নীতিমালা নিয়ে কর মেলা মিশী।।
চারি আর্যসত্য বাদ বুদ্ধ নীতি বাদ।
তার ব্যতিক্রমে হয় যত বিসংবাদ।।
সত্য দর্শন করে যে বুদ্ধকে দর্শন।
অন্যথায় বামনের চন্দ্রিমা সদর্শন।।
ত্যাগ কর ত্যাগ কর ত্যাগে মহা সুখ।
পঞ্চ কাম ভোগী গনে পায় মহা দুঃখ।।
অবিদ্যা বিতৃষ্ণা মান আর মিথ্যা দৃষ্টি।
বিচিকিৎসা নিরসনে প্রজ্ঞা বই সৃষ্টি।।
বার বার না মরিয়া মর একবার।
দুঃখের অন্ত রোধিয়া নির্বাণই সার।।
বৌদ্ধ ধর্ম অকৃত্রিম জান সর্বজন।
কৃত্রিম হিরো মালি হইও না কখন।
বুদ্ধের নীতির মধ্যে চলে না যে জন।
দুগ্ধেতে জল মিশানো একই রকম।।
অসময়ে ঘোরা ফেরা দ্রব্য বেচাকেনা।
বিহারে রন্ধন করা গ্রহনে দক্ষিণা।
মিথ্যা বাদী, অতি সাধু, পাপী, স্বার্থপর।
চারজন ছদ্মবেশী বিশ্বাস না কর।।
ভিক্ষু হয়ে ভিক্ষুশীল না পালে যেজন।
অপায়ে পতন ভয় থাকে সর্বক্ষণ।।
বিহারে বাজে আলাপ রন্ধন বর্জন।
বিনয় মতে নির্বাণ সম্পদ অর্জন।।
প্রয়োজন অধিক দ্রব্য জমা করন।
বিকালে পানীয় ব্যতীত খাদ্য গ্রহণ।।
পান বিড়ি সিগারেট তামাক চা পান।

অবিদ্যা তৃষ্ণা আলস্য মিথ্যা দৃষ্টি মান।।
এই সকল কুনীতি করিয়া বর্জন।
চারি মার্গ চারিফল করহ অর্জন।।
একাহারী একাচারী ভাবনায় রত।
ক্রয় বিক্রয়, টাকা পয়সা গ্রহণে বিরত।।
বনভন্তের "আর্য্য নীতি" পালন কর।
উৎসাহ উদ্যমে নির্বাণের পথ ধর।।
মুক্তিকামী করুন নির্বাণের সূচনা।
গ্রহণ করুন বনভন্তের দেশনা।।

দশ ধর্ম অভিজ্ঞেয়

১। সম্যক দৃষ্টি মিথ্যাকে করে পরাজয়।
সাধকের মিথ্যাদৃষ্টি হয় না উদয়।।
সর্ব মিথ্যা দৃষ্টি হতে অকুশল সৃষ্ট।
সম্যকের দ্বারা হয় মিথ্যা দৃষ্টি নষ্ট।।
সম্যক দৃষ্টি কারণে কুশল উৎপন্ন।
জ্ঞান ধ্যান দিয়ে তাহা হয় পরিপূর্ণ।।

২। সম্যক সংকল্প দিয়ে মিথ্যা কল্প ক্ষয়।
তাহার মিথ্যা সংকল্প না হয় উদয়।।
মিথ্যা সংকল্প হইতে পাপ অকুশল।
সম্যক সংকল্প দিয়ে.বিধ্বংসে সকল।।
সম্যক সংকল্প হেতু কুশল উৎপন্ন।
জ্ঞান ধ্যান দিয়ে তাহা হয় পরিপূর্ণ।।

৩। সম্যক বাক্য ব্যক্তির মিথ্যা বাক্য ক্ষীন।
সাধুজন মিথ্যা বাক্য বলেনা কখন।।
সর্ব মিথ্যা বাক্য হতে পাপ অকুশল।
সম্যক বাক্যে বিধ্বংসে উহার সমূল।।

সম্যক বাক্য কারণে কুশল উৎপন্ন।
জ্ঞান ধ্যান দিয়ে তাহা হয় পরিপূর্ণ।।

৪। সম্যক কর্ম মিথ্যাকে করে পরাজয়।
সাধকের মিথ্যা কর্ম না হয় উদয়।।
মিথ্যা কর্মান্ত হইতে অকুশল সৃষ্ট।
সম্যক কর্মান্ত দিয়ে মিথ্যা কর্ম নষ্ট।।
সম্যক কর্মান্ত হেতু কুশল উৎপন্ন।
জ্ঞান ধ্যান দিয়ে তাহা হয় পরিপূর্ণ।।

৫। সম্যক আজীব দিয়ে মিথ্যা হয় ক্ষীন।
সাধক মিথ্যা আজীব করে না কখন।।
মিথ্যা আজীব হইতে পাপ অকুশল।
সম্যক আজীব দিয়ে বিধ্বংসে সকল।।
সম্যক আজীব হেতু কুশল উৎপন্ন।
জ্ঞান ধ্যান দিয়ে তাহা হয় পরিপূর্ণ।

৬। সম্যক ব্যায়াম দিয়ে মিথ্যা হয় ক্ষীন।
সাধক মিথ্যা ব্যায়াম করে না কখন।।
মিথ্যা ব্যায়াম হইতে পাপ অকুশল।
সম্যক ব্যায়াম দিয়ে বিধংসে সকল।।
সম্যক ব্যায়াম হেতু কুশল উৎপন্ন।
জ্ঞান ধ্যান দিয়ে তাহা হয় পরিপূর্ণ।

৭। সম্যক স্মৃতি মিথ্যাকে করে পরাজয়।
সাধকের মিথ্যা স্মৃতি না হয় উদয়।।
সর্ব মিথ্যা স্মৃতি হতে পাপ অকুশল।
সম্যক স্মৃতি বিধ্বংসে উহার সমুল।।
সম্যক স্মৃতি কারণে কুশল উৎপন্ন।
জ্ঞান ধ্যান দিয়ে তাহা হয় পরিপূর্ণ।।

৮। সম্যক সমাধি দিয়ে মিথ্যা হয় ক্ষয়।
তাহার মিথ্যা সমাধি না হয় উদয়।।
মিথ্যা সমাধি হইতে পাপ অকুশল।

সম্যক সমাধি দিয়ে বিধ্বংসে সকল।।
সম্যক সমাধি হেতু কুশল উৎপন্ন।
জ্ঞান ধ্যান দিয়ে তাহা হয় পরিপূর্ণ।।

৯। সম্যক জ্ঞান মিথ্যাকে করে পরাজয়।
সাধকের মিথ্যা জ্ঞান না হয় উদয়।।
সর্ব মিথ্যা জ্ঞান হতে পাপ অকুশল।
সম্যক জ্ঞান বিধ্বংসে উহার সমুল।।
সম্যক জ্ঞান কারণে কুশল উৎপন্ন।
জ্ঞান ধ্যান দিয়ে তাহা হয় পরিপূর্ণ।।

১০। সম্যক বিমুক্তি দিয়ে মিথ্যা হয় ক্ষয়।
তাহার মিথ্যা বিমুক্তি না হয় উদয়।।
মিথ্যা বিমুক্তি হইতে পাপ অকুশল।
সম্যক বিমুক্তি দিয়ে বিধংসে সকল।।
সম্যক বিমুক্তি হেতু কুশল উ্যৎপন্ন।
জ্ঞান ধ্যান দিয়ে তাহা হয় পরিপূর্ণ।।
দশ ধর্ম অভিজ্ঞেয় জান সর্বজন।
সর্বদা স্মরণ রাখ ভুলনা কখন।।
ভন্তের অমুল্য বাণী নির্বান সোপান।
দুঃখ অন্ত করে পাবে অচ্যুত নির্বান।।
নির্বান লাভের জন্যে দুঃখের নিঃশেষ।
সর্ব সংযোজন ছিন্নে নাই অবশেষ।।

দশোত্তর ধর্ম

১। দশোত্তর এক ধর্ম বহু উপকারী।
কুশল ধর্মে অপ্রমাদ দুঃখ অন্তকারী।।

২। এক ধর্ম ভাবিতব্য কায়গতা স্মৃতি।
বেদনার অনুকুলে সুখ কলবতী।।

৩। এক ধর্ম যাজ্ঞাতব্য উপাদান স্পর্শ।
সর্ব আস্রব প্রযুক্ত চিত্তকে আকর্ষ।।

৪। এক ধর্ম পরিত্যজ্য তাহা অহংকার।
এক সূত্রে গাঁথা মান পাপ অলংকার।।

৫। এক ধর্ম যাহা হীন বিশৃংখল চিন্তন।
অপায় দুর্গতি ভোগে না পায় শরন।।

৬। বিশেষ ভাগীয় ধর্ম সুশৃংখল চিন্তা।
উদ্ধ চক্রে চলে যথা মুক্তিপদ পন্থা।।

৭। যে ধর্মের দ্বারা ফাক নাই দুস্প্রতিবেধ্য।
আন্তরিক চিত্ত সমাধি হয় অবেধ্য।।

৮। এক ধর্ম উৎপাদনীয় অকোপ্যজ্ঞান।
অধোচক্রে চলে না যথা অচ্যুত ধ্যাণ।।

৯। এক ধর্ম অভিজ্ঞেয় সত্ত্ব আহারস্থিত।
আহার বিনা চলে না সর্বহীন শ্রেষ্ঠ।।

১০। এক ধর্ম আছে যাহা সাক্ষাৎ করণীয়।।
অকোপ্য চিত্ত বিমুক্তি পন্ডিত বেদনীয়।।
দশোত্তর ধর্ম পড়ে হও মুক্তিমনা।
গ্রহণ করুন বনভন্তের দেশনা।।

চিত্ত-দমন

বলবান বৃষ যেন ছুটাছুটি করে।
ক্ষেত চাষ নষ্ট করে বাঁধা দিতে নারে।।
শক্ত রজ্জু দিয়ে তারে আবদ্ধ করিয়া।
রীতিমত শিক্ষা দেয় সজোরে মারিয়া।।
আস্তে আস্তে বাধ্য করে সংযম শিখিতে।
অবশেষে শিষ্ট হয়, দমিতে দমিতে।।
শান্ত দান্ত হয়ে টানে নাঙ্গল আর গাড়ী।

সুনাম অর্জন করে চলে প্রভু বাড়ী।।
চিত্ত যথা চলে তথা তড়িৎ গতিতে।
দেশ–বিদেশ বেড়ায় আপন মতিতে।।
কার সাধ্য আছে তাকে আবদ্ধ করিতে।
তার সম শক্তি নাই পারে না ধরিতে।।
জ্ঞানীজন বাঁধে তাকে সুতাক্ষ্ম স্মৃতিতে।
আস্তে আস্তে শিক্ষা দেয় সুবাধ্য করিতে।।
দমিত হইয়া করে কুশল উৎপন্ন।
জ্ঞান ধ্যান দিয়ে হয় মার্গ ফলে পূর্ণ।।
চিত্তের দমন কর যদি চাও মুক্তি।
নিত্য চিন্তা কর বনভন্তের সুমুক্তি।।

মানব ধর্ম পরিচয়

পাপ সঞ্চয়ের মূল লোভ অতিশয়।
পূন্য সঞ্চয়ের মূল সংযমেতে হয়।।
নিত্য ব্যবহার্য্য ধন পরম সন্তুষ্টি।
নির্বাণের পথ বন্ধ করে মিথ্যা দৃষ্টি।।
পূন্য বৃদ্ধির উপায় কল্যাণ মিত্র।
মহা অনিষ্টকারী একমাত্র প্রমত্ত।।
অপ্রমাদ পৃথিবীতে প্রকৃত অমৃত।
তৃষ্ণার সেবা করে যে প্রকৃত পীড়িত।।
বিষয়ার ধন হানি মহা ক্ষতি হয়।
সর্বার্থ সাধক হয় বীর্য্যবানে কয়।।
প্রজ্ঞা শ্রীবৃদ্ধির ধন জ্ঞানীর ঘোষিত।
আলস্য সব কিছুর ঠিক বিপরীত।।
উদাসীন হয়ে থাকে আগত চিন্তায়।
অনাগত চিন্তা করে অজ্ঞানী কাটায়।।
ধর্মকে অধর্ম বলে অধর্মকে ধর্ম।

তৃষ্ণাকে বাড়ায় করে অকুশল কর্ম।।
আয়ের পথ রোধিয়া পূর্ব ধন খায়।
প্রকৃত অভাব গ্রস্থ তাকে বলা যায়।
ক্রোধের আহুতি দিয়ে দিবানিশী চলে।
নিত্য বিপদ বাড়ায় পরিণাম ফলে।।
ধর্ম দাতা শ্রেষ্ঠ দাতা ধর্ম শাস্ত্রে কয়।
আমিষ ও ধর্মদানে জনসেবা হয়।।
আমিষ ধন ধর্ম ধন সঞ্চয় যে করে।
প্রকৃত সঞ্চয়ী বলে জ্ঞানীরা প্রচারে।।
ইন্দ্রিয় সংযম আর মিত ব্যয়ে চলে।
প্রকৃত মানুষ হয় এই ধরা তলে।।
স্মৃতি বল ধ্যান বল থাকিবে যাহার।
সত্যিকার বলশালী ত্রিভব মাঝার।।

হীন ধর্ম ত্যাগ

হীন তৃষ্ণা হীন সংস্কার সাধারণ ধর্ম।
তিন ধর্ম ত্যাগে বুঝে নির্বাণের মর্ম।।
চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক ইন্দ্রিয়।
পঞ্চ ইন্দ্রিয় চালিত মনই কেন্দ্রীয়।।
কাম তৃষ্ণা পুঞ্জীভূত হয় পঞ্চ দ্বারে।
লোক যেন বদ্ধ থাকে বদ্ধ কারাগারে।।
টাকা পয়সা সম্পদ স্ত্রী পুত্র সকল।
তাদের মোহে কাটিয়া ভব তৃষ্ণা ফল।।
ধর্ম কর্ম নাই যার ইহ পরকাল।
বিভব তৃষ্ণায় সত্ত্ব ঘুরে বহুকাল।।
পার্থিব সকল কাজ হীন সংস্কার হয়।
জন্মান্তরে চলে সবে নির্বাণ না হয়।।
সাধারণ ধর্মে রত মিথ্যা দৃষ্টি হয়।
কল্প কল্প দুঃখ পায় না যায় ক্ষয়।।

কুশলের পথ ধরে হও আগুয়ান।
অপ্রমাদে চল সবে হও মহীয়ান।।
তৃষ্ণা সংস্কারের উর্দ্ধে অসাধারণ ধর্ম।
অচ্যুত নির্বাণ সুখ নাই ধর্ম কর্ম।।

বিভিন্ন মতাবলম্বী

ভিন্ন দৃষ্টি সম্পন্নের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি।
ভিন্ন মতাবলম্বীর ভিন্ন মত সৃষ্টি।।
ভিন্ন রুচি সম্পন্নের ভিন্ন রুচি জ্ঞান।
ভিন্ন যোগ-আচারীর ভিন্ন যোগ ধ্যাণ।।
ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা।
ভিন্ন ভিন্ন গুরুর ভিন্ন ভিন্ন দীক্ষা।।
ভাল মন্দ বড় ছোট সন্দেহ মগনে।
বিমোক্ষ লভিতে নারে তাহার কারণে।
বুদ্ধ জ্ঞান সত্য জ্ঞান যদি বুঝে জ্ঞানে।
অবিদ্যা তৃষ্ণা বিধ্বংসে মান নিরসনে।।
ভিন্নমত পরিহরি চল আর্য্যমতে।
পরিত্রাণ পাবে অন্তে সর্ব দুঃখ হতে।।

কামের আদীনব

কাম সুখে কাম ভোগে কামের কারণে।
একজন পরজনে কামের বন্ধনে।।
করে হিংসা করে নিন্দা পরজনে লোভ।
মোহের অনলে জ্বলে করে মহা ক্ষোভ।।
প্রথম পর্য্যায়ে চলে কথা কাটাকাটি।
তারপর চলে আর মহা লাটালাটি।।
উভয়ে উভয় দলে সমর্থন করে।

কামের মহা বিবাদে নানা অস্ত্র ধরে।।
পরিনামে হয় শুধু মৃত্যু সমতুল্য।
অজ্ঞানী বুঝে না জীবনের কি যে মুল্য।।
একে অপরের সহিত ভ্রাতা ভ্রাতার।
ভগ্নি ভগ্নির বন্ধু বন্ধুর পিতা মাতার।।
পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে।
কাম হেতু কাম ভোগে এক পরে রোষে।।
হিংসার আগুনে জ্বলে করে মহা ক্রুদ্ধ।
পরিনামে দুই দলে বাঁধে এক যুদ্ধ।।
অংগের ছিন্নে আর্তনাদে হয় মরণ।
মনুষ্য জনম ছেড়ে অপায় গমন।
চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ইন্দ্রিয়।
আলম্বনে চালিত করে মন কেন্দ্রীয়।।
অকুশল পথে চলে সদা পঞ্চ কাম।
কাম চক্রে ঘুরে যথা দুরগতি ধাম।।

বন ভন্তের দেশনা

অধ্যাপক শিশির বড়ুয়া
খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ

(১) জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা অন্তে
হে বনভন্তে,
বিস্ময়ে ভাবি দেশনা তোমার
গল্প উদাহরণ আর বাস্তবতার
সমন্বয়ে
অপূর্ব অদ্ভুদ হয়ে
জাগায় মানুষের মনে নতুন চেতনা
করে দেয় দূর মানুষের শোক-তাপ-বেদনা।
তোমার দেশনা শুনে

ভক্তবৃন্দ ভুলে যায় ক্লান্তি
খুঁজে পায় নির্বাণ শান্তি।
তোমার দেশনা শ্রবণ পঠনে
জীবন গঠনে
তোমার দেশনা অনুসারে
জীবনাচারে
পাবে মানুষ মার্গফল
তোমার দেশনা হোক তাই একমাত্র সম্বল,
হোক একমাত্র আমাদের কামনা।
হে বনভন্তে, তোমার দেশনা।

(২) বনচারী ওগো বনভন্তে তোমার দেশনা
এনে দেবে জানি আমাদের পথের নির্দেশনা
তোমার দেশনায় হয়রে শান্ত চির চঞ্চল
ত্রিশরণ মন্ত্রে মুখরিত মৌন বন-অঞ্চল
জাগ্রত হয় ভক্তের অন্তরে নির্বাণ চেতনা।
বনবাসী বনভন্তে হে ত্যাগী বিরাগী ধ্যানী
হৃদয়ে আমরা করবো লালন তোমার বাণী,
মৈত্রী বারি তুমি সিঞ্চন করো আমাদের মাঝে
দেশনা তোমার প্রতিদিনকার সকল সাঁজে
হোক না জীবনে আমাদের একমাত্র কামনা।

মুক্তির পথ

অরুণ বিকাশ তালুকদার

সুখের মোহে অন্ধ হয়ে ম্রিয়মান মানব জাতি
অবিদ্যায়, তৃষ্ণায় আচ্ছন্ন ওহে অজ্ঞানী।
দুঃখকে সুখ, সুখকে দুঃখ বলে সদা আচরণ করি।
এসো হে মানব, রাজবন বিহারে–
হৃদয়ঙ্গম করি আর্য-পুরুষের অমৃতময় বাণী।

নারী–পুরুষের মিলন মানব জাতির দুঃখ বরণ
ক্ষণিক সুখ, ক্ষীন স্বার্থ অজ্ঞানীর অবলম্বন।
লেখা শিখে, পড়া শিখে করি উচ্চ ডিগ্রীর অহংকার
দুঃখ মুক্তি হবে না তবুও––– সত্য জ্ঞান নাই যার।
হিংসা–বিদ্বেষ, অহংকার মানুষের দুঃখের আকর
ঘৃণা ভরে ত্যাজি তারে– পাড়ি দিতে জন্ম দুঃখ সাগর।
কাম, রূপ, বেদনা ভুলে দ্বন্ধ–সংঘাত এড়িয়ে–
খুঁজি মৃত্যুহীন পথ
মন–চিত্ত স্থির করে, আর্য–পুরুষের বাণী শুনে
লভিতে নির্বাণ রথ।
সুখের অন্বেষায় লোভে–মোহে তমাচ্ছন্ন ওহে অন্ধ অজ্ঞানী
এসো হে মানব, প্রতিনিয়ত রাজবন বিহারে–
হৃদয়ঙ্গম করি ধ্যানী, গুনীর দুঃখ মুক্তির বাণী।
জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ আর মরণ দুঃখ করিতে লাঘব
বুদ্ধের নির্দেশিত "চারি আর্যসত্য" জ্ঞানই এর একমাত্র মুক্তির পথ।।
(শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মোপদেশ হইতে সংগৃহীত)

নির্বাণ যাত্রী বনভন্তে

কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া (রাজীব)
সহ–সভাপতি, বি.সি.এফ.এ

সাধক তুমি সাধনানন্দ,
তৃষ্ণামূল ছেদন তরে–
লভেছ পরম আনন্দ।
বসে ধ্যাণে আপন মনে,
ধন–সম্পদ, মনি মুক্তা
তুচ্ছ জ্ঞানে,

জীবন অঙ্গের লালসা ত্যাগে,
প্রবেশে গহিন বনে।
রত তুমি–
অনিত্য–দুঃখ–অনাত্ম দর্শনে।।
ধন্য তুমি সৌম্য পুরুষ,
লভিয়াছ সম্যক জ্ঞান।
মারের বাঁধন ছিন্ন করে–
হয়েছ আজি মহান,
সত্য পথ অন্বেষণে।
লোকোত্তর জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে
তুমি সত্যিই জ্ঞানের সম্রাজ্ঞী।
তোমারি অবস্থানে তাই
ধন্য রাজবন ভূমি,
নির্বাণ সুখ আনায়নে।।
তোমার দেশনায় ধ্বনিত আজি
ভোগই দুঃখ, ত্যাগই সুখ
এ অমোঘ বাণী।
চতুরার্য্য সত্য ও
নির্বাণের মাহাত্ম্যে
হাজারো লোকের ঢল নামেছে আজি
রাজবন বিহার পূণ্যতীর্থে।
সবার মনে বাসনা শুধু
তোমার চরণ ধূলি।
সকাশে তোমায় মাগে এ আশীর্বাদ
প্রাপ্তি ঘটে যেন নির্বাণ স্বাদ।।

ধর্ম্মীয় গান

গীতিকার– সুনীল কার্বারী
সুরকার– দিলীপ বাহাদুর রায়
শিল্পী– ঈশিতা চাক্‌মা (কেপি)

আয় লক্ষী সোনা মনি
কিয়ঙ ত্ যেই
আলসি গড়ি 'ঘর' কনাত
বোই ন' থেই।।
বাত্তি হাঙেবং বুদ্ধরে, ধর্ম্মরে
সংঘরে জু দিবং
বুদ্ধো ধক্যা দোল অবাত্তেই
বর মাগি' বোং
বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি ধম্মং শরনং গচ্ছামি
সংঘং শরনং গচ্ছামি ধম্মং শরনং গচ্ছামি
বুদ্ধো কধা ধরিবং
বুদ্ধো ধম্ম সংঘরে পুজিবোং
উজু মনে থেবং
হিংসে ন' গরিবোং
বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি ধম্মং শরনং গচ্ছামি
সংঘং শরনং গচ্ছামি আর্য্য অবাত্তেই।।

বৌদ্ধ কবিতা গুচ্ছ ঃ

কর্ম বিভংগ সূত্র

একদা কোন সময় বুদ্ধ ভগবান।
শ্রাবস্তীর জেতবনে করেন অবস্থান।।
তোদেয্য পুত্র যুবক ব্রাহ্মণ।
বন্দনা করিয়া শুভ আলাপে মগন।।
নানা প্রকার আলাপ করে উত্থাপন
ইহার উত্তর চাই বুদ্ধ ভগবান।।
সংসার মধ্যে সর্বত্র অসদৃশ্য এমন।
মানুষের মধ্যে তার দেখিছি কেন।।
কাহারো কাহারো দেখি খুব অল্প আয়ু।
কাহারো কাহারো দেখি খুব দীর্ঘ আয়ু।।
কেহ বা রোগবিহীন কেহ চির রোগী।
কেহ কেহ অতি দীন কেহ মহাভোগী।।
কেহ কেহ আছে লোক সুশ্রী সুগঠন।
কেহ কেহ আছে লোক বিশ্রী অগঠন।
কোন কোন লোক আত্মীয় বান্ধব শূন্য।
কাহারো আত্মীয় বন্ধু সর্বঅগ্রগণ্য।।
কেহ কেহ আছে কুল মর্যাদা স্বকীয়।
কোন কোন লোক আবার নীচ জাতীয়।।
কেহ কেহ আছে লোক অতি মুর্খ ব্যক্তি।
কাহারো কাহারো আছে পন্ডিতের শক্তি।।
ইহার কারণ কি, বলুন তথাগত।
ইহার উত্তর চাই ভন্তে যথাযথ।।
সত্বের কারণ জানা, তোমার আগ্রহ।
সত্ব স্বস্ব কর্মেরই জীবন্ত বিগ্রহ।।
কর্ম তার অধিকারী কর্মই জননী।
কর্মই তার বন্ধু আশ্রয় প্রদায়িনী।।

স্বীয় কর্ম শুভাশুভ আপন প্রজনন।
কর্মই প্রাণীগণকে করে নিয়ন্ত্রণ।।
ইহা অতীব সংক্ষিপ্ত ভগবৎ গৌতম।
বিশদভাবে বর্ণনেন হইবে উত্তম।।
মনোযোগ দিয়ে শুভ করহ শ্রবণ।
বিশদভাবে করিব কর্মের বর্ণন।।
কোন কোন স্ত্রী পুরুষ প্রাণী হত্যাকারী।
মৈত্রী হীনতায় হয় অপায় আচারী।।
যদি সে মানুষরূপে আসে পুনরায়।
অল্প আয়ুরূপে থাকে অনিত্য ধরায়।।
প্রাণীর প্রতি সদয় মৈত্রী ভাবাপন্ন।
মৃত্যুর পর গমন সুগতি আসন্ন।
যদি সে মানুষরূপে আসে পুনরায়।
দীর্ঘ আয়ুরূপে থাকে অনিত্য ধরায়।।
কোন কোন স্ত্রী পুরুষ আঘাতে বিরত।
মৃত্যুর পর স্বর্গ সুখে হয় মোহিত।।
যদি সে মানুষরূপে আসে পুনরায়।
সুঠাম স্বাস্থ্য শরীর নীরোগে কাটায়।।
অসহিষ্ণু ক্রোধ ব্যক্তি কাটায় জীবন।
অপায় দুর্গতি ভোগে হইলে মরণ।।
যদি সে মানুষরূপে আসে পুনরায়।
বিশ্রী কদাকার হয়ে জীবন কাটায়।।
সহনশীল অক্রোধী মৈত্রীপরায়ন।
স্বর্গ সুখ ভোগ করে হইলে মরণ।।
যদি সে মানুষরূপে আসে পুনরায়।
সুশ্রী সুগঠনে থাকে অনিত্য ধরায়।।
পরের লাভ সৎকার মহৎ না করন।
সব সময় রমিত ঈর্ষা পরায়ন।।
হিংসায় উম্মত্ত হয়ে কাটায় জীবন।
আয় শেষে যায় শুধু নরকে গমন।।

যদি সে মানুষরূপে আসে পুনরায়।
বন্ধু শূন্য হয়ে থাকে অনিত্য ধরায়।।
পূজনীয়কে পূজন পরকে মুদিতা।
অষ্টবিধ লোক ধর্মে সদা অকম্পিতা।।
আয়ু শেষে হয় যদি তাহার মরণ।
দিব্য সুখ ভোগ করে সুগতি গমন।।
যদি সে মানুষরূপে আসে পুনরায়।
আত্মীয় বান্ধব থাকে অনিত্য ধরায়।।
কোন কোন স্ত্রী পুরুষ অতীব কৃপন।
দান কখনো করে না ভিক্ষু শ্রমন।।
আয়ু শেষে হয় যদি তাহার মরণ।
অপায় দুঃখে কাটায় না পায় শরণ।।
যদি সে মানুষরূপে আসে পুনরায়।
অতীব গরীব হয়ে জীবন কাটায়।।
কোন কোন স্ত্রী পুরুষ দীন জনে দান।
আয়ু শেষে লাভ করে স্বর্গের সোপান।
যদি সে মানুষরূপে আসে পুনরায়।
মহাধনী ভোগশালী হইয়া কাটায়।।
কোন কোন স্ত্রী পুরুষ হয় অভিমান।
সাধু পূজনীয় জনে করে না সম্মান।।
আয়ু শেষে হয় যদি তাহার মরণ।
অপায় দুঃখে কাটায় না পায় শরণ।।
যদি সে মানুষরূপে আসে পুনরায়।
নীচ কুলে জন্ম হয়ে জীবন কাটায়।।
কোন কোন স্ত্রী পুরুষ অভিমান হীন।
সাধু পূজনীয় জনে করে সমীচিন।।
আয়ু শেষে হয় যদি তাহার মরণ।
দিব্য সুখ ভোগ করে সুগতি গমন।।
যদি সে মনুষ্যরূপে আসে পুনরায়।

উচ্চকুলে জন্ম হয়ে জীবন কাটায়।।
কোন কোন স্ত্রী পুরুষ থাকে জিঘাংসা।
অভিজ্ঞের নিকট করে প্রশ্ন মীমাংসা।।
আয়ু শেষে হয় যদি তাহার মরণ।
দিব্য সুখ ভোগ করে সুগতি গমন।।
যদি সে মনুষ্যরূপে আসে পুনরায়।
মহাপন্ডিত হইয়া জীবন কাটায়।।
কোন কোন স্ত্রী পুরুষের নাই জিঘাংসা।
কাহারো কাছে করে না প্রশ্নের মীমাংসা।।
আয়ু শেষে হয় যদি তাহার মরণ।
অপায় দুঃখে কাটায় না পায় শরন।।
যদি সে মানুষরূপে আসে পুনরায়।
অজ্ঞানী মূর্খ হইয়া জীবন কাটায়।।
কর্মের ব্যাখ্যায় প্রীত যুবক ব্রাহ্মন।
অত্যাশ্চর্য্য চমৎকার বুদ্ধ ভগবান।।
অধোমুখী পাত্রকে উর্দ্ধমুখী যেমন।
আচ্ছাদিত জিনিষকে বিবৃত তেমন।।
পথভ্রষ্ট মানুষকে পথ নির্দেশন।
অন্ধকারে তেলাদীপ করিয়া ধারণ।।
জানিলাম সত্য পথ ভগবৎকৃত।
অনেক পর্যায়বশে ধর্ম প্রকাশিত।।
অদ্য হতে আজীবন বুদ্ধ গৌতমের।
আপনার সুব্যাখ্যাত প্রকাশিত ধর্মের।।
পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের নিলাম শরন।
শরণাগত উপাসক করুন ধারণ।।

গতিচক্রে ঘুরে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা।
আপন কর্মেতে ঘুরে প্রত্যেক সত্ত্বেরা।।

(বনভন্তে)

আলবক যক্ষ

শ্রাবস্তী হতে ত্রিশ যোজন ব্যবধান।
আলবী নামেতে রাজ্য ছিল অবস্থান।।
সেই রাজ্যের রাজন মৃগয়া মানসে।
সৈন্য সামন্ত নিয়ে অরণ্যে প্রবেশে।।
যাহার দিকে করিবে মৃগ পলায়ন।
তাহার দিতে হইবে উচিৎ মূল্যায়ন।।
তীর বেগে ধায় মৃগ রাজার সম্মুখে।
লজ্জিত হইয়া রাজা দৌড়ায় উহাকে।।
মৃগ তাড়িয়া বসেন এক বৃক্ষ মূলে।
আলবক যক্ষ নামে থাকে সেইস্থলে।।
রাজাকে দেখিয়া যক্ষ খাইব তোমায়।
রাজা খুব ভীত হয়ে অনন্য উপায়।।
যক্ষের সংগে রাজার হল একসন্ধি।
প্রতিদিন পাঠাইবে অন্নসহ বন্দী।।
কারাগারে যত আছে আইনে দন্ডিত।
যক্ষের নিকট অন্ন প্রত্যহ প্রেরিত।।
এইভাবে পাঠাইতে কারাগার শূন্য।
নূতন লোক পায় না পাঠানোর জন্য।।
চৌর্য্যবৃত্তি ছাড়ে সবে যক্ষ প্রাণ ভয়ে।
ভাল করে চলে সবে শীলবান হয়ে।।
অপরাধী না পাইয়া রাজা চিন্তান্বিত।
যত বৃদ্ধলোক আছে হউক আনিত।।
বৃদ্ধলোক দিলে সবে বিদ্রোহ করিবে।
দেশের বাহিরে যাবে কেহনা রহিবে।।
কোলের শিশু না দিলে ধরে খাবে রাজা।
জীব জন্তু ধরে খাবে আরো খাবে প্রজা।।
স্বীয় পুত্রের রক্ষায়, জননী পালায়

পালাইতে পালাইতে শূন্য হয়ে যায়।
দ্বাদশ বৎসর পর শিশু শূন্য হয়।
শিশু না পেয়ে মন্ত্রীরা রাজাকে কয়।।
রাজ কুমার ব্যতীত নাই অন্য কেহ।
শিশু না দিলে খাইবে তাঁহারই দেহ।।
রাণীর কোলে যখন করে দুগ্ধ পান।
কর্মচারী ত্বরা করে লইয়া প্রস্থান।।
দিব্যনেত্রে নিরীখিয়া বুদ্ধ ভগবান।
করুনায় বিগলিত হইয়া গমন।।
রাত্রি প্রভাত হইতে যক্ষের আবাসে।
ঋদ্ধির দ্বারা আসেন অনন্ত আকাশে।।
আলবক যক্ষ দেখে ধ্যানাসীন বুদ্ধ।
বাহির হইতে বলে হয়ে মহাক্রুদ্ধ।।
এইভাবে তিনবার করিল আদেশ।
বুদ্ধ ঋদ্ধি শক্তি দ্বারা করেন প্রবেশ।
চতুর্থবারে সম্বুদ্ধ বাহিরে না যান।
অটল অচল হয়ে পদ্মাসনে ধ্যান।।
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব শ্রমন তোমায়।
উত্তর দিতে না পারিলে ফেলিব গংগায়।।
দেব-মার ব্রহ্মলোকে নাই সমকক্ষ।
কে জিতিবে আমার সহিত ওহে যক্ষ।।
সর্বদায় আছি আমি উত্তরে প্রস্তুত।
যা' তোমার অভিরুচি কর অভিমত।।
ইহলোকে মানবের কোন ধন শ্রেষ্ঠ?
পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা কোনটাই মিষ্ট?
কিবা কাজে মানবের সুখ শান্তি হয়?
কোন জীবন নরের শ্রেষ্ঠ আর জয়?
বিশ্বাসই মানবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ।
সত্যবাক্য মানবের জগতের মিষ্ট।।

ধর্ম আচরণ কাজে সুগতি গমন।
ইহলোক শ্রেষ্ঠ হয় জ্ঞানীর জীবন।।
কিরূপে সংসার স্রোত অতিক্রম হয়?
কিরূপে ভবসাগর পারাপার হয় ?
দুঃখের হাত হতে কিরূপে নিস্তার ?
কিরূপে হয় নরের চিত্ত পরিস্কার ?
বিশ্বাসেই ভবস্রোত অতিক্রম হয়।
অপ্রমাদ দ্বারা ভবসাগর পার কয়।।
দৃঢ়বীর্য্যের প্রভাবে দুঃখ অতিক্রম।
প্রজ্ঞা দ্বারা হয়ে থাকে মহাপরাক্রম।।
কিরূপে হয় প্রজ্ঞা আর ধন অর্জন?
কিরূপে হয় লোকের প্রশংসা ভাজন?
কিসের দ্বারা সংসার মিত্র লাভ হয়?
কিরূপে মৃত্যুর পর কোন শোক নয়?
বুদ্ধের বাক্য শ্রদ্ধায় শ্রবন পঠন।
সেই ব্যক্তির হয় প্রজ্ঞার উপার্জন।।
কোন কাজে থাকে না আলস্য পরায়ন।
সে ব্যক্তির সদা আসে ধন আগমন।।
সেই ব্যক্তি সত্যবাদী প্রশংসা ভাজন।
দানের দ্বারা সংসারে মিত্র লাভী হন।।
সত্য ধর্ম-ধৈর্য্য ত্যাগ করে যেইজন।
মৃত্যুর পর সেই-শোকাহত না হন।
বুদ্ধের উত্তর শুনে আলবক প্রীত।
মহা আনন্দে গাহিল সাধুবাদ গীত।
সেই সময় আনিল রাজর কুমার
কর্মচারী বলে লও আহার্য্য তোমার।।
বুদ্ধের সম্মুখে যক্ষ লজ্জিত হইল।
উভয় হস্তে লইয়া সমুদ্ধকে দিল।।
বুদ্ধ কুমারকে লয়ে আশর্বাদ দিয়া।

দীর্ঘায়ু লাভ করুক সুখীত হইয়া।।
আলবক যক্ষ বলে বুদ্ধ ভগবান।
বুদ্ধধর্ম ও সংঘের নিলাম শরন।।
ভগবান কুমারকে করেন অর্পন।
কুমার বড় হইলে কর প্রত্যর্পন।।
কুমারটি কর্মচারী হতে যক্ষ হস্তে।
যক্ষের হস্ত হইতে সুগতের হস্তে।।
শিশু কর্মচারীর হস্তেই সমর্পিত।
'হস্ত আলবক নামে সকলে ডাকিত।।
কুমারের মাতাপিতা বুদ্ধের দয়ায়।
নিয়োজিত করেন ত্রিরত্নের সেবায়।।
সংঘের সেবা করিয়া অনাগামী ফল।
উপাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল।।

চন্দ্র সূর্য্যের ঢাকে যথা মেঘে যেমন।
অবিদ্যায় ঢাকে তথা স্বত্বেরে তেমন।।
(বনভন্তে)

শুক পাখীর ভাবনা

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম অনিত্য জগতে।
দান–শীল ধ্যান কর সর্বদা স্মৃতিতে।।
কুশল কর্মের ফল মহাশান্তি প্রদ।
নির্বাণ নিকটে কিন্তু চল যথাযথ।।
সংক্ষেপে বলিব এক পাখীর বৃত্তান্ত।
ভাবনার গুনাগুন অসীম অনন্ত।।
কুরু রাজ্যে ভগবান করেন গমন।
মহাসতিপট্‌ঠান সূত্র করেন দেশন।।
সেই হতে লোকেরা করিতেন স্মৃতি।
অনুকূলে করে স্মৃতি চলে চিত্তবীথি।।

যে ব্যক্তি করে না স্মৃতি তাকে পরবাদ।
যাহার আছে ভাবনা তাকে সাধুবাদ।।
মনুষ্য ভাবনা করে শুধু তাহা নহে।
তির্য্যক প্রাণী সার্থক ধ্যানের প্রবাহে।।
কুরু রাজ্যে একদল নৃত্য ব্যবসায়ী
নৃত্যক্রিয়া করে তারা টাকা অনুযায়ী।।
শুক শাবক তাদের মানুষের বুলি।
তাড়াতাড়ি চলে গেল শুক পাখী ভুলি।।
ভিক্ষুনী আশ্রমে পেয়ে যতন করিয়া।
'বুদ্ধরক্ষিত' ডাকিত বুলি শিখাইয়া।।
একদিন আশ্রমের ভিক্ষুনী প্রধান।
বুদ্ধরক্ষিত দিলেন 'অস্থি' কর্মস্থান।।
তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করেন বর্ণনা।
শুক পাখী মন দিয়া করিল ধারণা।।
শরীর স্নায়ুবেষ্টিত অস্থিময় গৃহ।
মাংসরূপ মাটি কেশরূপ তৃণ দেহ।।
দেহ অশুচি ঘৃণিত গঠিত বাহিরে।
দুগ্ধ বিষ্টার ঘট দেহের অন্তরে।।
দেহের অসার বুঝে অতিরিক্ত খুশী।
অস্থি অস্থি বলে পাখী সদা দিবানিশী।।
একদা বুদ্ধ রক্ষিত তোরনে বসিয়া।
রৌদ্র সেবনে জপে মনোযোগ দিয়া।।
হঠাৎ এক শ্যেনপক্ষী ছোঁ মারিয়া নিল।
মৃত্যুর কথা ভুলিয়া স্মৃতি না ছাড়িল।।
শ্রামনীরা ঢিল দিয়ে করিল উদ্ধার।
জিজ্ঞাসে তাহারে স্মৃতি আছে কি তোমার।।
এক অস্থি অন্য অস্থি নিয়ে যায় বহে।
এই ছিল মোর স্মৃতি ভিক্ষুনীকে কহে।।
আমি যাহা উহা তাহা, তাহা অস্থি ময়।

সবকিছু অস্থিময় পন্ডিতেরা কয়।।
সাধুবাদ প্রদানিয়া হোক পূন্যময়।
ভবিষ্যতে তব যেন মোহামুক্তি হয়।।
কাল প্রাপ্তে শুকপাখী অনুরাধা পুরে।
মনুষ্যরূপে জন্মিল ধনবান ঘরে।
তরুন বয়সে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
গুরুর নির্দেশ মতে ভাবনা ধারণ।।
পূর্বজন্মের অভ্যস্ত অস্থি কর্মস্থান।
চিত্তে উপস্থিত হল স্মৃতি উপস্থান।।
একদা তিনি বাহির হলেন পূর্বাহ্নে।
অনুক্রমে বিচরণ করেন ভিক্ষান্নে।।
স্বামী স্ত্রী কলহ করে চলিল যুবতী।
তার দন্ড দর্শনার্থে হল অস্থি স্মৃতি।।
পূর্বজন্মের স্মৃতিতে বিবর্দ্ধিত হল।
বিদর্শন ভাবনায় অরহত্ব ফল।।
মুক্তির পথ লাগিয়া করহ সন্ধান।
শমথ বিদর্শনে শান্তি পদ নির্বান।

পূর্বের সঞ্চিত পূন্য বুদ্ধের নির্দেশ।
নিজের চেষ্টায় হয় প্রজ্ঞার উন্মেষ।।

(বনভন্তে)

পদ্ম কুমার

পবিত্র সংযম শীল প্রিয় দেবতার।
পুন্যবান প্রিয় হয় জগত মাঝার।।
চন্দ্র যেন রাহুগ্রস্ত পুরুষ সুজন।
রমনী কুহকে পড়ে হারায় জীবন।।
তট ধ্বংস প্রাপ্ত করে তটিনী যেমন।

কুলটা রমনী ধ্বংসে কুলকে তেমন।।
বারানসীর প্রধানা রানীর ঔরশে।
পদ্মকুমার নামেতে তাহাকে প্রকাশে।।
সর্বগুনে গুনান্বিত হইল যখন।
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন তখন।।
হঠাৎ তাহার মাতার হইল মরণ।
নৃপতি অন্য মহিষী করেন বরণ।।
একদা বিদ্রোহ হল প্রত্যন্ত প্রদেশে।
রাজা গেলেন তথায় দমন মানসে।।
রাজপুরী রক্ষাভার পদ্মের উপর।
প্রতিপালন করেন আদেশ তাহার।।
প্রয়োজনে যান তিনি বিমাতার ঘরে।
কুমারের রূপদেখে বিমুগ্ধ অন্তরে।।
বিলাসিনী কামিনীর হল বাসনা।
লজ্জাহীনা প্রিয় বাক্যে করিল ঘোষণা।
মহাসত্ত্ব ঘৃণ্য ভরে করে প্রত্যাখ্যান।।
বিষাদ পূর্ণ অন্তরে ত্যাগে সেই স্থান।
সৎস্বভাব পুরুষের শ্রেষ্ট আভরন।
সজ্ঞানের সংযমেই শান্তিযুক্ত হন।।
ক্রুদ্ধ সর্পিনীর মত দুঃখে জর্জরিত।
প্রতিশোধ নেবে রানী হয়ে আশাহত।।
বিদ্রোহ দমন করে রাজ আগমন।
শয্যাশায়িনী মহিষী মলিন বদন।।
বিষাদের কারণ কি জিজ্ঞাসে রাজন।
কটু বাক্যে বলে রানী রাখিব না জীবন।
বড় অপমান দুঃখ অতীব আমার।
অতিহীন কাজ করিল পদ্মকুমার।
স্বীয় পুত্রসম জানি কুমারের প্রতি।
পাপ কাজে না করায় মারে এক লাথি।।

কুহুকিনী রানী কাঁদে সকরুণ স্বরে।
মায়া কান্নায় রাজার মন জয় করে।।
গর্জনে হুংকার ছেড়ে দিলেন আদেশ।
ঘাতক পালিল তাহা প্রাণ দন্ডাদেশ।।
কামান্ধ পুরুষ যারা চিনে না জগতে।
মাতাপিতা ধর্ম ত্যাগে শুধু নারী হতে।।
কাহারো প্রতি বিদ্বেষ নাহন কুমার।
মৈত্রী পূর্ণ হয়ে আছে তাঁহার অন্তর।।
বেত্রাঘাতে নিয়ে যায় পর্বত শিখরে।
তাহা হতে ফেলে দিবে মারিবার তরে।।
পাদদেশে বাস করে এক নাগরাজ।
করুনাদ্র হয়ে গেল উদ্ধারিবে আজ।।
ঘাতকেরা ফেলে দিল প্রপাতে যখন।
নাগরাজ নিয়ে গেল যতনে তখন।।
নাগপুরে দিব্য সুখে আছেন কুমার।
নিত্য সেবা যত্ন করে নাগেরা তাঁহার।।
সুরম্য নাগভবন অতি অনুপম।
বোধিসত্ত্ব চমৎকৃত বিচিত্র দর্শন।।
কোথা থেকে কোথা আছি ভাবে মনে মন।
হেনকালে নাগরাজ দিল দরশন।।
স্মিতহাস্যে বলে রাজ আছেন কেমন?
তব সেবা যত্নে ক্রুটি আছে কি তেমন?
তিনি উত্তরে বলেন, খুব সুখে আছি।
না জানি তব কি নাম তাহাই জিজ্ঞাসি।।
ইহা নাগরাজ্য হয় আমি অধিপতি।
অর্ধেক দান দিলাম হও মম সাথী।।
নাগদের সেবা যত্নে কাটে কিছু দিন।
জন্মান্তরের সংস্কারে হন ধ্যানাসীন।
সব কিছু তুচ্ছ লাগে বৈরাগ্য তাঁহার।

ভোগ ঐশ্চর্য্য ত্যাগিয়া ছাড়েন আহার।।
ঐশ্বর্য্য তৃষ্ণার মূল দুঃখের জননী।
বৈরাগ্যই চির শান্তি সুখ প্রদায়িনী।।
তব দয়ায় পেয়েছি নূতন জীবন।
নির্জন অরণ্যে যাব প্রব্রজ্যা গ্রহণ।।
বারবার অনুরোধে চাহিল বারণ।
অগত্যা নিয়ে গেলেন তাঁহার কারণ।।
হিমালয় পাদদেশে আশ্রম নির্মাণ।
গংগা নদীর কুলেই অনুকূল স্থান।।
অনিচ্ছায় নাগরাজ দিলেন বিদায়।
প্রব্রজ্যা গ্রহণে তিনি ধ্যানে সর্বদায়।।
ষড়ক্রিয়ের সংযমে করেন উদ্যোগ।
পঞ্চ অভিজ্ঞান লাভে ধ্যান উপভোগ।।
নাগরাজ প্রতিদিন দিত দিব্য খাদ্য।
জ্যোতির্ময় শান্তি দেখে চমৎকৃত অদ্য।।
উভয়ে প্রীতি আলাপে হলেন প্রবৃত্ত।
ক্ষমা–মৈত্রী করুনার করেন আবৃত্ত।।
তাহাতে আসে চিত্তের সুখে পবিত্রতা।
চিত্ত মল তিরোভাবে আসে সুস্থিরতা।
বিপদগামী চিত্ত অতীব ভয়ংকর।
আসক্তি বন্ধন ভবে খুব দৃঢ়তর।।
বন্ধনে দুঃখের সৃষ্টি সর্বদায় করে।
বৈরাগ্য শান্তি আশ্রয় সর্বদুঃখ হরে।।
অমৃতোপম বাণীতে রাজন কৃতার্থ।
বিকশিত জ্ঞান–প্রজ্ঞা বুঝেন যথার্থ।।

জ্ঞান আর ধ্যান দুই থাকিবে যাহার।
জানিবে নির্বাণ শুধু নিকষ্ঠে তাহার।।
(বনভন্তে)

জীবনের পরিনাম ফল

গৌতম বুদ্ধের কালে এক ধনপতি।
একমাত্র পুত্র ছিল স্নেহ করে অতি।।
আদরের দুলাল সে নয়নের মনি।
অনুপম স্নেহযত্ন মমতার খনি।।
লেখাপড়া শিল্পকার্য কিবা প্রয়োজন।
পিতার সঞ্চিত ধন বহু আয়োজন।।
পুত্র যখন পদর্পে ললিত যৌবন।
উম্মাদে সংসার দেখে লীলা নিকেতন।।
ছুটে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ স্পর্শের মোহে।
ভ্রমর তুল্য বেড়ায় কামের প্রবাহে।।
পুত্রের জন্যআনিল সুন্দরী কামিনী।
তবু মিটিল না তৃষ্ণা কাম প্রবাহিনী।।
জুটিল অহিতকামী আর চাটুকার।
ধর্ম কর্ম নাহি করে পাপ মিত্র তার।।
পিতামাতা কাঁদে সদা পুত্রের কারণে।
অনুতাপ নিয়ে গেল জীবন মরণে।।
অতিস্নেহ ভাল নয় শুধু সর্বনাশ।
দুঃখের হাত থেকে পায় না অবকাশ।।
সর্বময় কর্তা হয়ে উড়ায় দুহাতে।
সহসা নিঃশেষ হল সম্পত্তি তাহাতে।।
ঋণের দায়ে তাহার বাস্তুভিটা গেল।
অসহায় ঘুরে পথে বহু দুঃখ পেল।।
ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে দুঃখে দিন যায়।
রাত্রিতে পান্থশালায় চিন্তাতে ঘুমায়।।
একদা চোরের দল তাহাকে শুধায়।
চুরি বিদ্যা ভাল কাজ উৎসাহ দেখায়।।

চোরের কুচক্রে পড়ে গেল চুরি কাজে।
প্রথম দিবসে ধরা পড়িল সহজে।।
প্রাণদণ্ড হবে তার রাজার বিচারে।
বধ্যভূমি নিয়ে যায় ঘাতক প্রচারে।
সুলখা নামক বেশ্যা পূর্ব পরিচয়।
তাহাকে দেখিয়া নারী খুব দয়া হয়।।
ঘাতককে বলিয়া সে দিল খাদ্যজল।
পূর্ব উপকারী বলে আনন্দিত হল।।
দিব্য চক্ষে নিরীক্ষিয়া মোদ্‌গলায়ন।
চিত্ত প্রসন্ন করিব গতি আনয়ন।।
করুনাদ্র হয়ে তিনি সংকল্প করিয়া
ঋদ্ধি প্রভাবে গেলেন দয়াদ্র হইয়া।
ভিক্ষুকে দেখিয়া চোর হইল প্রসন্ন।
মনে মনে চিন্তা করে মরণ আসন্ন।।
জীবনে কোন সময় করি নাই ধর্ম।
শ্রদ্ধাচিত্তে খাদ্য দিল করে মহাকর্ম।।
দানের ফল তাহার ছিল উর্দ্ধগতি।
সুলখার অনুরাগে হল নিম্নগতি।।
রাজগৃহের প্রকাণ্ড বৃক্ষের শাখায়।
বৃক্ষদেবতা হইয়া জীবন কাটায়।।
প্রথম বয়সে যদি প্রব্রজ্যা হইত।
অবিদ্যা তৃষ্ণা ত্যাগীরা অর্হত্ব লভিত।।
মধ্যম বয়সে যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
সকৃদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হন।।
শেষ বয়সে প্রব্রজ্যা শ্রোতাপত্তি ফলে।
পাপমিত্রের সংসর্গে গেল রসাতলে।।
একদা সুলখা গেল উদ্যান ভ্রমনে।
দেবতা দেখিয়া তাকে উল্লখিত মনে।।
ঋদ্ধি দ্বারা নিয়ে গেল আপন আবাসে

সপ্তন্তে আনিল তাকে বুদ্ধের সকাশে।।
বিহারে ধর্ম সভায় প্রসন্ন হইয়া।
দেশনা শ্রবন করে একান্তে বসিয়া।।
সভার লোকেরা তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায়।
সপ্তাহ পর্যন্ত তুমি রহিলে কোথায় ?
উত্তরে বলে সুলখা সমস্ত কাহিনী।
সামান্য দানের ফল সুখ প্রদায়িনী।।
অর্হত্বেরা জগতের শ্রেষ্ঠ পূন্য ক্ষেত্র
দেবলোক প্রাপ্তি ঘটে দান অল্পমাত্র।
সমবেত জনগণ আর ভিক্ষুগন।
দানের অসীম ফল করে নিরীক্ষণ
ভগবান দানফল করেন বর্ণনা।
দানেতে দুর্গতি খন্ডে না যায় গননা।
অর্হৎ উর্বর ক্ষেত্রে সমতুলনীয়।
দায়ক কৃষক তুল্য অংকুর দানীয়।।
উর্বর ক্ষেত্রে বপিত বীজের সুফল।
প্রেত উদ্দেশ্যে দানীয় না যায় বিফল।।
প্রেত পরিভোগে তাহা দাতা পূন্য ময়।
দেব–মনুষ্য সম্পত্তি সুসমৃদ্ধ হয়।।
প্রেতের উদ্দেশ্যে যারা করে দান সম্পাদন।
দিব্য আয়ু বর্ণ সুখ হয় উৎপাদন।।
ভগবানের দেশনা শুনিয়া সকলে।
ধর্ম জ্ঞান লাভ করে বহু অগ্রফলে।।

ক্ষমাশীল শত্রুপূণ্য সমীর্য্য নির্ভীক।
আর্য্য নামে পরিচিত মোক্ষের প্রতীক।।

(বনভন্তে)

স্ত্রী পরিচিতি

বৌদ্ধ সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিক্ষু শ্রমন ও উপাসক উপাসিকাদের মধ্যে এক নামে একাধিক ব্যক্তির নাম। এমন কি পাঁচ ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। তৎমধ্যে দুইজন উপাসিকা সুজাতার নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম জন হলেন সেনানী কন্যা সুজাতা ভগবান বুদ্ধকে প্রথম পায়স অন্ন দান করেছিলেন। দ্বিতীয়জন হলেন অনাথপিন্ডিক সুদত্তের পুত্র বধু। কোন একদিন ভগবান বুদ্ধ অনাথ পিন্ডিদের আমন্ত্রণে স্বশিষ্যে তাঁর বাড়ীতে যান। সুজাতা ছিলেন অত্যন্ত প্রচন্ডা ও মুখরা নারী। ভগবান বুদ্ধ তাঁর প্রতি করুনাদ্র হয়ে উপদেশ প্রদান করেন। উক্ত উপদেশেই অনাথ পিন্ডিদের পুত্র বধু সুজাতা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। নিম্নে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ সংক্ষিপ্তাকারে কবিতার ছন্দে দেয়া গেল।

সাত প্রকার স্ত্রী আছে জান সর্বজন।
নিরিক্ষীয়া দেখ দেশে বুদ্ধের বচন।।
বধকা চৌরী প্রচন্ডা মন্দ অতিশয়।
মাতৃ, ভগ্নী, সখী, দাসী–সমা ভাল কয়।।

১। বধকা রমনী সদা রমিত কুকাজে।
স্বামীর অহিতকামী পর নর ভজে।।
প্রদুষ্টা খল স্বভাব জীবন হারিনী।
স্বামীকে সবসময় কুপথে চালিনী।।

২। চৌরী স্ত্রী স্বামীর ধন উড়ায় দুহাতে।
কষ্টে উপার্জিত ধন বুঝে না তাহাতে।।

৩। প্রচন্ডা চপলানারী অত্যন্ত মুখরা।
উদ্যোগ নষ্টকারিণী সর্বদা প্রখরা।।
স্বামীর কথা অগ্রাহ্য কথায় কথায়।
যুক্তি পুর্ণ উপমায় নাক ছিটকায়।।
কোড়ায় ঘর্ষণে পুঁজ নির্গত যেমন।
কথায় কথায় উগ্র প্রচন্ডা তেমন।।

খিটখিটে কুকুরিনী সর্বদা যেরূপ।
সবার প্রতি দেখায় প্রচন্ডা সেরূপ।

৪। মাতৃসমা ভার্য্যাযথা মাতার মতন।
সেবা যত্ন করে থাকে অতি প্রাণপন।।
স্বামীর অর্জিত ধন রক্ষা করে যত্নে।
স্বামী ধন মহাধন এই চিন্তা মগ্নে।।

৫। ভগ্নী সমা ভার্য্যা যেমন সহোদর প্রতি।
আদর, সম্মান, সেবা লজ্জাশীল অতি।।

৬। সখী সমা ভার্য্যা সখী সখার মতন।
আমোদ প্রমোদ করে কাটায় জীবন।।
কুশল কর্ম করিয়া স্বামীকে দেখায়।
যথা ধর্ম আচরিয়া জীবন কাটায়।।

৭। দাসী সমা ভার্য্যা যথা স্বামীর বশ্যতা।
প্রাণপনে করে কাজ হইয়া তর্জিতা।।
ক্রোধ হিংসা পরিহরি চিত্ত অদূষিত।
মৈত্রী ধৈর্য্য সহ্য করে স্বামীকে তোষিত।।
চার প্রকার স্বামী স্ত্রী আছে এ ধরায়।
ভাল মন্দ মিশ্র তারা জীবন কাটায়।।

১। দেবসম স্বামী যথা স্ত্রী হয় অসুরী।
বধকা চৌরী প্রচন্ডা মানে না শ্বাশুরী।।

২। দেবী–সমা ভার্য্যা হয় পুরুষ অসুর।
ধর্ম কর্ম নাই তার স্বভাব পশুর।।

৩। অসুর অসুরী দোষে কাটায় জীবন।
পশুর মত হইয়া জীবন যাপন।।

৪। দেবদেবী পরিবার উভয়ে সুশীল।
কল্যাণকর্মে উৎসাহী পাপে লজ্জাশীল।।
অকৃপন মৈত্রী দয়া থাকে দুইজন।
ধরাধামে কাল যাপে সুগতি গমন।

অষ্ট সংবেগ

আটটি কারণে সত্ত্বেরা দুঃখে ভারাক্রান্ত।
সুদৃঢ় আবদ্ধ আছে, নারে অতিক্রান্ত।।
মুক্তির সন্ধানী যারা করহ সন্ধান।
দুঃখ মুক্তি হয়ে পাবে পরম নির্বান।।
মুক্তি পথ সুচনাতে আটটি সংবেগে।
জ্ঞান ধ্যান অনুকুলে চলে সর্ব আগে।।
অকুশল চিন্তাপথে রাখ দারোয়ান।
কুশল বৃদ্ধি করিয়ে হও আগুয়ান।।

১। জন্ম দুঃখঃ–

মাতৃরূপী অবিদ্যা তৃষ্ণা উপাদান।
অতীতে ছিল বলে আছি বর্তমান।।
কর্মরূপী পিতার সাহায্য পুষ্ট হয়ে।
কর্মে বর্তমান মাতৃ গর্ভে জন্ম লয়ে।।
পাইতেছি বহু দুঃখ আর উপদ্রব।
অবিদ্যা অন্ধকারে না দেখি দুঃখ সব।।
অন্য দুঃখ কিবা দুঃখ বুঝে বড় হলে।
জন্ম দুঃখ জানে না সে আবির্ভাব কালে।।
জ্ঞানীজন জন্মদুঃখ জানে পলে পলে।
পুনঃ তিনি না যাবেন গর্ভবাস মলে।।
জন্ম বন্ধের মানসে কর আয়োজন।
জন্মের প্রতি সংবেগ অতি প্রয়োজন

২। জরা দুঃখঃ–

ইক্ষুরস পান করে চোঁচা থেকে যায়।
জরায় যৌবন পানে বিকৃত দেখায়।।
বক্র কম্পমান দেহে যষ্টি পরায়ন।
ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হয়ে কষ্টেতে গমন।।

স্মরণ শক্তি ক্ষীণ হয়ে মরণ আসন্ন।
ধারণ অক্ষম হয় খাদ্য পানীয় অন্ন।।
পথিক পাথেয় শেষে মহাদুঃখ পায়।
যৌবন গত মানবও থাকে অসহায়।।
পুনঃ পুনঃ জরাগ্রাসে না হও গিলিত।
জরামুক্তি চাও সবে জরাকে তাঁড়িত।।

৩। ব্যাধি দুঃখঃ–

মানব শরীর হয় ব্যাধির আকর।
শিশু যুবা বৃদ্ধ সব তাহার চাকর।।
ব্যাধি যক্ষের কবলে আনন্দ তাড়িত।
ভোগ বিলাস সকল করে বিদূরিত।।
তাহার বাধ্যে মানব অপ্রিয় ভাজন।
অনিচ্ছায় নিয়ে যায় অমূল্য জীবন।।
বারবার তার গ্রাসে না হও পতন।
ব্যাধির প্রতি কর সংবেগ উৎপাদন।।

৪। মৃত্যু দুঃখঃ–

কবে আসে মৃত্যু দৈত্য কাল নাই তার।
কুক্ষিগত করে সবে রক্ষা নাই আর।।
জ্ঞাতিমিত্র বন্ধুজন পারে না রক্ষিতে।
মৃত্যু হতে অব্যাহতি নাই ত্রিজগতে।।
পুনঃজন্ম আছে বলে মৃত্যুর কারণ।
নির্বান ব্যতীত নাই তাহার বারণ।।
ক্রমাগত দগ্ধ করে গৃহকে যেমন।
সত্বকে স্থানান্তর করে মৃত্যু তেমন।।
মৃত্যুর প্রতি সংবেগ কর উৎপাদন।
মুক্তির প্রস্তুতি লও রাখহ স্মরণ।।

৫। অপায় দুঃখঃ–

তির্য্যক প্রেত অসুর নরক অপায়।

নিজ কর্মফলে সত্ব চার গর্ভে যায়।
তির্য্যক প্রেত অসুর কঠোর যন্ত্রনা।
দিব্য চক্ষে দেখা যায়, না যায় বর্ণনা।।
পশুপক্ষী কীট পোকা স্থল জলচর।
অসীম দুঃখে কাটায় তাহা দেখে নর।।
সংবেগ উৎপন্ন কর অপায় রোধের।
চেতনা উৎপন্ন কর নির্বান লাভের।।

৬। অতীত দুঃখঃ–

অতীত অতীত জন্মে করিয়াছি পাপ।
ইহ জন্মে পাইতেছি মহাপরিতাপ।।
নিত্য নিত্য দুঃখ পাই পূর্বকৃত ফলে।
চাকার মত দুঃখ থাকে মোচন না হলে।।
কর্মের আবর্ত্তে লোক ক্ষনে ভাসে ডুবে।
অতীত কর্মের দুঃখ মুক্ত হবে কবে।।
অতীত জন্মের দুঃখ বেদনার প্রতি।
তাহার জন্য সংবেগ প্রয়োজন অতি।।

৭। অপ্রাপ্ত বর্ত্ত দুঃখঃ–

কলুর গরুর মত ঘুরি ভবে ভবে।
দশ রজ্জুতে আবদ্ধ মুক্তি পাব কবে।।
ভাল বলে চাই যাহা মন্দ হয় তাহা।
কর্মের আবর্তে ঘটে দুঃখ পাই মহা।।
অপ্রাপ্তবর্ত দুঃখকে করহ দর্শন।
অবিদ্যা তৃষ্ণাকে কর সদা বিকর্ষণ।।

৮। বর্তমান আহারান্বেষনে দুঃখঃ–

বৃষ্টি ভিজে রোদে পুড়ে সারাদিন কাজ।
কোন মতে বেঁচে আছি পৃথিবীর মাঝ।।
মাতাপিতা দারাসূত করিতে পোষণ।
চুরি ডাকাতি অবৈধে পরকে পীড়ন।।

খাদ্যের অভাবে লোক মরেন অনাহারে।
দুঃখ মোচন মানসে নানা পথ ধরে।।
আহারান্বেষনে দুঃখে করহ সংবেগ।
নির্বান লাভের জন্য করহ উদ্যোগ।।

নারীর মোহ

একদা শ্রাবস্তীবাসী যুবক সুজন।
প্রব্রজ্যা গ্রহনে তিনি সমাধি মগন।।
রীতিমত ধ্যানে রত বুদ্ধের নির্দেশে।
একদা পিন্ডাচরণে পল্লীতে প্রবেশে।।
অলংকার পরিহিত সুন্দরী রমনী।
দেখিয়া কাম উদ্রেক হইল তখনি।।
পক্ষছিন্ন পক্ষীদের অবস্থা যেমন।
স্মৃতি ভ্রষ্ট যুবকের পতন তেমন।।
কামের তাড়নে ভিক্ষু অস্থির হইল।
আহার নিদ্রা ত্যাজিয়া পড়িয়া রহিল।।
অন্যান্য ভিক্ষুরা নিল বুদ্ধের সকাশে।
উৎকন্ঠার হেতু যাহা বুদ্ধেকে প্রকাশে।।
কাম অগ্নি ভয়াবহ জান সর্বজন।
পূর্বকালে দুঃখ পায় মহাসত্বগণ।।
আকাশ পথে চলিয়া হইল বিভূতি।
পঞ্চ অভিজ্ঞা আরও অষ্ট সমাপত্তি।।
নারীর মোহে পড়িয়া সব ধ্বংস হল।
বহু দুঃখ পেয়ে তিনি পূর্ব ধ্যান পেল।।
ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশী অভ্যন্তরে।
বোধিসত্ব জন্ম লয় ব্রাহ্মণের ঘরে।।
জ্ঞানোদয়ে সর্বশাস্ত্র পারদর্শী হয়ে।

ধ্যান মগ্ন হইলেন তিনি হিমালয়ে।।
কৃৎস্ন পরিকর্ম ধ্যান করে সমাধান।
অষ্ট সমাপত্তি লাভে আর অভিজ্ঞান।।
একদা তিনি লবণ অম্লসেবনার্থে।
বারানসী আসিলেন আকাশ পথে।।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ঘুরে বোধিসত্ত্ব।
রাজা প্রজা ভক্তি করে চলে, অনাসক্ত।।
সমাধির অনুকুল রাজার উদ্যানে।
পূর্ণ কুঠির গড়িল পুলকিত মনে।।
ধর্মোপদেশ দিতেন রাজা প্রজাগণে।
ষোল বৎসর কাটিল রাজার উদ্যানে।।
কাশীর প্রত্যন্ত দেশে বিদ্রোহ মানসে।
দমনে গেলেন রাজা মুনীকে প্রকাশে।।
রাজার আদেশে রানী নিত্য সেবা করে।
পরিতৃপ্ত করিতেন মহাঋষি বরে।।
একদা রানীর রূপে বিদ্ধ হল চিত্ত।
জ্ঞান ধ্যান নষ্ট হল কামেতে উম্মত্ত।
পক্ষছিন্ন পক্ষীমত ছটফট করে।
কামানলে পড়ে আছে আপন কুঠিরে।।
বিদ্রোহ জয় করে রাজা খুশী মনে।
রাজধানী আসিলেন যোদ্ধাদের সনে।।
শয্যাশায়ী মুনীবর কুঠির ভিতরে।
দেখিলেন মহারাজ দুঃখিত অন্তরে।।
কি অসুখে আছ তুমি বলগো আমায়।
মোচনে চেষ্টা করিব বলিগো তোমায়।
অসুখে আক্রান্ত নহি মমচিত্ত বিদ্ধ।
কামের অনলে জ্বলি নারীই অলব্ধ।
কোন নারী কাম্য তাহা বলগো আমায়।
বাসনা পুরিব আমি বলিগো তোমায়।।

রানী মৃদুলক্ষনা তাহা মম কাম্য।
তাহা বিহনে হবে না মম চিত্ত সাম্য।।
রাজারানী বুদ্ধি করে মুনীকে শুধায়।
দানের ভান করিয়া তাহাকে দেখায়।।
খুশী মনে রানী সনে যায় পথ চলে।
সখী সখা মত করে কত কথা বলে।।
কিছু দূর পথ চলে মুনীকে জানায়।
তব বাসস্থান নাই থাকিব কোথায়।।
রাজার নিকট যাও, চাও বাসস্থান।
মোরা দু'জনে করব সুখে অবস্থান।।
রাজার নিকট বলে ওহে নৃপ বর।
প্রার্থনা জানাই আমি চাই থাকা ঘর।।
রাস্তার ধারে কুঠির মলত্যাগ করে।
থাকার জন্য দিলেন পায়খানা ঘরে।।
ঝুড়ি কোদাল নিলেন রাজবাড়ী হতে।
পরিষ্কার করিলেন মুনি নিজ হাতে।।
গোবর মাটি লেপিল সযত্ন করিয়া।
সুগন্ধিতে পুরিলেন চন্দ্রচুর্ণ দিয়া।।
তারপরে নানাদ্রব্য থাল আর বাটি।
খাট পালং আসবাব বিছানার পাটি।।
পরিশেষে আনিলেন স্নানের জল।
পরিশ্রমে কমে গেল শরীরের বল।।
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে মুনী শুইল যখন।
দাঁড়ি টানিয়া মহিষী জিজ্ঞাসে তখন।।
তুমি কি ভুলে গিয়েছ শ্রমন ব্রাহ্মণ?
কত কষ্ট পেয়ে তুমি বুঝ না এখন??
রানীর কথায় মুনী চৈতন্য পাইল।
অজ্ঞানে ডুবিয়া তিনি কতকষ্ট পেল।।
চৈতন্য লাভের পর মনে আসে চিন্তা।

অধোগতি ভিন্ন সম নাই অন্য পন্থা।।
কামরিপু ভয়ানক অন্ধ করে ফেলে।
জ্ঞানীজন বলে তাহা উপদেশ ছলে।।
মৃদুলক্ষনার তরে ছিল অভিলাষ।
প্রত্যর্পন করিতেছি দাও অবকাশ।।
অজ্ঞানে নিয়েছি রানী পুনঃ পাইজ্ঞান।
পুনঃ যাব হিমালয়ে লভিবারে ধ্যান।।
ধর্মকথা শুনাইয়া হল ধ্যান বল।
পূর্বের ধ্যানে আকাশে সমাসীন হল।।
আকাশ পথে গেলেন পুনঃ হিমালয়ে।
ব্রহ্মবিহার ধ্যানেতে হল সুখময়।।
আয়ুশেষে গতি হয় রূপব্রহ্ম লোক।
অনন্ত বৎসর থাকে নাই কোন শোক।।
বুদ্ধের ব্যাখ্যা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু।
কাম রিপু ধ্বংস হয়ে পেল জ্ঞান চক্ষু।।
আনন্দ ছিলেন রাজা রানী উৎপলবর্ণা।
বুদ্ধ ছিলেন তপস্বী করেন বর্ণনা।।

নামরূপ

মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু চারে হয় রূপ।
দেহ পিন্ড বলে তাহা থাকে স্তুপ।।
চেতনা বিহীন বস্তু ধ্বংস অনিবার্য্য।
নাড়িলে নড়িতে পারে যেবা করে কার্য্য।।
অন্যে চলে যথা তথা নিজ বলে নয়।
দেহ হল তাহা সম পন্ডিতেরা কয়।।
অনিত্য দুঃখ অনাত্ম স্মরি সর্বক্ষণ।
মুক্ত হয়েছেন যারা নির্বানে গমন।।

সুখ দুঃখ ও উপেক্ষা এ'তিনে বেদনা।
জল মধ্যে বুদবুদ সর্বদা দেখনা।।
উদয় আর বিলয় অবিরত চলে।
সামান্য স্থিরতা নাই বুদবুদ জলে।।
ষড় দ্বারে শুরু যার ষড়দ্বারে শেষ।
লোভ দ্বেষ মোহ জন্মে পায় শুধু–ক্লেশ।।
অজ্ঞানী ভবেতে থাকে জ্ঞানী পায় মুক্তি।
ত্রিলক্ষণে থাকে যেবা দিলাম এ যুক্তি।।
মরীচিকা সম সংজ্ঞা দেখিলেই নাই।
মরুতে তালাশ করে জল নাহি পাই।।
বেদনায় সংজ্ঞা হয় ত্রিলক্ষনে ক্ষয়।
তাহাতেই মহামুক্তি পঞ্চমার জয়।।
সংজ্ঞায় সংস্কার জন্মে কলাগাছ সম।
বাকল খুলিলে তার যায় বৃক্ষভ্রম।।
সংস্কার বিগত চিত্তে মিলে মহাসুখ।
ত্রিলক্ষণে ধ্বংস হয় অষ্ট মহাদুঃখ।।
বিজ্ঞান অদম্য যথা বিবিধ ছলনা।
মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে দৌড়ে কখনো থাকে না।।
বানর অস্থির প্রাণী নড়ে সর্বক্ষণ।
চিত্ত চলে আরো বেশী দৌড়ে সর্বস্থান।।
স্মৃতি রশি দিয়ে তারে বাঁধিবে যেজন।
কুশল বৃদ্ধিতে হবে অচ্যুত নির্বাণ।।
স্মৃতি রশি শক্ত হলে না পারে নড়িতে।
দমিত হইলে পরে থাকিবে নীড়েতে।
নামরূপ সমন্বয়ে সত্বের উৎপত্তি।
উহার বিলীয়ে হয় নির্বাণ সম্পত্তি।।
চালক বিনে গাড়ী চলে না কখন।

গাড়ী বিহনে চালক চলে কদাচন।।
উভয়ে আশ্রিত থাকে উভয়ের প্রতি।
চালক বিহনে তার নাই কোন গতি।।
টাকার দু'পিট নিয়া হয় মুদ্রামান।
নাম আর রূপ নিয়া মানবের প্রাণ।।
পঞ্চস্কন্ধ নামরূপ দেহ আর মন।
এককথা একবাক্য বলে বিজ্ঞজন।।
জন্মে মরে ভবে ভবে অবিরত যার।
ত্রিলক্ষণে ধ্বংস কর সেই পঞ্চ মার।।

আমিত্ব

উচুঁ নীচু সমান নিয়ে পৃথিবী গঠিত।
ইহা হলো ধরার ধর্ম ভূগোলে গঠিত।।
লোকের মধ্যে তাহা আছে নিত্য দেখা যায়,
কেহ ধনী কেহ গরীব কেহ সমপর্য্যায়
আমি আমি বলে সবে আমি অর্থ কি?
আমির অর্থ জানলে লোকে নিজকে বলে ছি।
ধনে জনে মানে আমি কি আছে তোর,
আমি জ্যেষ্ট আমি শ্রেষ্ট জুড়ি নাই মোর।
আমি গরীব আমি ছোট আমি হীন মান,
আমি নীচ জানে সবে করে হীনজ্ঞান।
আমি আছি তোমার সমান ধনে মানে জনে,
আমার সমান সবে আছে বলি মনে মনে।
আমি নামে কিছু নাই আমিত্বের আকর,
আয়ু শেষে হয় শুধু যমের চাকর।
আমি আমি ত্যাগ কর তার নাম আমিত্ব,
আমির খোলস ফেল্‌লে পাবে অচ্যুত মহত্ব।।

দুনিয়া

দুনিয়া দুনিয়া বলে কি নিয়া দুনিয়া।
লোকে বলাবলি করে মুখেতে শুনিয়া।।
চন্দ্র সূর্য্য নিয়া হয় ধরা আলোকিত।
স্ত্রী পুরুষ নিয়া হয় সংসার গঠিত।।
সুখে দুঃখে নিয়া হয় সংসারের ধর্ম।
সত্য মিথ্যা নিয়া বুঝে বিবেকের মর্ম।।
লাভক্ষতি নিয়া লোকে কত হানাহানি।
নিন্দা প্রশংসায় রত আছে যত মানী।।
যশ অযশের ক্ষোভে বহু গন্ডগোল।
পাপ পূণ্য নিয়া সদা মনে দেয় দোল।।
নেগেটিভ পজেটিভে বাতির জ্বলন।
ইচ্ছা আর বস্তু নিয়া কর্মের ফলন।।
টাকায় দুপিট নিয়া হয় মুদ্রামান।
দেহ আর মন নিয়া মানবের প্রাণ।।
সকল দুনিয়া হয় অনিত্য সংসার।
সঙ্খা, শুধু আছে ভবে বাকী নাই আর।।
কার্য্যকারণ ব্যতীত না হয় দুনিয়া।
জ্ঞানীর বচন তাহা নিলাম মানিয়া।।
নিত্য শুধু আছে দুটি আকাশ ও সত্য।
ক্ষনিক চিন্তা করুন দু'টার মাহাত্ম্য।।

প্রজ্ঞার জোর

বায়ূর জোরে প্রাচীর পড়ে ঘরবাড়ী সাড়া,
বুদ্ধির জোরে খুনী বাঁচে একদিন পড়ে ধরা।
মুখের জোরে জিতে যারা নিজকে বলে ধন্য,

টাকার জোরে দিনকে রাত দেশের গণ্যমান্য।
গায়ের জোরে পাষাণ ছেদে সংসার দেখে ঘোর,
অস্ত্রের জোরে ধ্বংস করে জুড়ি নাই মোর।
ক্রোধের জোরে পরের ক্ষতি নিজের সর্বনাশ,
মোহের জোরে ঘানির মত ঘুরে বার মাস।
লোভের জোরে অজগর সাঁজে যত অন্ধজন,
প্রজ্ঞার জোরে সংসারে জয়ী সর্বমুক্ত হন।

অভাব

খাদ্যের অভাবে লোক মরে আহারে থাকে প্রাণ,
অভাব পুরণে জীবিকা ধরে আরো থাকে মান।
খাওয়া পরা থাকার অভাবে মহাদুঃখ পায়,
কেহ ধনের কেহ জনের কেহ পদের ভাবনায়।
ধনে জনে মানে আছে অভাব শুধু রোগমুক্তি,
বাহিরে ভাল শান্তির অভাব নাই মনের ফূর্ত্তি।
অভাবের কোন সীমা নাই পার্থিব সব চায়,
আপন জিনিষে সন্তুষ্ট থাকা সুখ শান্তি পায়।
দয়ার অভাব ক্ষমার অভাব আছে বিশ্বময়,
লোভ দ্বেষ মোহের অভাবে মহা শান্তি পায়।

বৈশাখী পূর্ণিমা

(বোধি সত্ত্বের জন্ম)

শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা সমাগত প্রায়।
মহামায়ার সুগর্ভ পূর্ণ হয়ে যায়।।
খুশী মনে রানী যায় শুদ্ধোধন পাশ।

পিত্রালয়ে যাওয়ার হল অভিলাষ।।
রাণীর প্রস্তাব শুনে উৎকণ্ঠিত মন।
যাওয়ার বন্দোবস্ত হল আয়োজন।।
কপিল বস্তু হইতে দেবদহ শহর।
রাস্তার কাজে দিলেন লোক লসকর।।
সজ্জিত ধ্বজা পতাকা শকটে চড়িয়ে।
মহারানী চলিলেন তাঁর পিতৃ গৃহে।।
দুই নগরীর মধ্যে লুম্বিনী উদ্যান।
অপরূপ শোভা যেন নন্দন কানন।
রানীর মনে জাগিল ভ্রমন বাসনা।
তাঁহার সংগে দিলেন শাক্যের ললনা।।
সেই বৈশাখী পূর্ণিমা জ্যোৎস্না রাতে।
শালবৃক্ষ তলে গিয়ে ধরে ডান হাতে।।
বৃক্ষের ডাল ধরার ঠিক সাথে সাথে।
প্রথম বেদনা হল হঠাৎ তাহাতে।।
উদয়মান সূর্য্যের মত আলো করে।
বোধিসত্ত্ব জন্মিলেন এই মর্ত্যপুরে।।
সংগে সংগে জন্মদিল সপ্ত সহজাত।
শৈশবের নিত্য সাথী রাজামাত্যসূত।।
মহাবোধিবৃক্ষ, গোপা, সারথী ছন্দক।
চার নিধিকুম্ভ, আনন্দ, অশ্ব কন্ঠক।।
অতপর শুদ্ধচিত্ত মহাদেবগণ।
সুবর্ণময় বস্ত্রে করেন ধারণ।।
দেবগনের প্রভাবে স্নাত মাতাসূত।
আকাশের বারি পাতে তৎক্ষণাৎ ধৌত।।
সপ্ত পদে চলে তিনি তাকালেন দিক।
কাহাকে দেখেন নাই স্বীয় সমধিক
উদাত্ত কন্ঠে ভাবেন এক সংক্ষিপ্তসার।
আমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুনঃ জন্মিব না আর।।

(বুদ্ধত্ব লাভ)

সূর্য্যস্ত গমনকালে মার সৈন্যগণ।
ব্যর্থ হল তাহাদের সর্ব প্রলোভন।।
স্বচ্ছ আকাশে উদিল শোভন চন্দ্রিমা।
এল আঁর এক শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা।।
ক্রমে ক্রমে ডুবে গেলেন গৌতম ধ্যানে।
সঞ্চরন করিলেন অনন্ত জ্ঞানে।।
বির্তক বিচার প্রীতি সুখ একাগ্রতা।
পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত ধ্যানের সফলতা।
ধাপে ধাপে উঠিলেন চতুর্থ ধ্যানেতে।
অস্তমিত সুখ মুখ প্রশান্তি স্মৃতিতে।।
তারপর লভিলেন ধ্যানের সম্পত্তি।
ক্রমে রূপে অরূপ নিরোধ সমাপত্তি।।
ধ্যানের উচ্চ শিখরে উঠে তাঁর দর্শন।
প্রজ্ঞাদ্বারা লভিলেন বিমুক্তি দর্শন।।
মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণ চন্দ্র যেমন।
অবিদ্যা তৃষ্ণা মুক্তে জ্ঞানোদয় তেমন।।
প্রথম যামেই লভিলেন জাতিস্মর।
জানিলেন বহু পূর্ব পূর্ব জন্মান্তর।
দ্বিতীয় যামে সত্বদের চ্যুতি–উৎপত্তি।
দিব্য চোখে দেখিলেন সুগতি–দুর্গতি।।
অবিদ্যা বিগত চিত্তে বিদ্যারই সৃষ্টি।
দিব্যনেত্রে সুবিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টি।
রাত্রির অন্তিম যামে তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান।
লভিলেন কার্যকারণ নীতির ধ্যান।।
মহাজ্ঞানে বুঝিলেন অবিদ্যাই মূল।
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই মুক্তির কুল।।
অবিদ্যার কারণে সংস্কার।
সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান।।

বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ।
নামরূপের কারণে ষড়ায়তন।।
ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ।
স্পর্শের কারণে বেদনা।।
বেদনার কারণে তৃষ্ণা।
তৃষ্ণার কারণে উপাদান।।
উপাদানের কারণে ভব।
ভবের কারণে জন্ম জরা বিবিধ দুঃখ।।
দুঃখ, দুঃখ সমুদয় দুঃখের কারণ।
দুঃখের নিরোধ সত্য নির্বাণ কারণ।।
আবিষ্কার স্থান চতুরার্য সত্য নির্বাণ।
মহা আনন্দে গাহিলেন এক উদান।।
জন্ম জন্মান্তরে ঘুরে পাইনি সন্ধান।
গোপনে কে রাখিয়াছে আমাকে নির্মাণ।।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে, দেখেছি এবার।
হে-গৃহ কারক, পুনঃ গড়িবে না আর।।
ভেংগেছি সকল স্তম্ভ গৃহ ভিত্তিচয়।
সংসার বিমুক্ত চিত্ত তৃষ্ণা হল ক্ষয়।।
পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বোধিমূলে।
বুদ্ধজ্ঞান লভিলেন নৈরঞ্জনা কুলে।।

(মহাপরি নির্বাণ)

বৈশাখী পূর্ণিমা রাত জ্যোৎস্না আলোকিত।
ত্রিলোক গুরু অনন্ত শয়নে শায়িত।।
আনন্দের সংবাদে কুশীনারা মল্লগণ।
বন্দনার তরে আসে হয়ে মূহ্যমান।।
সুভদ্র নামেতে বৃদ্ধ নিগ্রন্থ সন্ন্যাসী।
বুদ্ধের সমীপে আসে মুক্তির প্রত্যাশী।।
তিনিই হলেন বুদ্ধের অন্তিম শিষ্য।

অর্হত্ব লভিলেন হইয়া উপদিষ্ট।।
ভগবান সম্বোধিয়া আনন্দের উদ্দেশ্য।
সংঘের প্রতি করিলেন শেষ নির্দেশ।।
কর শীল সমাধি প্রজ্ঞার অনুশীলন।
বুদ্ধের অবর্তমানে প্রকৃত পূজন।।
সর্ব সংস্কার সমূহ ক্ষয় ব্যয় শীল।
অপ্রমাদ কার্মে চিত্ত হয় অনাবিল।।
সিংহ শর্যায় শায়িত প্রথম হইতে।
ক্রমে উঠিলেন নিরোধ সমাপত্তিতে।।
সেই স্তরে ক্ষণিক করিয়া অবস্থান।
আবার নেমে আসলেন প্রথম ধ্যান।।
তখন বৈশাখী–পূর্ণিমার শেষ লগ্ন।
পুনঃ ক্রমান্বয়ে হইলেন ধ্যান মগ্ন।।
প্রথম হইতে চতুর্থ ধ্যানে পন্ডিত।
সংগে সংগে হইলেন পরিনির্বাপিত।।
অশীতি বৎসর বয়সে কুশীনগরে।
দেব–নর–সূর্য অস্তমিত চিরতরে।।
সহস্র বীতরাগ ভিক্ষু শৃংখলা বদ্ধ।
উচ্চরিলেন সমস্বরে হয়ে করবদ্ধ।।
অনিত্য সংসার মাঝে উদয় বিলয়।
জন্মমৃত্যু নিরোধেই সুখের আলয়।।
মরিয়াছে মরিতেছে মরিব সকল।
অনুরূপ হবে মোর ইন্দ্রিয় বিকল।।
সিদ্ধার্থের জন্মলগ্ন বুদ্ধত্ব অর্জন।
দেহ ত্যাগ করিলেন একই লগন।।
বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে বুদ্ধকে প্রণাম।
মম তৃষ্ণা ক্ষয় হোক লভিব নির্বাণ।।

প্রভাতী আহ্বান

জাগো জাগো ওহে জাগো, সবে জাগো।
ঘুম হতে জাগো সবে, নিজ কাজে লাগো।।
মুনি জাগে ঋষি জাগে, জাগে ধ্যানীগণ।
জ্ঞান অনুসারী জাগে, লভে জ্ঞান ধন।।
পাখী ডাকে বৃক্ষশাখে, আপন কুলায়।
ডাকিল মোরগ ভোরে থেকো না হেলায়।।
স্মর যত বুদ্ধগণে স্মর বোধিজ্ঞানে।
স্মর যত মুক্ত গনে, সম্যক প্রধানে।।
বুদ্ধগুণ, ধর্ম গুণ, স্মর সংঘগুণে।
প্রশান্ত চিত্তেতে স্মর, বসে এক মনে।।
দেহের অশুচি স্মর, বহুদোষ তার।
মুক্তির বিঘ্ন কারক, স্মর বারবার।।
ত্রিলোক মাঝারে শুধু উদয় বিলয়।
জন্ম মৃত্যু ভবচক্রে দুঃখের আলয়।।
মরিয়াছে মরিতেছে মরিবে সকল।
অনুরূপ হবে মোর ইন্দ্রিয় বিকল।।
মৈত্রী করুনা মুদিতা, আর ও উপেক্ষা।
ক্রমান্বয়ে কর স্মৃতি, করনা অপেক্ষা।।
উপবেশনে, গমনে, দাঁড়ানে, শয়নে।
রাখ স্মৃতি সযতনে, স্মর ত্রিলক্ষণে।।
ভবনদী পার হও ভাব বিদর্শনে।
পাইবে অচ্যুত সুখ নির্বাণ গমনে।

সাধু–সাধু–সাধু

অভিমত উচ্ছ্বাস

যাঁরা বনভন্তের দেশনা ২য় খন্ড আদ্যান্ত পাঠ করে অভিমত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তাঁদের লিখিত কিছুটা অংশ পাঠক পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে প্রচার করছি।

১। শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী মহাথের
ত্রিপিটক বিশারদ
পশ্চিম আঁধার মানিক, রাউজান।

....

....

পরমার্থমূলক ও লোকোত্তর ধর্মদেশনা বৌদ্ধ সমাজের কুসংস্কার পথ থেকে কুশল পথে, অবিদ্যা থেকে বিদ্যায় ফিড়ায়ে এনে আদর্শ বৌদ্ধ জীবন গঠন করতে সহায়তা করবে। আপনার ২য় খন্ডের প্রতি বিষয়বস্তু লৌকিক ও লোকোত্তরের ধর্মদেশনায় দুঃখমুক্তির পথে অনুপ্রাণিত করবে। বিপথগামী সত্ত্বদের সম্যক পথে পরিচালিত করবে। ....।

সাম্প্রতিককালের হিংসা উম্মত্ত পৃথিবীতে মারনাস্ত্রের ঝনঝনানির সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞান যুগের প্রহেলিকাক্ষণে এ গ্রন্থের প্রতি অধ্যায় পরিচ্ছেদের বিষয় বস্তু ও প্রতিপাদ্য বিষয় অতীব সুন্দর, মনোরম, সাবলীল, প্রাঞ্জল এবং বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে। আধুনিক কালের শান্তি, প্রগতি, বিমুক্তিকামী নরনারী সুধী সজ্জনেরা এ মহা মনোরম গ্রন্থ অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন, অনুশীলন ও আচরণ করলে চিরশান্তি বিমুক্তি সুধা লাভ করবে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ....।

২।   শ্রীমৎ ধর্ম রক্ষিত মহাথের
অধ্যক্ষ ও সম্পাদক
সম্বোধি পালি ও সংস্কৃত কলেজ
কনকস্তুপ বিহার, কুমিল্লা।

....

....

বনভন্তের দেশিত ধর্ম নির্যাসকে লেখনীর মধ্যদিয়ে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। বনভন্তের বাণী শাশ্বত ও সাধনা মিশ্রিত বলে প্রতিটি শব্দ এবং বাণী মানুষের হৃদেয় ভাবের উদ্রেক করে। লেখক সুকৌশলে এ মহা পুরুষের বাণী সঞ্চয় পূর্বক পুস্তকারে প্রকাশ করে সদ্ধর্মের মহা উপকার সাধন করেছেন। বনভন্তের দেশনার প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড কথামৃতের মত অজস্র উপাসক-উপাসিকার অন্তরে শ্রদ্ধারূপ স্রোত ধারা বয়ে দিতে সক্ষম হবে, মহাকালকে অতিক্রম করে বর্তমানে বলে মনে করি।

....

....

৩।   বাবু হেমেন্দ্র লাল বড়ুয়া
মহাসচিব,
আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ প্রগতি সংঘ, বাংলাদেশ
প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি
ও বিশ্ব বৌদ্ধ সৌ-ভ্রাতৃত্ব সংঘ।

....

কীর্তিমান ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ "মহান বনভন্তের দেশনা ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড" সশ্রদ্ধ চিত্তে পাঠ করেছি। ইহা এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও ঐতিহাসিক কর্মকান্ড বৈকি। তিনি ধারাবাহিকভাবে ৩য় খন্ড সংকলনে লিপ্ত হয়েছেন জেনে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। ইহাতে আপামর জনসাধারণ যে ধর্মীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ ও উপকৃত হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জাত ও রাঙ্গামাটির নৈর্সর্গিক সমৃদ্ধ রাজ বনবিহারে অধিষ্ঠিত মহান বনভন্তে বিশ্বনন্দিত তথাগত বুদ্ধ প্রদর্শিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার আলোকে দীপ্তমান ও চারিসত্য আর্যমার্গলাভী যাহা বাংলাদেশে অদ্বিতীয়। তিনি সুমহান ভদন্ত সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে) জীবন্ত অরহৎ। তাই বাংলাদেশের শুধু বৌদ্ধরা নহে, সমগ্র জনগোষ্ঠী ধন্য।

....

পরমারাধ্য বনভন্তের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও মৈত্রীময় বাণী সমাজের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হউক এবং সারা বিশ্বে শান্তিময় পরিবেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক-এই প্রার্থনাই রইল।

৪। অধ্যাপক ব্রহ্মদত্ত চৌধুরী
সম্পাদক
দি ওয়ার্লড বুডিডষ্ট টাইমস
৯/২০ মোর এভেনিউ, কলিকাতা।

পরম আর্য মহামানব বনভন্তের স্নেহ ধন্য শ্রদ্ধেয় ডাঃ অরবিন্দ বাবু মহাশয় সমীপেষু

....

বই এর পাতা খুললেই আমাকে পীড়া দেয়। প্রাঞ্জল ভাষায়, সুকঠিন বৌদ্ধ ধর্ম যেভাবে সহজ, সরল ভাষায় উপমাসহ সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দেন, তা অনবদ্য। ....

৫। অধ্যাপক শিশির কুমার বড়ুয়া
খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ।

....

বনভন্তের দেশনা (২য় খন্ড) জনগণ মন নন্দিত পূজনীয় বনভন্তের দেশনামৃত। অমৃত সমান গ্রন্থটি পাঠে মানুষ খুঁজে পাবে অনাবিল শান্তি এবং দেশনা অনুসারে জীবনাচরণে মানুষ পাবে সঠিক পথ নির্দেশনা।

....

চিত্ত ভক্তি রসে সিক্ত হয় পাঠে। বনভন্তের দেশনা (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড) থেকে বিশেষ বিশেষ অর্থপূর্ণ বাক্যগুলো নিয়ে "বনভন্তের বাণী" নাম দিয়ে আরেকটি বই প্রকাশের জন্য আপনাদের নিবেদন করছি। হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন গ্রন্থগুলোর ইংরেজী অনুবাদও হবে। এই বই সংকলন করে আপনি বৌদ্ধ জাতির অশেষ উপকার সাধন করেছেন। আপনাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ। ....

৬। প্রকৌশলী মৃদুল কান্তি বড়ুয়া
বাংলাদেশ রেলওয়ে কারখানা
৭/১১ ডি আমবাগান
পোঃ পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

....

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অভিজ্ঞাপূর্ণ অমৃত ও অমোঘবাণী গুলি বর্তমান মানব সমাজে চরম অবক্ষয়ের একমাত্র রক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করবে। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞানীর ধর্মকে তিনি (বনভন্তে) সাধারণ মানুষের কাছে উপমা সহকারে অতি সুন্দর, সহজ ও সরল বাক্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিন্দু বিন্দু জলে যেমন ভাবে মহাসাগর গঠিত হয় ঠিক তেমনি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বিন্দু বিন্দু দেশনায় সৃষ্ট মহাসাগর দেশনা থেকে মাত্র কয়েক ফোঁটা দেশনা আমাদেরকে উপহার দিয়ে চিত্তকে ধৌত করে জ্ঞানচক্ষুর দ্বার খুলে দিয়েছেন। ....

৭। বাবু সুকুমার বড়ুয়া
প্রধান শিক্ষক
পোঃ রমজান আলী হাট
রাউজান।

....

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বিভিন্ন সময়ে ভাবিত ও মুখ নিঃসৃত ধর্মোপদেশ সুদক্ষ মালাকারের ন্যায় চয়ন করে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা ২য় খন্ড নামে ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া লোক সমাজে প্রকাশ করেছেন, তা পাঠান্তে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম সত্যিকারভাবে বিশেষ উপকৃত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। ....

বুদ্ধের সময় শ্রুতিধর আনন্দ যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঠিক সেভাবে মহান সাধক প্রবর শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মোপদেশ ধারণ করে তাঁরই একনিষ্ঠ সেবক ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া সুনিপুনভাবে প্রকাশ করেছেন তজ্জন্য তাকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

৮। বাবু আশীষ বড়ুয়া
সহকারী শিক্ষক
ভূবনজয় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়
জুরাছড়ি।

বিশিষ্ট লেখক সদ্ধর্ম অনুরাগী ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া ২য় খন্ড বইটি আমি পড়েছি। ২য় খন্ড বইটি ১ম খন্ড বইটির চেয়ে অধিক রুচি সম্পন্ন হয়েছে। বইটি প্রথমেই দেখে আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ জেগে গেছে। বনভন্তের দেশনা ২য় খন্ড বইটি পড়ে আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে পারি যে বইটি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সদ্ধর্ম বাণী প্রচারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি লেখকের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। লেখকের চিত্তে লোকোত্তর জ্ঞান দৃষ্টি হউক এ প্রার্থনা করি।

৯। বাবু ধবল কুমার চাক্মা
সভাপতি
সুবলং শাখা বনবিহার, জুরাছড়ি।

....

বুদ্ধ শাসনের মধ্যাহ্ন সময়ের ক্রান্তিলগ্নে আবির্ভূত সত্য ধর্মের মহান স্থপতি কালজয়ী মহাপুরুষ পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেশিত মুল্যবান দেশনা সমূহ যেভাবে ধারাবাহিকভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ধৈর্য সহকারে পুস্তকাকারে বাণীবদ্ধ করে চলেছেন। আপনার এ মহৎ কর্মোদ্যোগ বুদ্ধ শাসনে অমূল্য অবদানের স্মৃতি হিসাবে সত্য পিপাসুদের মনে যুগ যুগ ধরে কুশল সঞ্চয়ের উৎস হয়ে থাকবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ....

১০। বাবু প্রচারক চাক্‌মা
সম্পাদক
সুবলং শাখা বনবিহার
জুরাছড়ি থানা।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মুখ নিঃসৃত বাণী লেখনীর মাধ্যমে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়। বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মত জ্ঞানীর জ্ঞানগর্ভ সমৃদ্ধ কথাকে। .... আজকের এই দুনিয়ায় যেখানে মানুষ জড় বিজ্ঞানের দিকে ধাবিত সেখানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যে একজন সত্যিকারের মহান ত্যাগী, জ্ঞানী, প্রভাবশালী, মহাঋদ্ধিমান এবং সর্বোপরি ভবসাগর, দুঃখ সাগর পার করে দিয়ে নির্বান সাগরে পৌঁছে দিতে পারদর্শী অরহৎ, এটা সবাই জানুক এবং বুঝুক।

১১। বাবু মহিম রঞ্জন বড়ুয়া
৩৯ ঈ মুর এভেনিউ
কলিকাতা ৪০, ভারত।

ডাঃ অরবিন্দু বড়ুয়া কর্তৃক সংকলিত পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের মুখনিঃসৃত দেশনা বাণী বনভন্তের দেশনা ২য় খন্ড প্রকাশ সাধন করেছেন। এইজন্য সংকলক ও প্রকাশনা পরিষদ সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আশা করি এই পুস্তক পাঠ করে ধর্মপিপাসু নরনারীগণ অতীব উপকৃত হবেন। ....

১২। বাবু সৃজন বিকাশ বড়ুয়া
অফিসার ইন চার্জ
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
১০৩ ভানুগাছ রোড, শ্রীমংগল।

....

সহজ ভাষা, প্রাঞ্জল বর্ণনা, শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনার সাথে সাথে বুদ্ধ দেশিত বিভিন্ন এর সমন্বয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপনা, সর্বোপরি শ্রুতি লিখনে

অপূর্ব পটুতা আমাকে আবির্ভূত করেছে। আপনার এ মহৎ প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করি। অনেক জানলাম, মনের অনেক শান্তি নিস্কৃতি দিতে পেরেছি পড়ার সাথে সাথেই। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অমূল্য দেশনা সম্মুখে বসে শ্রবণ করতে পারিনি। সেই বঞ্চিতের অভাব আপনি মুচিয়ে দিয়েছেন দেশনাগুলো সংকলনের মাধ্যমে। আপনি আমার অশেষ কল্যাণমিত্র।

১৩। বাবু প্রদীপ্ত চাক্মা
বালুখালী মুখ, জুরাছড়ি।

....

বনভন্তের দেশনা নামক পস্তুকটি মানব মুক্তির দিক নির্দেশনায় একটি পবিত্র দলিল সদৃশ। আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা প্রেক্ষিতে ও সঠিক উত্তর দানে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞানগর্ভ তথ্যপূর্ন ব্যাখ্যায় ভরপুর এ গ্রন্থটি। নিঃসন্দেহে বলা যায় সুধি সমাজে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। ....

১৪। ডাঃ প্রীতি কুসুম বড়ুয়া
৫২/এ ১নং জয়নগর লেইন
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ সমূহ তাঁহার মুখ নিঃসৃত দেশনার মধ্য দিয়ে প্রচার করে সদ্ধর্ম পিপাসু জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের সমাধান করে সহজ ও সরল ভাষায় প্রচার করে সমাজের মুক্তিকামী মানুষের সাধনার পথ প্রশস্থ করেছেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর উপদেশের মাধ্যমে সমাজের অনেক কুসংস্কার পরায়ন ও সংকীর্ণতার অন্ধকারে যারা ডুবে আছেন তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, সজ্ঞানে ফিরে আসুক।

১৫। বাবু মিলন কান্তি বড়ুয়া (অফিসার)
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়-ঢাকা।

আপনার অকৃত্রিম প্রচেষ্ঠা ও প্রগাঢ় স্মৃতি/স্মরণ শক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের একমাত্র অরহতোপম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে) এর মুখ নিঃসৃত অমৃতময় বাণী সংকলন করে "বনভন্তের দেশনা" ১ম ও ২য় খন্ড ধর্মীয় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন, তজ্জন্য আপনাকে জানাই আমার অন্তরস্থল থেকে সাধুবাদ।

যাঁরা (বৌদ্ধ সমাজ) বৌদ্ধ ধর্ম সুচারুরূপে আচরণ করেন না এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সম্ব ন্ধ অবগত নন তাঁরা একমাত্র উক্ত দেশনাদ্বয় পাঠ করে সর্বাধিক উপকৃত হবেন, যা ধীরে ধীরে মহা-নির্বান সাক্ষ্যলাভ করতে সহায়তা হবে। এছাড়া শ্রদ্ধেয় বনভন্তের এমন কতগুলো অমৃতময় বাণী প্রকাশিত হয়েছে দেশনাদ্বয়ে যা কোন বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয় না।

১৬। বাবু অশোক কুমার বড়ুয়া
সাংবাদিক
ছোটরা (বড়ুয়া হাউস) কুমিল্লা।

তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। পরমারাধ্য আর্য মহাপুরুষ পরমপূজনীয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের অভ্যুদয়ে বুদ্ধের ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী ধর্ম প্রচারে বর্তমানে হিংসা বিক্ষুব্ধ সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জীবনাদর্শের উপর ভিত্তি করে সদ্ধর্মানুরাগী ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া মহোদয়ের সদিচ্ছায় প্রকাশিত বনভন্তের দেশনা ১ম ও ২য় খন্ড প্রকাশনাকে সাধুবাদ জানাই। সদ্ধর্মনুরাগী নারী পুরুষ সকলের ধর্মীয় অনুশীলনে প্রেরণা জোগাবে।

এ ব্যাপারে সকল ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাগণের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান বাঞ্ছনীয়।

১৭। বাবু গোপাল বড়ুয়া
বৌদ্ধ ধর্মীয় কীর্তনীয় শিল্পী
গ্রামঃ কোঠের পাড়, ডাকঘর-ফতেপুর,
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

আপনার সংকলিত বনভন্তের দেশনা (২য় খন্ড) একটি অতি চমৎকার সংকলন। এতে বনভন্তের বিভিন্ন সময়ের এবং স্থানের দেশনা চয়ন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশনায় আপনি প্রতিটি নিবন্ধে বিষয়-রসের অতি সহজ-সরল ও সুন্দর বর্ণনায় পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করতে সমর্থ হয়েছেন। এই অভিনব সংগ্রহ ও সংকলন আপনার প্রশংসনীয় উদ্যোগ-সাধুবাদ জানাই আপনাকে।

এ গ্রন্থের ভূমিকায় পরম পূজনীয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথের মহোদয় অসাধারণ পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। সে কারণে ভূমিকা পাঠ করলেই সম্পূর্ণ পাঠ করার অদম্য বাসনা জাগে, পাঠক হৃদয়ে। ধর্মানুরাগী প্রত্যেক নর নারীর কাছে এটা নিঃসন্দেহে হবে সমাদৃত।

১৮।

সদ্ধর্মপ্রাণ
ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া

আপনাকে জানাই আমাদের প্রাণঢালা শ্রদ্ধার্ঘ।

পরম পূণ্যপুরুষ আর্যপুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের শ্রীচরণে নিবেদন করি আমাদের সশ্রদ্ধ বন্দনা।

আপনার সংকলিত বনভন্তের দেশনা- ১ম ও ২য় খন্ড গ্রন্থ দুটি বড়ই আশ্চর্য্য ও অভিনব সৃষ্টি।

প্রাণীজগতের পরম কল্যাণমিত্র, বিচিত্র ধর্মদেশক শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্যে থেকে আপনার যে ধর্মবোধ উত্থান তাঁরই ফলশ্রুতি এ মহামূল্যরত্ন খচিত দুটি গ্রন্থ যেন সংসার প্রপঞ্চ থেকে মুক্তকামী মানুষের দিক নির্দেশনা। সমাজ এবং সদ্ধর্মের অশেষ উপকার সাধিত হলো আপনার সুমহান ত্যাগ ও প্রচেষ্টায়।

বিজ্ঞজন কাম্য প্রশংসনীয় আপনার এই মহাপূণ্য কর্ম নির্বাণ লাভের হেতু হউক।

শুভ মঙ্গল কামনায়।

আছদগঞ্জ বৌদ্ধ জনসাধারণ
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
০১-০১-১৯৯৭ ইং।

১৯।

প্রাতঃ স্মরণীয় মহৎ আর্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ের স্মরণীয় জীবন, দীক্ষা, ধর্মকীর্তি, দেশনার অনন্য প্রকাশনা ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া সংকলিত 'বনভন্তে দেশনা' ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড অত্যন্ত গভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধাভরে পাঠ করে অনির্বচনীয় স্বর্গীয় সুখ পেলাম।

বনভন্তের দেশনা ১ম খন্ড ও ২য় খন্ডে জাগতিক মোহ, ষড়রিপুর ক্লেদার্ত চিন্তা চেতনা দূর করে, বুদ্ধবাণীর অনুসরণে অনুশীলনের যে উদাত্ত আহ্বান ছড়ায় তার কোন তুলনা নেই।

আমরা বাংলাদেশ বৌদ্ধ ত্রিরত্ন পরিষদের পক্ষ হতে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির মহোদয়কে সশ্রদ্ধ বন্দনা জানাচ্ছি। সাথে সাথে এই মহতী প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়াকে ও অন্যান্য সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং এরূপ মঙ্গলময় হিতকর প্রকাশনা অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

বেণী মাধব বড়ুয়া
সভাপতি

করুণা কান্তি বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ বৌদ্ধ ত্রিরত্ন পরিষদ
আছদগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
তাং-১০-১-৯৭ ইং।

শুদ্ধিপত্র

১। শ্রদ্ধেয় ভন্তের দেশনা ২য় খন্ডে বৌদ্ধধর্মীয় গান-
"ওগো ত্যাগী, ওগো জ্ঞানী ...."
উৎপলা চাক্‌মার স্থলে উত্তমা খীসা হবে।

২। "এজ এজ সমারে ...."
জ্যোতির্ময় চাকমার পরিবর্তে যতীন্দ্র লাল চাকমা হবে।

৩। "দূর্গার খাড়ু" সম্বন্ধে কিছুটা ভুল তথ্য আছে। তজ্জন্য দুঃখিত।

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,
either in cities or countrysides,
people would gain inconceivable benefits.
The land and pepole would be enveloped in peace.
The sun and moon will shine clear and bright.
Wind and rain would appear accordingly,
and there will be no disasters.
Nations would be prosperous
and there would be no use for soldiers or weapons.
People would abide by morality and accord with laws.
They would be courteous and humble,
and everyone would be content without injustices.
There would be no thefts or violence.
The strong would not dominate the weak
and everyone would get their fair share."

THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of
Limitless Light!

~The Vows of Samantabhadra~

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

~The Vows of Samantabhadra
Avatamsaka Sutra~

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA
南無阿彌陀佛

【孟加拉文：佛法開示（第 3 冊）】

財團法人佛陀教育基金會　印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
3,500 copies; April 2014
BA032-12198